মাসুদ রানা

ব্ল্যাকমেইলার

কাজী আনোয়ার হোসেন

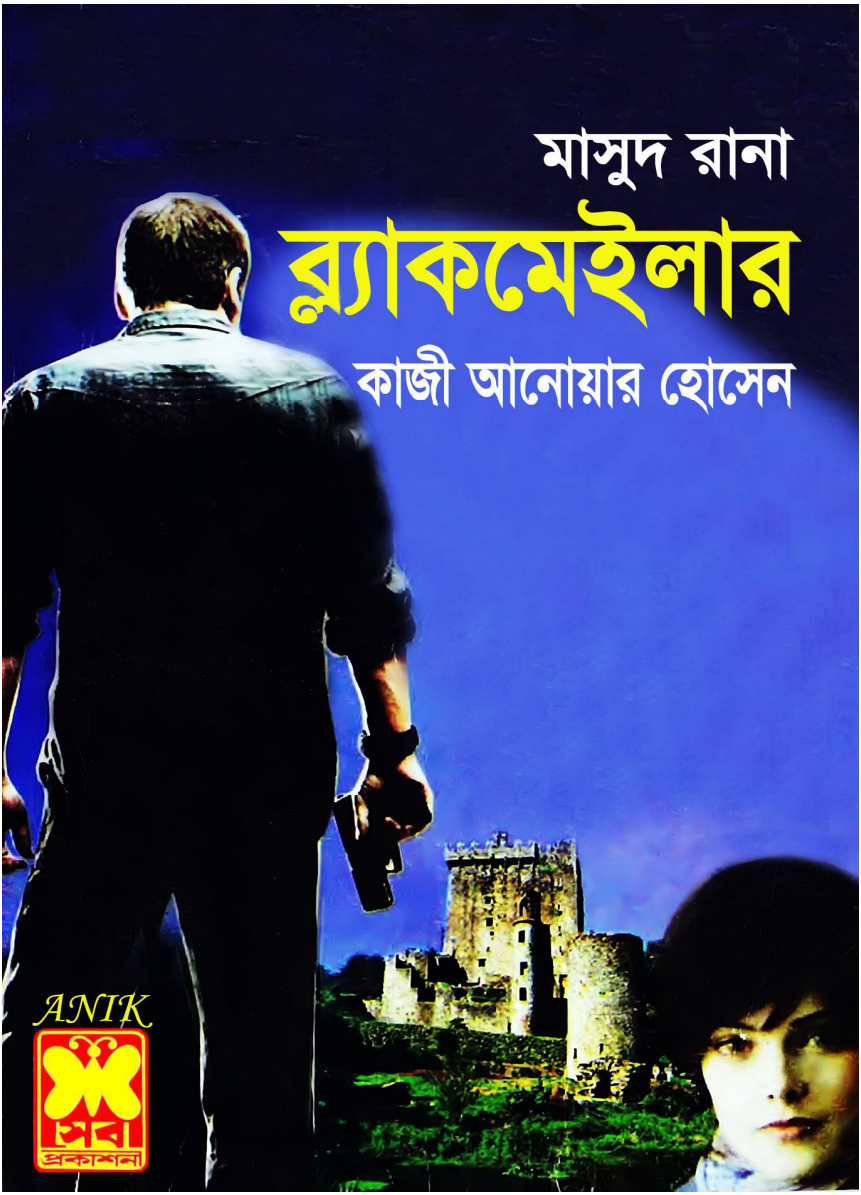

ANIK
সেবা
প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

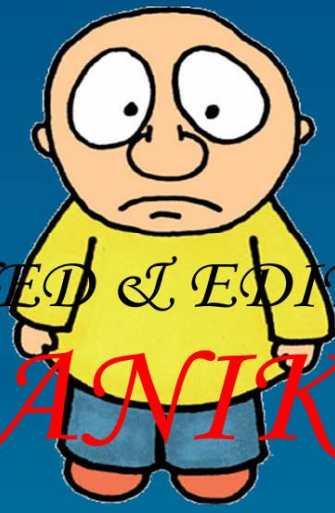

SCANNED & EDITED BY

ANIK

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

ব্ল্যাকমেইলার

বিপদে সোহানা

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7678-8

ব্ল্যাকমেইলার ৫–১৩১
বিপদে সোহানা ১৩২–২৭২

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩ ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ ৬২/-
৪-৫-৬ দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ ৫৯/-
৭-৩৭২ শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা ৫৯/-
৮-৯ সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০-১১ রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ ৫৯/-
১২-৫৫ কুতুবদীপ+কুউউ ৪৯/-
১৩-১৪ নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১৫-১৬ কায়রো+মৃত্যু প্রহর ৩৭/-
১৭-১৮ গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ৩৭/-
১৯-২০ রাত্রি অন্ধকার+জাল ৩১/-
২১-২২ অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা ৩৪/-
২৩-২৪ ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত ৩২/-
২৫-২৬ এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই ৩৩/-
২৭-২৮ বিপদজনক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৯-৩০ রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে) ৩১/-
৩১-৩২ অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে) ৩৮/-
৩৩-৩৪ বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
৩৫-৩৬ ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
৩৭-৩৮ গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু ৩৮/-
৩৯-৪০ অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
৪১-৪৬ সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক ৪৬/-
৪২-৪৩ নীল ছবি-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৪৪-৪৫ প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৪৭-৪৮ এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে) ২৯/-
৪৯-৫০ লাল পাহাড়+হংকম্পন ৩৫/-
৫১-৫২ প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৫৩-৫৪ হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে) ২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮ বিদায় রানা-১,২,৩ (একত্রে) ৫৯/-
৫৯-৬০ প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
৬১-৬২ আক্রমণ ১,২ (একত্রে) ৫০/-
৬৩-৬৪ গ্রাস-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
৬৫-৬৬ স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
৬৭-১৬১ পিপি+বুমেরাং ৬০/-
৬৮-৬৯ জিপসী-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
৭০-৭১ আমিই রানা-১,২ (একত্রে) ৫২/-
৭২-৭৩ সেই উ সেন-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
৭৪-৭৫ হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে) ৫৭/-
৭৬-৭৭ হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০ আই লাভ ইউ, র‍্যান (তিনখণ্ড একত্রে) ৮৪/-
৮১-৮২ সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
৮৩-৮৪ পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে) ৪২/-
৮৫-৮৬ টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৮৭-৮৮ বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
৮৯-৯০ প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
৯১-৯২ বন্দী গগল+জিম্মি ৪২/-
৯৩-৯৪ ডুবার যাত্রা-১,২ (একত্রে) ৪১/-
৯৫-৯৬ স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৯৭-৯৮ সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা ৪১/-
৯৯-১০০ নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১০১-১০২ স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১০৩-১০৪ উদ্ধার-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
১০৫-১০৬ হামলা-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০৭-১০৮ প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১০৯-১১০ মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১১১-১১২ লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১১৩-১১৪ অ্যাম্বুশ-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১১৫-১১৬ আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১১৭-১১৮ বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
১১৯-১২০ নকল রানা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১২১-১২২ রিপোর্টার-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১২৩-১২৪ মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১২৫-১৩১ বন্ধু+চ্যালেঞ্জ ৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮ সংকেত-১,২,৩ (একত্রে) ৭১/-
১২৯-১৩০ স্পর্ধা-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১৩২-১৩৩ শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী ৪৮/-
১৩৩-১৩৪ চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
১৩৫-১৩৬ অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে) ৫৬/-
১৩৭-১৩৮ অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে) ৪৬/-
১৩৯-১৪০ মরণকামড়-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪১-১৪২ মরণখেলা-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১৪৩-১৪৪ অপহরণ-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৫-১৪৬ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪৭-১৪৮ বিপর্যয়-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৯-১৫০ শান্তিদূত-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৫১-১৫২ শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে) ৭৫/-
১৫৬-১৫৭ মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে) ৫২/-
১৫৮-১৬২ সময়সীমা মধ্যরাতি+মাফিয়া ৫৯/-
১৫৯-১৬০ আবার উ সেন-১,২ (একত্রে) ৪৭/-
১৬২-১৬৫ কে কেন কিভাবে+কচক্র ৪৭/-
১৬৩-১৬৪ মৃত্যু বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে) ৭৬/-
১৬৬-১৬৭ চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে) ৮৫/-

১৬৮-১৬৯ অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১ যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩ জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫ কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭ কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৬৯/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বহ্নি ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ [illegible]-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৩-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ [illegible] ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৬৫-২৬৭ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো [illegible] ১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মৃত্যুঞ্জয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অহংপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৪৩/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৩/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৫০/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৫৫/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৩৮২-৩৮৩ মৃত্যুশীতল স্পর্শ ১,২ (একত্রে)	৭৮/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৭০/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৬৭/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-

ব্ল্যাকমেইলার

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

'মারা যাচ্ছি আমি!' ভাবনাটা যেন ঝাঁকি দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এল ডিন মার্টিনকে। ঘোলাটে মগজটা সাফ হয়ে গেল আবার। বিড়বিড় করল ও, 'না, মরব না, কিছুতেই মরব না!'

লম্বা, পাকানো রশির মত দেহ ওর। চওড়া একটা পাথুরে তাকে বসে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। ভাল হাতটা দিয়ে সরিয়ে দিল কপালে এসে পড়া এক গোছা চুল।

মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করছে। পাথরে বাড়ি খেয়েছিল ওর মাথা। মগজের পরিষ্কার ভাবটা বেশিক্ষণ রইল না। আবার ঘোলাটে হয়ে এল। এখানে পড়ে যাওয়ার পর থেকে, গত এক ঘণ্টায় অন্তত ছয়-সাতবার এমন হয়েছে। প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চলে যায়। ঘোরের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে। অতীতের একটাই ভয়ানক স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। ঘেমে নেয়ে ওঠে শরীর।

ছয়শো ফুট নীচে গভীর গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে বইছে টার্ন নদী, এঁকেবেঁকে চলে গেছে পশ্চিমে জ্যারোনি নদীর দিকে, স্রোতের মৃদু কুলকুল শব্দ কানে আসছে। উপত্যকার চুনাপাথর কেটে একই ভঙ্গিতে বয়ে চলেছে দশ লক্ষ বছর ধরে। এখান থেকে আঠারো ফুট ওপরে পাহাড়ের চূড়া, ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল ও। অন্য পাড়ের ঝোপেঝাড়ে ভরা গিরিখাতের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিল। সূর্য ছিল তখন মাথার ওপর, মার্চের নরম রোদ ছড়াচ্ছিল।

মনে পড়ল, পিঠে বাঁধা ছোট ব্যাকপ্যাকটাকে সোজা করার জন্য ঘুরতে গিয়েই বিপত্তিটা ঘটেছে। শ্যাওলায় ঢাকা পিচ্ছিল পাথরে পা পিছলে ছিল। তারপরের কথা আর মনে করতে পারছে না। ঘটনাটা ঘটেছে এখন থেকে তিন ঘণ্টা আগে, ঘড়ি দেখে বুঝেছে। বাঁ হাতে ব্যথা পেয়েছে। আঙুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত ফুলে গেছে। এতই ফোলা, ঘড়ি খুলে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। হাড় ভেঙেছে বোধহয়।

আবার ঘড়ির দিকে তাকাল ও। সাড়ে-তিনটে বাজে। জোর করে টেনে তুলল নিজেকে। উঠে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকাল। খাড়া উঠে গেছে পাথরের দেয়াল। বেশি নয়, মাত্র আঠারো ফুট। খাঁজ আর ফাটলও আছে কিছু। এমনিতে বেয়ে ওঠা কঠিন হলেও অসম্ভব হতো না। কিন্তু বাঁ হাত অকেজো হয়ে গিয়েই বেকায়দা করেছে। ভাঙা হাত নিয়েই ওঠার চেষ্টা করেছিল একবার। প্রচণ্ড ব্যথায় বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠেছিল মাথা। জ্ঞান হারিয়ে তাক থেকে নীচে পড়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বসে পড়েছিল আবার।

আশপাশটা ভালমত দেখল আরেকবার ও। তাকটা দেখতে অনেকটা তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মত। লম্বায় ফুট বিশেক হবে। ও যেখানে বসে আছে

সেখানটা ছয় ফুট চওড়া। দুই মাথা সরু হতে হতে মিশে গেছে পাহাড়ের গায়ে। এখান থেকে বেরোনোর একটাই উপায়, ওপর দিকে ওঠা—যেখান থেকে পড়েছে, সেখানে উঠে উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে নামতে হবে।

আবার ঘোলাটে হয়ে আসছে মগজ। ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে ও। ফিরে এল পুরনো দুঃস্বপ্নটা। এই নিয়ে কল্পনায় কতবার যে গ্রেনেডটাকে গড়াগড়ি খেতে দেখেছে প্লেনের সিটের ফাঁকে। যেন কানে আসছে এখনও আতঙ্কিত যাত্রীদের চিৎকার। সিটে বসা অল্প বয়েসী লোকটার সাদা হয়ে যাওয়া মুখটা দেখতে পাচ্ছে। পাশে বসা ওর তরুণী স্ত্রী আর একটা ফুটফুটে বাচ্চা। নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে ওদের বাঁচাতে গ্রেনেডের ওপরই ঝাঁপ দিয়েছিল লোকটা। কিন্তু আটকাতে পারেনি। কালো আনারসের মত দেখতে জিনিসটা গড়াতে গড়াতে চলে গেছে সিটের নীচে, বিস্ফোরিত হয়েছে কলজে-কাঁপানো শব্দে।

ঝটকা দিয়ে আবার জেগে উঠল ও। দুই হাতে কান ঢেকে ফেলেছে নিজের অজান্তে। চিবুক বেয়ে ঘাম ঝরছে, এদিকে শীত লাগছে। ঘড়ি দেখল আবার। চারটে বাজে। সন্ধ্যার দেরি নেই। তাপমাত্রা আরও কমবে, একেবারে শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি নেমে যাবে। ব্যাকপ্যাকে একটা হালকা শাওয়ারপ্রুফ টপ-কোট আর এক টুকরো চকলেট আছে। এক ফ্লাস্ক কফিও ছিল, তবে ওপর থেকে পড়ার সময় পাথরে বাড়ি লেগে ছিটকে চলে গেছে ওটা কোথায় কে জানে। একটা রাত হয়তো কোনওমতে কাটাতে পারবে এখানে ও, তারপর আর সম্ভব নয়।

নদীর ওপারে হাজারখানেক গজ দূরে রয়েছে রাস্তাটা। এখান থেকে রাস্তার একটা অংশ চোখে পড়ছে, প্রায় একশো গজ দীর্ঘ, একটা বাঁক। আগেরবার যখন হুঁশ ফিরেছিল, মনে আছে, অন্তত দু'বার ওই পথে গাড়ি যেতে দেখে রুমাল নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দৃষ্টিপথে দশ সেকেণ্ডের বেশি স্থায়ী হয়নি গাড়িগুলো। এত সামান্য সময়ে ওর দিকে আরোহীদের চোখ পড়ার কথা নয়।

খিদেয় মোচড় দিল পেট। খাওয়া দরকার। চকলেটের জন্য ব্যাকপ্যাক হাতড়াচ্ছে, এ সময় একটা গাড়ি এসে থামল রাস্তার বাঁকে। একটা ভ্যান, সম্ভবত ডোরমোবিল। দূর থেকে খেলনার মত লাগছে। এক মুহূর্ত পর গাড়ি থেকে নামল দুটো পেঙ্গুইন। আসলে দুজন মহিলা। সাদা-কালো পোশাকে দূর থেকে ওদের পেঙ্গুইনের মত লাগছে।

'নান,' বিড়বিড় করল ও। নিজেকে বলল, 'মাই ডিয়ার ডিন, এখনও তোমার ওপর থেকে ঈশ্বরের করুণা একেবারে চলে যায়নি। ওই দেখো, তোমাকে উদ্ধারের জন্যে তিনি দুজন নানকে পাঠিয়েছেন।'

বার বার পিছন দিকে তাকাচ্ছে ওরা, যেদিক থেকে এসেছে। মাঝে মাঝে হাত তুলে পরস্পরকে কী যেন বলছে।

রুমাল নেড়ে ওদের চোখে পড়ার চেষ্টা করল ডিন। নাড়তে নাড়তে হাত ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু মহিলাদের চোখে পড়ল বলে মনে হলো না। হতাশ হয়ে শেষে আকাশের দিকে মুখ তুলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলল, 'নান পাঠিয়েছ না কচু, ওরা তো আমার দিকে তাকাচ্ছেই না! দেখো, দেখো, ওপরে বসে বসে আমার দুর্দশা দেখো! তোমার তো মজাই লাগছে, হতচ্ছাড়া বুড়ো ভাম কোথাকার!'

একটু চকলেট ভেঙে মুখে দিল ও। চোখ রাস্তার দিকে। গলা শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে। বিস্বাদ লাগছে চকলেট। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। কখন আবার ঘোরের মধ্যে চলে গেছে, বলতে পারবে না।

দুজনের মধ্যে অল্পবয়েসী নানটির চেহারা সুন্দর, গোলগাল মুখ। ও দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার কিনারে, নদীটার ধারে। একসময় এখানে পাথরে তৈরি সাদা রঙ করা নিচু বেড়া ছিল, এখন অনেক জায়গাতেই ভেঙে গেছে। বেড়ার ওপাশে খাড়া নেমে গেছে গিরিসঙ্কটের দেয়াল, প্রায় ছয়শো ফুট নীচে। রাস্তার অন্যপাশে পাহাড়ের দেয়াল।

ওর সঙ্গী, দ্বিতীয় মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে ডোরমোবিল ভ্যানটার কাছে। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। এর চেহারাও সুন্দর। চোখা নাক।

পাহাড়ি রাস্তার ঢালের দিকে তাকাল অল্পবয়েসী নান, পাহাড়ের দেয়ালে ঘেরা বাঁক ওখানটায়। নাক টেনে বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'এতক্ষণে তো ওই বিটকেল জন্তুটার চলে আসার কথা। সারাদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?' ইংল্যাণ্ডের লিভারপুলের ঢঙে কথা বললেও আমেরিকান টান বোঝা যায় পরিষ্কার।

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে দ্বিতীয় নান। 'দেখো, জেনি, বারবার কিন্তু সাবধান করতে পারব না তোমাকে।' এর উচ্চারণে স্কটিশ হাইল্যাণ্ডারদের টান। 'ছিহ্, এ রকম বাজে ভাষায় কথা বলে নাকি নানেরা? তা ছাড়া তোমার মত সুন্দরী ভদ্রমহিলার কণ্ঠে ওসব অভদ্র কথা মানায়ও না।'

মুখ বাঁকিয়ে হাসল জেনি। জ্বলে উঠল ওর কালো ধোঁয়াটে চোখ। 'হুঁ, নিউ অর্লিয়ান্সের বেশ্যার মুখে মানায়।'

'উফ্, আজ কী হয়েছে তোমার, জেনি? আমাকে খোঁচাচ্ছ কেন? কবে অস্বীকার করেছি, আমি পতিতাদের সর্দারনী ছিলাম? তুমি জানো, *ভদ্রলোকদের* মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতাম নিতান্তই পেটের তাগিদে। ওই পেশায় না গিয়ে উপায় ছিল না আমার!'

'জানি, মিসেস মেরি ফ্রিজেট, প্রয়োজনের তাগিদেই তো ওসব *ভদ্রলোকদের* মনোরঞ্জন করতে এই পেশায় আসে আমাদের মত অভাবী মেয়েরা, পরে স্বভাব বদলে যায়। তা ছাড়া তোমার পাল্লায় পড়েই নাম লিখিয়েছিলাম। এর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলার কী সম্পর্ক? মন খুলে কথাও বলা যাবে না নাকি?'

'এ নিয়ে পরে আরেকদিন কথা বলব,' কিছুটা কঠিন হলো মেরির কণ্ঠ। 'শোনো, ওই কাজটা যখন নিয়েছিলে, তখন কিন্তু খুশি হয়েই নিয়েছিলে। ওটা থেকে যে বেঁচে গেলে, আমারই কল্যাণে, তার জন্যে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও। কী, আমি তোমাকে তুলে আনিনি, অস্বীকার করতে পারবে?'

'না, অস্বীকার করছি না। তবে এনেছ আমার যোগ্যতার কারণে। তোমার পতিতালয়ের আর কেউ অন্যের গলায় ক্ষুর চালানোর সাহস রাখে না, কিংবা পিয়ানোর তার দিয়ে গলায় ফাঁস পরাতে পারে না। তা ছাড়া, তোমার নোংরা সমকামিতায় আমি ছাড়া আর কে সাড়া দিত, সহযোগিতা করত, বলো?' তিক্ত হাসি ফুটল জেনির ঠোঁটে।

মেরির সুন্দর নাকের নীচে ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে গেল। 'তোমার মনটা খুব নীচ, জেনিফার গ্রেগ। ঠিক আছে, ভাল না লাগলে কোরো না। জো লুইকে বলব?'

সতর্ক হয়ে গেল জেনি। বদলে গেল মুখের ভাব। এতক্ষণে খেয়াল হলো, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। সহজে মেজাজ খারাপ করে না মেরি। যখন ও জেনিফার গ্রেগ বলে ডাকে, বুঝতে হবে প্রচণ্ড রেগে গেছে। আর মেরির রেগে যাওয়াটা বিপজ্জনক। খুবই বিপজ্জনক।

জেনির ধোঁয়াটে চোখ থেকে রুক্ষতা উধাও হয়ে গেল, অনুশোচনা দেখা দিল সেখানে। তোয়াজের ভঙ্গিতে বলল, 'সরি, মেরি, সত্যিই আমি দুঃখিত। আসলে, এমন একটা কাজে আছি, এত উত্তেজনা, মন-মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না, মুখ ফসকে আজেবাজে কথা বলে ফেলি। প্লিজ, জো লুইকে কিছু বোলো না। গতবার কী যে ভয়ঙ্কর অত্যাচারটা করেছে আমার ওপর...'

মৃদু একটা শব্দ কানে আসতেই থেমে গেল ও। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুজনে। রাস্তার কিনারে বেড়ার মত দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় বিশ ফুট উঁচু পাহাড়ের দেয়াল থেকে লাফিয়ে নেমেছে একজন লোক। পরনে গাঢ় রঙের স্ল্যাকস আর ব্লেজার, গায়ে হালকা হলুদ শার্ট, গলায় বাঁধা কালো রুমাল। বুকের কাছে ঝুলছে একটা ফিল্ড গ্লাস। ঝাড়া সওয়া ছয় ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, এতবড় একটা শরীর নিয়ে অবিশ্বাস্য হালকা ভঙ্গিতে হাঁটে, মনে হয় যেন মাটি স্পর্শ করে না পা, উড়ে চলে। সোনালি দাড়ি আর সোনালি চুল চৌকোনা মুখটাকে ঘিরে যেন সোনালি আভা তৈরি করেছে। চোখ দুটো হালকা নীল। দেখেই বোঝা যায়, প্রচণ্ড শক্তি আর ক্ষমতা ধরে ওই দেহে। লোহার বর্ম পরিয়ে হাতে তলোয়ার ধরিয়ে দিলে মধ্যযুগীয় বীরযোদ্ধা হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে অনায়াসে।

মেরি বলল, 'এই যে, মিস্টার জো লুই, চলে এসেছেন।' জো লুই ওর ডাকনাম, নিজেই চালু করেছে। নাম আসলে লুই ক্যামারো। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই-এর ভক্ত, তাই তখন থেকেই নিজের নামটাকে বদলে জো লুই করে নিয়েছে। মিস্টার না বললে বা আসল নামে ডাকলে ও অখুশি হয়। তাই সবাই ওকে *মিস্টার জো লুই* বলে ডাকে, আসল নামে ডাকার সাহস পায় না, এমনকী ওর বস্ হেনরি ক্লিঙ্গারও না।

মেরির কথায় হেসে মাথা ঝাঁকাল জো লুই। এক মাইল পথ দৌড়ে এসেছে, পাহাড়ি পথে, ভাঙা পাথরের টুকরো মাড়িয়ে, কিন্তু পরিশ্রমের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না ওর চেহারায়। হাঁপাচ্ছেও না একটু।

'গাড়িটা আসছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তোমরা তৈরি?'

'হ্যাঁ, মিস্টার জো লুই। পরিকল্পনায় কোনও পরিবর্তন হয়নি তো?'

'না, মিসেস ফ্রিজেট। তুমি আর জেনি প্রথমটুকু শেষ করো। আমি লুকিয়ে থেকে চোখ রাখব, সময় হলেই বেরোব।'

'ভাববেন না, মিস্টার জো লুই। আমি আর জেনি ঠিকমতই সেরে ফেলব। তারটাও রেডি রেখেছে ও।'

'তোমাদের দুজনের ওপরই আমার বিশ্বাস আছে, মিসেস ফ্রিজেট।' কঠিন হয়ে উঠল জো লুই-এর দৃষ্টি। 'তবে, মনে রেখো, জেনিকে যদি কোনও কারণে

তারটা ব্যবহার করতে হয়, তোমার ওপর আমি খুশি হব না। আর তারপর কী ঘটবে, সে তো নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছ।'

রক্ত সরে গেল মেরির মুখ থেকে। 'না, আসলে বলতে চাইনি, মুখ ফসকে তারের কথাটা বেরিয়ে গেছে।'

'ভবিষ্যতে মুখ ফসকানোর ব্যাপারেও সাবধান থাকবে, মিসেস ফ্রিজেট। মুখ ফসকানোও আমি পছন্দ করি না।' রাস্তার পাশে চলে গেল জো লুই। দ্রুত হেঁটে পৌঁছে গেল পাহাড়ের দেয়ালটা যেখানে নিচু হয়ে এসেছে সেখানে। দেয়ালের মাথা এখানে আট ফুটের মত উঁচু। হাত বাড়িয়ে কিনারটা ধরে এক দোল দিয়ে উঠে গেল ওপরে, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে।

ভ্যানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জেনি। জ্যাক বের করে গাড়ির একটা চাকার কাছে রাখল। 'ইস্, ওর গলায় যদি ফাঁসটা পরাতে পারতাম!' বিড়বিড় করল ও। 'সামান্য একটু ভুল করলেও এমন নির্যাতন করে, উফ্...'

হাজার গজ দূরে, সর্পিল রাস্তাটার বাঁকের ওপাশে, স্বাভাবিক গতিতে ছুটে আসছে একটা পিজো ৫০৪ গাড়ি। হাই তুলল পিছনের সিটে বসা সলীল সেন। ফ্রান্স সহ পশ্চিম ইউরোপের পাঁচটি দেশের বিসিআই রেসিডেন্ট চিফ ও—অবশ্যই এমব্যাসির ছত্রছায়ায়। বিভিন্ন পরিচয়ে কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পঁয়ত্রিশজন এজেন্টের হেড। ক্লান্ত, কিন্তু খুশি সলীল। ব্রাসেলস-এ ন্যাটো ইনটেলিজেন্সের কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাজ হচ্ছিল, তাতে চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করে এসেছে। প্রচণ্ড খাটুনি গেছে গত একটা হপ্তা। তারপর গত আট ঘণ্টা ধরে ছুটছে ফ্রান্সের রাস্তায়। আর মিনিট বিশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওবার্য ডু টার্ন-এ—লা মেলানি পাহাড়ের উপত্যকায় বয়ে যাওয়া একটা নদীর ধারের ছোট্ট সরাইখানায়। ওখানে সোহানা ও রানা আছে, ছুটি কাটাচ্ছে।

চারদিন থাকবে ওখানে সলীল। কোন কাজ নেই—শুধু হাঁটাহাঁটি, মাছ ধরা, গল্প। সন্ধ্যায় রানা-সোহানার সঙ্গে তাস খেলে কাটাবে ও। ভাবতেও ভাল লাগছে। কতদিন যে এভাবে বিশ্রাম নেয়নি, মানে, নিতে পারেনি। সামনের আঁকাবাঁকা পথটার দিকে স্বপ্নিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আগামী দিনগুলোর কথা ভেবে মনে মনে রোমাঞ্চিত হচ্ছে ও। হুইলের ওপর ঝুঁকে থাকা ড্রাইভারের হাত নড়ার সঙ্গে ক্রমাগত কেঁপে কেঁপে ওঠা পিঠের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জন, আমাকে নামিয়ে দেয়ার পর কী করতে হবে তোমাকে, মনে আছে তো?'

'আছে, সার,' জনের লাল চুলভর্তি মাথাটা ওপরে-নীচে ঝাঁকি খেল। 'মিলাউতে চলে যাব, মডার্ন হোটেলে রুম বুক করব, সেখানে মিস্টার রয় কনারির কোনও নির্দেশনা আসে কি না, সেই অপেক্ষায় ওখানে থাকব দুদিন। দুদিন পরেও যদি তিনি কোনও খবর না দেন, অফিসে ফোন করে পরবর্তী নির্দেশ জেনে নিতে হবে আমাকে। মার্চ কোড, ভ্যারিয়েশন সিক্স।'

'গুড।' সন্তুষ্ট হয়ে সিটে হেলান দিল সলীল সেন। মাসখানেক হলো লোকটা ওর ড্রাইভারের কাজ করছে, খুবই দক্ষ। সলীলের খুব পছন্দ ওকে। কথা না বলে থাকতে পারে না জন। আজ কেন যেন বড় বেশি চুপচাপ। প্রথম থেকেই

ব্যাপারটা লক্ষ করলেও এতক্ষণ কিছু বলেনি সলীল। জিজ্ঞেস করল, 'আজ মুখে কথা নেই কেন, জন? কিছু হয়েছে নাকি?'

'কই, না তো, সার!' চমকে উঠল জন। মাথা নাড়ল। 'না, কিছু না। আমি তো ঠিকই আছি। কেন?'

'কিন্তু এত চুপচাপ যে?'

'ভাবলাম, এই ক'দিন তো অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রচুর খাটনি গেছে আপনার, বিশ্রাম নিচ্ছেন—তাই বিরক্ত করিনি।'

'ও।'

আবার আগামী কয়েকটা দিনের কথা ভেবে সুখস্বপ্নে বিভোর হল সলীল। কতদিন এমনি একসাথে হয়নি ওরা! রানা-সোহানার সঙ্গে তিন-চারটে দিন কাটালেই, ওর ধারণা, ভাল হয়ে যাবে ওর অসুখ। হঠাৎ গাড়ির গতি কমে যাওয়ায় ভাবনায় ছেদ পড়ল ওর। দেখল, পাহাড়ের একটা বাঁকের মধ্যে ঢুকেছে গাড়ি, রাস্তার পাশে একটা ডোরমোবিল ভ্যান দাঁড়ানো, চাকার কাছে জ্যাক রাখা। দুজন নান রয়েছে সেখানে, একজন লিক হওয়া চাকা বদলানোর একটা ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়েল দেখছে, আরেকজন তাকিয়ে আছে সলীলের পিজোটার দিকে।

ওদের দশ কদম দূরে গাড়ি রাখল জন। ইঞ্জিন চালু রেখে সলীলের দিকে ফিরে তাকাল। 'চাকা পাংচার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, সার। বদলে দিতে যাব?'

'নিশ্চয় যাবে। মহিলা মানুষ, এ রকম নির্জন পথে আটকা পড়েছে, সাহায্য তো করাই উচিত।'

প্রথমে এসি, তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করল জন, গাড়ি থেকে নামল। পিছনের দরজা খুলে দিয়ে সলীলকে বলল, 'হাত-পা একটু নেড়ে-চেড়ে নিন, সার।'

'না। বসেই থাকি। নামলেই ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'বলার দরকার কী, সার। অন্যদিকে যেতে পারেন। বাইরের তাজা বাতাস খেয়ে নিন দশটা মিনিট।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল সলীল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ, ভুরুর ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'ইচ্ছে হলে আমি নিজেই নামব, জন। কিন্তু তোমার কী হলো? শরীর খারাপ লাগছে?'

জনের ডান হাতটা ওপরে উঠল। অবাক হয়ে সলীল দেখল, ওর হাতে একটা .৩৮ স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন রিভলভার, দুই ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল। তাক করে ধরেছে তাঁর দিকে।

'নামুন,' চাপা স্বরে আদেশ দিল জন।

রিভলভারের ব্যারেলটার দিকে তাকাল সলীল। বুঝল, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না জন। আস্তে পা বাড়াল দরজার দিকে, সিটের বাইরে। কী করবে, ভাবছে। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলভারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। একটা সময় ছিল, যখন এ ধরনের কাজ অনেক করেছে ও। কিন্তু এখন ক্ষিপ্রতা বলতে

কিছুই নেই আর। ইজরাইলে একটা অ্যাসাইনমেন্টে গিয়ে শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়েছিল। অনেক মেরেছিল ওকে ওরা। তারপর কথা আদায়ের জন্য ড্রাগ পুশ করেছিল। রানা ও বিসিআইয়ের নতুন একটা ছেলে ইসমাইল মিলে অনেক কষ্টে ওকে উদ্ধার করে এনেছিল। ভয়ঙ্কর ওই রাসায়নিক ওর দেহের মেটাবলিক সিসটেমকে গড়বড় করে দিয়েছে। থলথলে মোটা হয়ে গেছে শরীর। রানারই বয়েসী, অথচ দেখলে মনে হয় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর। কোনমতে দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু মগজের ক্ষমতা সামান্যতম নষ্ট হয়নি বলে ওকে বাংলাদেশের ওয়েস্ট ইউরোপিয়ান যোনের হেড বানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্যারিসে অফিস।

জনের দিকে তাকিয়ে আছে সলীল। মোটেও আনাড়ি মনে হচ্ছে না লোকটাকে। এমনভাবে রিভলভারটা ধরেছে, সলীল ওটার কাছে পৌঁছবার সময় পাবে না, তার আগেই ট্রিগার টিপে দিতে পারবে জন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল দুজন নান। আঙুল তুলে ওদের দেখাল সলীল। বলল, 'তা হলে এরাও তোমার দলে, তাই না, জন? প্ল্যান করেই গাড়িটা রেখেছ এখানে?'

এক মুহূর্তের জন্য ওদের দিকে তাকাল জন। সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইল সলীল। সামনে লাফ দিল। হাত দিয়ে থাবা মারল জনের রিভলভার ধরা হাতে, একইসঙ্গে হাঁটু চালাল ওর দুই পায়ের ফাঁকে। কিন্তু এতই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে গেল জন, সলীলের হাঁটুর গুঁতো আসল জায়গায় না লেগে লাগল ওর উরুতে। আর রিভলভারে সলীলের হাত স্পর্শ করার আগেই ওটা সরিয়ে নিয়েছে জন। বাঁট দিয়ে সলীলের মাথার একপাশে বাড়ি মারল।

টলে উঠল সলীল। চোখের সামনে হাজার তারা জ্বলতে দেখছে। পড়েই যেত, গাড়িটা ধরে পতন ঠেকাল কোনমতে। পা দুটো যেন রাবার হয়ে গেছে। রিভলভারের শক্ত নলের মুখ চেপে বসল পিঠে। কানের কাছে শুনতে পেল রুক্ষকণ্ঠের নির্দেশ, 'একদম চুপ!'

সলীলের দু'বাহু চেপে ধরল কতগুলো মেয়েলি আঙুল। জ্যাকেটের হাতা ঠেলে তুলে দেয়া হলো ওপর দিকে। হাতটা ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করল সলীল। পারল না। ফিরে তাকিয়ে দেখল, দুজন নানের মধ্যে লম্বাজন ধরেছে ওকে। মেয়েমানুষ হলেও গায়ে প্রচুর শক্তি।

সলীলের কব্জিটা নিজের বগলে চেপে ধরল মহিলা। অল্পবয়েসী নানকে বলল, 'জেনি, সুঁইটা দাও।'

অল্পবয়েসী নানের গোলগাল মুখটা বেশ সুন্দর। কিন্তু কালো চোখের ধোঁয়াটে দৃষ্টি শয়তানি ও নিষ্ঠুরতায় ভরা।

হাতে সুচ ফোটানোর ব্যথা পেল সলীল। মাংসে ওষুধ ঢোকার যন্ত্রণা। তারপর হঠাৎ করেই অন্ধকার নেমে এল চোখে।

পিছিয়ে গেল জন। রিভলভার নামাল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তাকিয়ে আছে দুই মহিলার দিকে। আস্তে করে সলীলের দেহটা মাটিতে নামিয়ে রাখল ওরা। তারপর মুখে আঙুল পুরে জোরে শিস দিল জেনি।

পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালের মাথায় দেখা দিল কালো ব্লেজার পরা একজন লোক। নীচে তাকিয়ে পরিস্থিতি দেখল ও, মাথা ঝাঁকাল, তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দে লাফিয়ে নেমে এগিয়ে এল সলীলের দিকে।

'ভেরি গুড, লেডিয,' হাসিতে উজ্জ্বল হলো লোকটার মুখ। নিচু হয়ে এত সহজে সলীলের দেহটা কাঁধে তুলে নিল, যেন খড় ভরা পুতুল। এগিয়ে গেল ভ্যানের দিকে। বয়স্ক নান অনুসরণ করল তাকে। অল্পবয়েসী মেয়েটি জনের কাছে দাঁড়িয়ে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কেউ কথা বলছে না। পকেটে রিভলভারটা ঢুকিয়ে রাখল জন। কালো ব্লেজার পরা লোকটি ডোরমোবিলের ভিতরে একটা বাংকে সলীলের দেহটা রেখে বাংকে আটকানো চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধল। ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপর নজর রাখল বয়স্কা নান। কাজ সেরে পিজোর কাছে ফিরে এল ব্লেজার পরা লোকটা।

'তোমার কাজে আমি খুশি, জন।' জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম বের করল ও। 'এখানে দশ হাজার ডলার আছে। আগে দিয়েছি দশ, এই নাও বাকিটা। খুশি?'

সামনের দুদিকের দুই মোড়ের দিকে হেঁটে গেল দুই নান, নজর রাখার জন্য।

খাম খুলল জন। নোটগুলো বের করল। হাত কাঁপছে ওর। গুণে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।' নোটগুলো খামে ভরে পকেটে রাখল ও।

'কী বলতে হবে মনে আছে তো?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'আছে,' জন বলল। 'একটু হাত-পা ছড়ানোর জন্যে নামতে চেয়েছিল সলীল সার। ভাঙা বেড়াটার ওই পাথরগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি জানালার কাঁচ মুছছিলাম। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, তিনি নেই। তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে রাস্তার কিনারে গিয়ে নীচে উঁকি দিলাম। দেখলাম, সার নদীতে পড়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল জো লুই। ওর ফ্যাকাসে নীল চোখে মিটিমিটি হাসি। 'হ্যাঁ, এর বেশি একটা কথাও কিন্তু বলবে না। বেশি বলতে গেলেই বিপদ। যাও, এখন সবচেয়ে কাছের বুথটাতে গিয়ে ফোন করে তোমার বসের নদীতে পড়ে যাবার খবর তোমাদের অফিসে জানাও।'

ঘুরে গাড়ির দিকে এগোল জন। নড়ে উঠল জো লুই। রাস্তার এপাশ ওপাশ দেখল। পাথরের মূর্তি হয়ে দুই মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দুই নান।

চোখের পলকে জনের পিছনে চলে এল জো লুই। ওপরে উঠে গেল ডান হাতটা। প্রচণ্ড বেগে নেমে এল আবার। দায়ের কোপের মত এসে লাগল জনের মাথার পিছনে। ভোঁতা ধরনের বিশ্রী একটা শব্দ হলো।

গাড়িতে ঢোকার জন্য নিচু হয়েছিল জন। উপুড় হয়ে পড়ে গেল সিটের ওপর। খুলিতে তিন ইঞ্চি একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। ভাঙা হাড়ের কোনা মগজে গেঁথে গেছে। এখনও মরেনি ও, তবে মরতে দেরি হবে না। ওর পকেট থেকে রিভলভার আর টাকার খামটা বের করে নিজের পকেটে রাখল জো লুই। আবার তাকাল নানদের দিকে। আগের মতই রাস্তা পাহারা দিচ্ছে ওরা।

পিজোর পিছনের দরজাটা খোলাই রয়েছে। ভালমত সেটাকে দেখল একবার

জো লুই। পাল্লার নীচটা চেপে ধরল এক হাতে। অন্যহাতটা হালকা ভাবে ধরল জানালার ওপরের ফ্রেম। এবার উপর দিকে টানতে আরম্ভ করল। কয়েকটা মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। তারপর ধীরে ধীরে বিশ্রী ধাতব শব্দ তুলে ছুটে যেতে শুরু করল পাল্লার কব্জা। নীচের কব্জা ছুটে গিয়ে শুধু ওপরের একটিমাত্র কব্জায় ঝুলে রইল পাল্লাটা। টান দিয়ে সেটাকে ছাতের ওপর তুলে চিত করে রাখল ও। সরে এসে জনের অজ্ঞান দেহটাকে পাশের সিটে সরিয়ে দিয়ে নিজে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে।

চাবিতে মোচড় দিতেই চালু হয়ে গেল গাড়ির ইঞ্জিন। চালাতে শুরু করল জো লুই। সেকেণ্ড গিয়ারে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলল খাদের কিনারে পাথরের বেড়ার দিকে। কয়েক ফুট দূরে থাকতে ঝাঁপ দিল রাস্তায়। এক গড়ান দিয়ে সোজা হলো। পরক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিড়ালের ক্ষিপ্রতায়। দেখল, এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। ভাঙা দেয়ালে গুঁতো মারল। তারপর কয়েকটা পাথর নিয়ে মাথা নিচু করে পড়ে গেল। দুই লাফে কিনারে চলে এল জো লুই। পড়ে যেতে দেখছে গাড়িটাকে। কোথাও কোন বাধা না পেয়ে ডিগবাজি খেয়ে সোজা গিয়ে ছয়শো ফুট নীচের পানিতে পড়ল ওটা।

ডোরমোবিলের কাছে ফিরে এল জেনি ও মেরি। জ্যাকেটের ধুলো ঝাড়ছে জো লুই। 'যাই, শেষবারের মত একবার দেখে আসি, কেউ আছে কি না।' বলে, কিনার ধরে দোলা দিয়ে উঠে গেল পাহাড়ের দেয়ালের ওপর।

বিড়বিড় করল জেনি, 'মানুষকে অকারণে কষ্ট দিয়ে মজা পায়!'

'আস্তে, জেনি! শুনে ফেলবে!'

'কী বলব, বলো? লোকটার ঘাড়ে একটা রদ্দা মারলেই হতো, সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত, খুলি ফাটিয়ে দিয়ে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখে কষ্ট দেয়ার মানেটা কী! কেমন পৈশাচিক না? অবশ্য, পাল্লা ছিঁড়ে ফেলার বুদ্ধিটা ভালই করেছে। পুলিশ ভাববে, গাড়িটা পড়ার সময় ছিঁড়ে গেছে পাল্লা। গাড়ির ভিতরের লাশগুলো স্রোতে পড়ে কোথায় ভেসে গেছে কে...'

জো লুইকে লাফিয়ে নামতে দেখে চুপ করে গেল ও। ফিল্ড গ্লাসটা হাতে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগোল দৈত্যটা।

'গিরিসঙ্কটে একজন মানুষ আছে,' বলল ও। 'নদীর ওপারে চূড়া থেকে কিছুটা নীচে একটা কার্নিশে বসে আছে। কখনও নড়াচড়া করছে, কখনও নেতিয়ে পড়ছে। এখন বেহুঁশ হয়ে গেছে মনে হয়।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল মেরি। 'কিছু দেখে ফেলল না তো?'

শ্রাগ করার ভঙ্গিতে নেচে উঠল জো লুই-এর বিশাল চওড়া কাঁধ দুটো। 'দূরবিন ছাড়া পরিষ্কার দেখতে পাবে না। তা ছাড়া, আমার ধারণা, জখম হয়ে পড়ে আছে, তাই ওপরে উঠতে পারছে না। থাকুক আটকে। ঠাণ্ডার মধ্যে একরাত পড়ে থাকলে এমনিতেই মরে যাবে।'

'কিন্তু যদি কিছু দেখে থাকে, আর মরার আগেই কেউ এসে উদ্ধার করে ফেলে...' ওপারের পাহাড়ের দেয়ালটার দিকে তাকাল মেরি। 'ওর মুখ বন্ধ করে দেয়া দরকার, কী বলেন, মিস্টার জো লুই?'

'কাজটা সহজ হবে না। নদীর উজানে গিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। ওপাশে কোনও রাস্তা নেই, গাড়ি চলবে না, ব্রিজের কাছ থেকে হেঁটে আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে যাবে। কমপক্ষে চার-পাঁচ ঘণ্টা লেগে যাবে, মিসেস ফ্রিজেট।' ভ্যানটা দেখাল জো লুই। 'তা ছাড়া গাড়িতে ওই *দামি মালটা* নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মোটেও উচিত হবে না আমাদের।'

'তার মানে পাহাড়ের ওই তাকের ওপরেই লোকটাকে ফেলে যেতে চান?'

'অন্তত আজকের রাতটা তো থাকুক।' ঘড়ি দেখল জো লুই। 'চার ঘণ্টার মধ্যেই হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যাব আমরা, তারপর মিস্টার ক্লিঙ্গার যা ভাল বুঝবেন, করবেন। হয়তো আমাকেই ফেরত পাঠাবেন, কিংবা আর কাউকে। লোকটাকে শেষ করা তো দরকার।'

'হুঁ, আপনি যা ভাল বোঝেন, মিস্টার জো লুই।'

'কথাটা সবসময় মনে রেখো, মিসেস ফ্রিজেট। জানোই তো, চেইন-অভ-কমাণ্ড খুব ভালমত মেনে চলেন আমাদের বস। শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতে তোমাকে আবার যদি আমার কাছে পাঠান, কী ঘটবে কল্পনা করো।' মিটিমিটি হাসি নেচে উঠল ওর চোখে। আচমকা হাত বাড়িয়ে জেনির নিতম্ব খামচে ধরল। 'আমি তখন যা করব, নিশ্চয় খুব পছন্দ করবে মিসেস ফ্রিজেট, তুমি কী বলো, জেনি?'

তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল জেনি। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। বিশ্রী একটা গালি এসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে ঠেকাল। 'না-না!' হাঁপিয়ে উঠে বলল, 'একটুও পছন্দ করবে না ও!'

'যাক, বুঝে ফেলাটা ভাল লক্ষণ।' ডোরমোবিলের পিছনের দরজা খুলল জো লুই। 'তা হলে এখন রওনা হওয়া যাক।' ভিতরে ঢুকে সলীলের অচেতন দেহটার পাশে বসল ও। 'সাবধানে চালাবে, মিসেস ফ্রিজেট। কোনও গোলমাল চাই না। গতির চেয়ে নিরাপত্তা জরুরি, মনে রাখতে হবে।' দরজা লাগিয়ে দিল ও।

সামনের দিকে এগোল জেনি ও মেরি। সামান্য খোঁড়াচ্ছে জেনি। নিতম্ব ডলতে ডলতে দাঁতে দাঁত চেপে হিসিয়ে উঠল, 'বাস্টার্ড! কোনও এক অন্ধকার রাতে গলায় তার পেঁচিয়ে শয়তানটার চোখ দুটো কোটর থেকে যদি বের করে না আনি তো আমার নাম জেনি নয়! উহ্, পাছাটা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে!'

'আবার তুমি আজেবাজে কথা শুরু করেছ, জেনি!' সাবধান করল মেরি। ঝট করে তাকাল একবার জো লুই-এর দিকে। শুনে ফেলেছে কি না, বোঝার চেষ্টা করল।

দুই

চার ঘণ্টা পর। ওবার্য ডু টার্ন সরাইখানায়, নদীর দিকে মুখ করা মস্ত জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। সলীল সেনের ভাঙাচোরা, পানি খেয়ে ফুলে ওঠা লাশটার কথা কল্পনা থেকে দূরে রাখতে চাইছে।

বাড়িওয়ালি ক্যারোলিন ডুয়ার্স সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল, 'সরি, মাম'জেল। সত্যিই দুঃখ জানাবার ভাষা আমার নেই। এভাবে মৃত্যু হবে আপনার বন্ধুর, কে জানত!' রানা ও সলীলের আসার খবর বাড়িওয়ালিকে জানিয়ে রেখেছিল সোহানা।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'হ্যাঁ, সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। আমি ওকে ভীষণ পছন্দ করতাম।'

তিন ঘণ্টা আগে একজন বোটম্যান টার্ন নদী দিয়ে যাওয়ার সময় পিজো গাড়িটা দেখতে পায়। পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোতেও অগভীর পানিতে গাড়িটাকে দেখে পুলিশে খবর দেয়। লা ম্যালানির পুলিশ মোটরবোট নিয়ে গাড়িটা দেখতে যায়। গাড়ির ভিতর থেকে একটা লাশ ও ভাঙা বুট থেকে দুটো ছেঁড়া সুটকেস উদ্ধার করে। গাড়িটা কোনখান দিয়ে পড়েছে, সেই জায়গাটাও খুঁজে বের করেছে তারা। পাথরের দেয়ালে গাড়ির ঘষা লাগার চিহ্ন আবিষ্কার করেছে। ফেরার পথে ওবার্যে চা খেতে এসে ওরা কথায় কথায় গাড়িটার কথা জানিয়েছে। গাড়িতে যে আরও একজন লোক ছিল, সেটা শুনে বলেছে, আগামীকাল সকালে অন্য লাশটা খুঁজতে বেরোবে।

গাড়ির নাম আর ড্রাইভারের চেহারার বর্ণনা শুনে সন্দেহ হয়েছে সোহানার। সলীলও সময়মত সরাইখানায় পৌঁছেনি। ওর কোন খোঁজও নেই। তাই লাশ দেখতে পুলিশ ফাঁড়িতে যায় ও। জনকে শনাক্ত করে। নদীর বাঁকের সেই পাথরের দেয়ালে ঘেরা জায়গাটাও পরীক্ষা করে দেখে এসেছে। গাড়ি পড়ার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। সেসব কথাই ভাবছে এখন জানালায় দাঁড়িয়ে।

টেলিফোন বাজল। ধরার জন্য দৌড়ে গেল বাড়িওয়ালি। একটু পরেই ফিরে এসে জানাল, 'আপনার ফোন, ম্যাম'জেল।'

'থ্যাংক ইউ, ম্যাডাম।'

হলে গিয়ে ফোন ধরল সোহানা। 'হ্যালো?'

'মিস চৌধুরি? আমি। রয়। একটা খবর শুনলাম। আপনি জানেন কিছু?'

'আপনার বসের ব্যাপারে তো? হ্যাঁ, জানি। যেখান থেকে গাড়িটা পড়েছে, সেই জায়গাটাও দেখে এসেছি। জনের লাশও শনাক্ত করেছি।'

বিসিআইয়ের ফরাসি শাখার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড রয় কনারি। একটু ধীর-স্থির, বয়স্ক লোক। রিসিভারে ওর মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল আর্তনাদের মত, 'ও, মাই গড!'

যতখানি জেনেছে, রয়কে জানাল সোহানা। তারপর বলল, 'লাশটা পাবে কি না শিওর হতে পারছে না পুলিশ। জ্যারোনি নদীতেও খুঁজে এসেছে। ওদের ধারণা, স্রোতের টানে সুড়ঙ্গে ঢুকে আটকে গেছে কোথাও, বেরোতে পারেনি আর।'

'হুঁ।' দীর্ঘক্ষণ নীরবতার পর রয় বলল, 'কী মনে হয় আপনার, মিস চৌধুরি? সাজানো দুর্ঘটনা নয় তো?'

'সেটাই ভাবছি, রয়। দেখে অবশ্য সাধারণ দুর্ঘটনাই মনে হলো।'

'কিন্তু আমি মেনে নিতে পারছি না,' নীরসকণ্ঠে বলল রয়। 'গত এক হপ্তার মিটিঙে অনেক জরুরি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ গণ্যমান্য

লোকের সঙ্গে গোপন মিটিং করেছেন বস। কারও কাছে ওসব তথ্য খুবই মূল্যবান বিবেচিত হওয়া সম্ভব।'

'তারমানে, আপনার ধারণা, সলীলকে কিডন্যাপ করা হতে পারে?'

'সেরকমই কি লাগছে না?'

'হ্যাঁ, তা লাগছে। তবে শিওর হওয়া যাচ্ছে না।'

'আমার মনে হচ্ছে আমাদের তরফ থেকে একটা তদন্ত হওয়া দরকার। মাসুদ সাহেবকে কি আপনি জানাবেন, না আমি ফোন করব?'

'আমিই জানাতে পারব। লেডি জোয়ালিন হেইফোর্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেছে ও। ওখান থেকে বেরিয়ে আমাকে ফোন করার কথা রানার। তবে এখন আর ফোনের অপেক্ষায় বসে থাকব না, আমিই ফোন করে সলীলের খবরটা জানাব ওকে। সাহায্য দরকার হলে আপনাকেও জানাব। অ্যাভেইলেব্‌ল্ থাকবেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি রাখি তা হলে?'

'রাখুন।' লাইন কেটে দিল সোহানা।

পাহাড়ি দেয়ালের গা ঘেঁষে শরীরটাকে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে ডিন। পাতলা কোটটা শক্ত করে গায়ে জড়িয়েছে। তাকিয়ে আছে সকালের কাঁচা রোদের দিকে। অন্যপাশে নদীর বাঁকে গিরিসঙ্কটের ওপরটা সোনালি আলো লেগে ঝকঝক করছে। ওর মগজটা এখন অনেকটা পরিষ্কার, কিন্তু মাথার দপদপানি কমেনি। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে রাতটা কেটেছে ওর। শীত, ব্যথা, পিপাসা, হতাশার পীড়নে একেকবার মনে হয়েছে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বহু চেষ্টায় সামলে রেখেছে নিজেকে।

রাতের কোনও একটা সময় আধোঘুম আধোজাগরণের মধ্যে চকলেটটা খেয়ে শেষ করেছে। পানির অভাবে গলার ভিতরটা শুকিয়ে চড়চড় করছে এখন। রোদ লাগলে গা গরম হবে, অবশ হাত-পাগুলোতে হয়তো আবার ঠিকমত রক্ত চলাচল শুরু হবে, কিন্তু পানির অভাব পূরণ হবে কীভাবে? আস্তে করে নিজেকে টেনে তুলল ও। দেয়ালে হেলান দিল। আর ঠিক এই সময় চোখের কোণে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। ও যেপাশে রয়েছে, সেপাশের পাহাড়ের মাথায়, প্রায় একশো গজ দূরে। ভুল দেখল? চোখদুটো রগড়ে নিয়ে আবার তাকাল। না, ঠিকই দেখেছে।

একটা মেয়ে। তরুণী। ওরই কাছাকাছি বয়স। গিরিসঙ্কটের দেয়ালের কিনারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শুরু করল ডিনের হৃৎপিণ্ডটা। চিৎকার করে ডাকতে চাইল। কোলাব্যাঙের ঘড়ঘড়ানি বেরোল শুধু গলা থেকে। তাড়াতাড়ি কোটটা খুলে ভাল হাতে ধরে উঁচু করে নাড়তে শুরু করল। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল তরুণী। সরে গেল কিনার থেকে। আর দেখা যাচ্ছে না।

হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়ল আবার ডিন। হাঁপাচ্ছে। তরুণী ওকে দেখেছে,

কোন সন্দেহ নেই। তা হলে চলে গেল কেন? লোক ডেকে আনতে? এখানে লোক কোথায়? নাকি সবটাই দৃষ্টিবিভ্রম? কল্পনায় দেখেছে সে মেয়েটিকে?

বহু যুগ পরে যেন আবার দেখা মিলল তরুণীর। ওর ঠিক মাথার ওপর দেয়ালের কিনারে সাবধানে এক হাঁটু গেড়ে বসে উঁকি দিয়ে দেখছে। লুকোচুরি খেলছে নাকি মেয়েটা?

'আমার হাত ভেঙে গেছে!' বলল ডিন। গলা ভাঙা। 'দেয়াল বেয়ে উঠতে পারছি না! কাল দুপুর থেকে পড়ে আছি এখানে। প্লিজ, তাড়াতাড়ি লোক ডেকে আনুন। পানির পিপাসায় মারা গেলাম। আর বেশিক্ষণ টিকব না আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। ওর পরনে স্ল্যাকস, গায়ে ঢিলে শার্ট। কাঁধে একটা মোটা কাপড়ের ব্যাগ। 'আমি আসছি। দেরি হবে না। আপনি শুয়ে বিশ্রাম নিন।' বলে চলে গেল মেয়েটা।

দেয়ালে হেলান দিল ডিন। অবাক লাগছে ওর। মেয়েটাকে দেখে বিদেশী মনে হচ্ছে, যদিও বলছে চোস্ত অক্সফোর্ড ইংরেজি। ও এখানে কী করছে? সাধারণ চাষাভুষো নয়, সম্ভ্রান্ত চেহারা। হিপ্পি নয়। পোশাক-আশাকও দামি। অকারণ প্রশ্ন করেনি মেয়েটা, এটা ওর ভাল লেগেছে। কিন্তু সাহায্য নিয়ে ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে ওর?

পাহাড়ের ওপাশে কী আছে, চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলল ডিন। বেশ কয়েক মাইল কোনও গ্রাম বা লোক বসতি নেই। নদীর কিনার ধরে যাওয়া আঁকাবাঁকা পায়েচলা রাস্তা ধরে সেই লা ম্যালানি পর্যন্ত যেতে হবে মেয়েটাকে। চার ঘণ্টার মধ্যে যদি কোন উদ্ধারকারী দল আসে, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে ডিন। ততক্ষণ ও টিকবে তো? কেঁপে উঠল শরীরটা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। দুই বছর আগে ল্যাঙ্কাস্টার হোল নামে একটা গুহায় ঢুকেছিল, সেইখানে লেগেছিল এ-রকম ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে শরীর গরম করার জন্য ব্যায়াম শুরু করল ও। প্রথমে এক পা ছড়াল, তারপর ভাঁজ করল। তারপর আরেক পা, তারপর ভাল হাতটা। ছড়িয়ে-ভাঁজ করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাল।

দশ মিনিট পর শব্দ শুনে আবার মুখ তুলে ওপরে তাকাল। নীচে নামছে মেয়েটা। দড়ি বেয়ে নেমে আসছে। কাঁধে ঝুলছে কাপড়ের ব্যাগটা, জিনিসপত্রে ঠাসা ব্যাগের পেটটা ফুলে রয়েছে। এত দক্ষতার সঙ্গে নেমে আসছে ও, বুঝতে অসুবিধে হয় না, এসব করে অভ্যস্ত—নিয়মিত শরীরচর্চা করে।

ডিনের কয়েক ফুট দূরে নামল মেয়েটা। ঘুরে দাঁড়াল।

'দড়ির খেল তো খুব ভালই দেখালে, বেইবি...' ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল ডিন। 'তোমাকে বললাম, লোক নিয়ে আসতে। একাই চলে এলে যে? আমাকে টেনে তুলবে কী করে?'

রাগ করল না মেয়েটা। শান্ত ভঙ্গিতে ব্যাগটা নামিয়ে রাখল কার্নিশে। কপালে এসে পড়া এক গোছা চুল সরিয়ে দিয়ে ব্যাগ খুলতে আরম্ভ করল। বলল, 'সিকি মাইল দূরে বনের ভিতর আমার গাড়ি রেখে এসেছি। জিনিসপত্র আনতে গিয়েছিলাম। ওপরে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।' ব্যাগ থেকে ফাস্ট-এইড বক্স বের করে ডিনের পাশে বসল ও। ডিনের কপালে হাত দিয়ে জ্বর আছে কি না

দেখল প্রথমে। তারপর ভাল হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগল। 'মাথায় বাড়ি খেয়েছেন?'

রাগ দূর হয়ে গেল ডিনের। মেয়েটার শান্ত ভাবসাব দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ওকে। বিড়বিড় করল, 'হ্যাঁ, জোরে বাড়ি খেয়েছি। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে ঘন ঘন জ্ঞান হারাচ্ছি, না কী হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না; তবে মাথার ভেতর সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে।'

দুই হাতে ডিনের মাথা ধরে প্রথমে কানের ভিতর দেখল ও, দুটো কান পরীক্ষা করার পর নাকের ভিতরটা দেখল। তারপর ঠোঁট টেনে সরিয়ে দাঁতগুলো দেখল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ডিন, 'কী করছেন?'

'কান দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে না, নাকমুখ দিয়েও না, মনে হচ্ছে খুলি ফাটেনি। এখন চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন তো...না না, ওভাবে নয়...আচ্ছা, আমার কোলে মাথা রাখুন...হ্যাঁ, ঠিক আছে। চুপচাপ শুয়ে থাকুন।'

মেয়েটার লম্বা আঙুলগুলো ডিনের চুলের নীচে ত্বকের ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। ডান কানের ওপর এসে থামল, ফোলাটা খুঁজে পেয়েছে, সেখানে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর সরে গেল। বেশ আরাম লাগছে ওর। ধীরে ধীরে ঢিল হয়ে আসছে স্নায়ু। অদ্ভুত মোলায়েম স্পর্শ মেয়েটার।

'হ্যাঁ, হয়েছে, উঠে বসুন এবার।' ডিনকে উঠতে সাহায্য করল মেয়েটা। ওর চোখের সামনে একটা আঙুল এনে বলল, 'আমার আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকুন।' আঙুলের সঙ্গে সঙ্গে চোখের নড়াচড়া পরীক্ষা করল। 'গুড। ঠিক আছে।'

সামান্য সরে বসে ব্যাগটা সামনে এনে রাখল ও। 'একটা এক্স-রে করা দরকার, তবে আমার মনে হয় না মাথায় বাড়ি খাওয়া ছাড়া ভেতরে আর কিছু হয়েছে। পড়ার সময় হাতের ওপর পড়েছিলেন, আসল চোটটা ওটার ওপর দিয়েই গেছে। প্রথমে হাতে লেগেছে, তারপর মাথায় বাড়ি খেয়েছেন।' কাগজে মোড়ানো বড় একটা স্যাণ্ডউইচ, এক প্যাকেট কিসমিস, আর ছোট বোতলে রাখা খানিকটা ব্র্যাণ্ডি বের করে দিল ও।

'আপনার ভাগ্য ভাল, আমি এদিকে এসে পড়েছিলাম,' মেয়েটা বলল। 'আপনি খেতে থাকুন, আমি আপনার জখম হওয়া হাতটার ব্যবস্থা করি।'

ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে রুটিতে কামড় দিল ডিন। খেতে খেতে দেখল, মেয়েটা প্রথমে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার নরম কাপড়ে একটা শিশি থেকে খানিকটা রঙহীন তরল পদার্থ ঢালল। হাতটা নিজের হাঁটুর ওপর রেখে ফোলা কব্জিতে পেঁচিয়ে বাঁধতে শুরু করল কাপড়টা।

রুটির টুকরোটা গিলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল ডিন, 'আপনি কি ডাক্তার?'

'না। তবে আমাকে ফার্স্ট-এইড শিখতে হয়েছে।'

মেয়েটার আচরণে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে ডিন। 'আমার নাম ডিন মার্টিন।'

'হাই, আমি সোহানা চৌধুরি।'

'পুরো নাম ধরেই ডাকতে হবে?'

'নাহ্। ডাকতে কষ্ট হলে শুধু সোহানা বললেই চলবে।'

'আমাকেও তা হলে ডিন ডাকতে পারেন।'

'হ্যালো, ডিন, এখানে পড়লেন কী করে?'

'হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। সেইন্ট শেলির এক সরাইখানায় উঠেছি। হাঁটতে হাঁটতে এদিকে চলে এসে রাতে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে ভেবে মনে করেছিলাম, রাতটা লা ম্যালিনিতেই কাটিয়ে দেব।' মুখ তুলে তাকাল ডিন। 'এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ঝুঁকে নদীটা দেখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ পা পিছলাল।'

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে গিরিসঙ্কটের অন্যপাড়ের দিকে তাকাল সোহানা।

'কাল যখন গাড়িটা নদীতে পড়ে যায়, আপনি নিশ্চয় এখানে ছিলেন। একটা ধূসর রঙের পিজো। পড়তে দেখেছেন না?'

তাকিয়ে রইল ডিন। 'নদীতে পড়েছে? নাহ্, আমি ওটাকে পড়তে দেখিনি।' পুরো স্যাণ্ডউইচটা চেটেপুটে খেয়ে শেষ করে কিসমিসের প্যাকেট তুলে নিল। 'একটু পরপরই বেহুঁশ হচ্ছিলাম। গাড়িটা যখন পড়েছে, আমি নিশ্চয়ই তখন বেহুঁশ। সেজন্যেই দেখিনি।' গিরিসঙ্কটের অন্যপাড়ে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল ও। 'ক'জন লোক ছিল?'

'গাড়িতে? দুজন।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ডিন বলল, 'বেচারারা! এত নীচে পড়তে বেশ সময় লেগেছে। ভাবার সুযোগ পেয়েছে ওরা। নিশ্চয়ই প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছে!'

'হ্যাঁ।' ব্র্যাণ্ডি মেশানো কফি ভরা ফ্লাস্কের ক্যাপ খুলে তাতে খানিকটা কফি ঢালল সোহানা। 'নিন, এটা খেয়ে নিন। কিছুটা শক্তি ফিরে আসুক। তারপর ওঠার কথা ভাবব।'

ধীরে চুমুক দিয়ে একটু একটু করে কফি খেতে লাগল ডিন। দ্রুত উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। হাতের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে আসছে। চুমুক দেয়ার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি গাড়িতে করে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। লা ম্যালানি থেকে দক্ষিণে একটা কাঁচা রাস্তা আছে, ওটা ধরে এসেছি। সাত-আট মাইল স্পিডে গাড়ি চালানো যায়। শেষ দিকটা বেশি খারাপ। তারপর রাস্তাটা মোড় নিয়ে বনে ঢুকেছে। ওখানে গাড়ি রাখা যায়।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ডিন। 'ওখানে গাড়ি রাখলেন। তারপর?'

'গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রথমে দেখতে এসেছিলাম নদীটা। তখনই আপনাকে চোখে পড়েছে।'

'আপনি একা এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হাঁটছিলেন? পাগল নাকি আপনি?'

শ্রাগ করল সোহানা।

এক মুঠো কিসমিস মুখে ফেলে চিবিয়ে গিলে ফেলল ডিন। 'আপনার নামটা কী যেন বললেন, বেইবি? সোহানা চৌধুরি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'খুব সুন্দর নাম।'

'এখন ওঠা যাক। আগে আপনার হাতে একটা স্লিং বেঁধে দিই। তারপর সামান্য হাঁটাহাঁটি করে পেশির জড়তা দূর করুন।' আঠারো ফুট উঁচু দেয়ালটার

দিকে তাকাল ও। 'বেশি উঁচু না, পা রাখার জায়গাও আছে। গাড়ি থেকে ক্রস-ডিন হ্যামার নিয়ে এসেছি। খাঁজগুলো আরও একটু গভীর করে দেব, যাতে ভালমত পা রাখতে পারেন। আমি ওপর থেকে দড়ি ধরে রাখব।'

'অনেক ক্ষমতা আপনার, বেইবি। কোনও সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু আরেকবার পড়তে রাজি নই আমি।'

ডিনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সোহানা। 'ভয় নেই, ডিন। আমি আপনাকে ফেলব না।'

দশ মিনিট পর দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল ডিন। বগলের নীচ দিয়ে বুকেপিঠে দড়ির এক মাথা পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়েছে সোহানা। অন্য মাথা নিজের শরীরে পেঁচিয়ে নিয়ে দেয়ালের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে ও। একটা হাত অকেজো হয়ে থাকায় বার বার ভারসাম্য হারাচ্ছে ডিন। কিন্তু দড়িটা আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসছে ওকে।

অর্ধেক উঠে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁপতে শুরু করল ওর একটা পা। একপাশে ঝুলে পড়ল ওর শরীর। দড়িটা আটকে রাখল ওকে। ওপর দিকে তাকিয়ে সোহানার একটা হাত আর দড়িটা দেখতে পেল ও। বুঝতে পারছে, ওর ভার বহন করতে গিয়ে পিছনে হেলে পড়েছে মেয়েটার শরীর। শান্তকণ্ঠে ডেকে বলল, 'সময় নিন, ডিন। তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি ধরে আছি।'

দাঁতে দাঁত চেপে কাঁপতে থাকা পা'টা মেলে, ভাঁজ করে, কিছুটা স্বাভাবিক করল ডিন। তারপর আরও কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠল। দুই মিনিট পর নিজের দেহের অর্ধেকটা দেয়ালের কিনারে এনে ফেলল। পেটের ওপর বাঁকা হয়ে রয়েছে। ওর বাকি দেহটা টেনে তুলে আনল সোহানা। বুক থেকে দড়ি খুলে গোটাতে শুরু করল। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ডিন। সোহানার হাতে রক্ত দেখতে পেল। দড়ির টানে হাতের উল্টো পিঠের চামড়া ছিলে গেছে। সোহানাও হাঁপাচ্ছে। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। গিরিসঙ্কটের ওপারে চোখ পড়তে কুঁচকে গেল ভুরু। মনে হলো, কিছু একটা অবাক করেছে ওকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ডিন বলল, 'আমি...আপনাকে...প্রচুর কষ্ট দিলাম।'

'ও নিয়ে ভাববেন না। গাড়ির কাছে যাওয়ার আগে বিশ্রাম নিতে চান?'

মাথা নাড়ল ডিন। এতক্ষণে হাসি দেখা গেল মুখে। 'লাগবে না। রক্ত চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। দেহটা আবার নিজের বলে মনে হচ্ছে। আমি তখন আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি।'

'ও কিছু না। আমি কিছু মনে করিনি।'

'এত বিনয়ের দরকার নেই, বেইবি।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সোহানা। 'আপনি কি আইরিশ?'

'কী করে বুঝলেন?'

'কথার টান, চেহারা, সেইসঙ্গে বেয়াড়া মেজাজ।'

'হুঁ। মেজাজটা ঠিক করতে হবে দেখছি।'

'চলুন, এগোনো যাক। হাঁটতে অসুবিধে হলে আমার কাঁধে ভর দিতে পারেন।'

'না, ভর দিতে হবে না, পারব।'

কিন্তু পারল না ডিন—নিঃশেষ হয়ে গেছে শক্তি। পঞ্চাশ কদম যেতে না যেতেই হাঁপিয়ে উঠল। সোহানার কাঁধে ভর দিতে পেরে খুশি হলো। শক্ত করে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে রাখল সোহানা।

বনের কিনারে এসে ডিনকে বসিয়ে দিল ও। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিতে বলল।

'ওহ্‌হো, ধন্যবাদটা দিতেই ভুলে গেছি, সরি,' ডিন বলল। 'আসলে, খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেছি। এ রকম একজন সুন্দরী বেইবি এসে আমাকে উদ্ধার করবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। সত্যি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই আমার।'

'ভাল। তবে এখন *বেইবি* ডাকাটা বন্ধ করা যায় না?'

হাসিতে দাঁত বেরিয়ে গেল ডিনের। 'হ্যাঁ, করলাম বন্ধ। যাক রিঅ্যাক্ট করলেন শেষ পর্যন্ত। আচ্ছা, একটা কৌতূহল মেটান তো। এখানে কী জন্যে এসেছেন?'

'তদন্ত করতে,' জবাবটা দিতে গিয়েও চেপে গেল সোহানা। 'এমনি এসেছি। বেড়াতে।'

'আপনাকে কিন্তু কেউ স্বাভাবিক মেয়ে বলবে না, মিস সোহানা, জানেন সেটা?' আপনাআপনি চোখ বুজে এল ডিনের। চমকে চোখ মেলল আবার, 'মিস না মিসেস! বিয়ে করেছেন?'

'না। উঠুন। আপনি ঘুমিয়ে পড়ার আগেই বাকি পথটুকু পার হতে চাই।' ডিনকে ধরে তুলল সোহানা।

বনের ভিতর ছোট্ট এক টুকরো খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা রেনাও গাড়ি। ওটার কাছে যখন পৌঁছল, শরীরের ভার বেশির ভাগটাই সোহানার ওপর ছেড়ে দিয়েছে ডিন। ওকে প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে সিট-বেল্ট বেঁধে দিল সোহানা। সিটে এলিয়ে পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ডিন। কপালে হাত রেখে সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'মাথার অবস্থা কেমন?'

'তালগোল পাকানো, এ ছাড়া আর কোন অসুবিধে নেই। কাল রাতের চেয়ে তো অনেক ভাল। রাতে মনে হচ্ছিল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এখন শুধু ক্লান্তি লাগছে, আর কিছু না।'

'হুঁ। রাতে মারা পড়েননি, এ-ই বেশি।'

'কিন্তু প্রচণ্ড পিপাসা।'

'বেশ, দিচ্ছি। তবে একসঙ্গে খুব বেশি খাবেন না।' বোতল থেকে পানি ঢেলে দিল সোহানা। গাড়ির পিছনের সিটে ফার্স্ট-এইড বক্সটা রাখল। কাপড়ের ব্যাগ আর দড়ির বাণ্ডিলটা রাখল বুটে। ফিরে এসে দেখে চোখ মুদে রয়েছে ডিন। এই প্রথম ভাল করে ওকে দেখল সোহানা।

বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। ব্যাকব্রাশ করা চুল, কালচে বাদামি। আগেই খেয়াল করেছে, ছেলেটার চোখের রঙ ধূসর-সবুজ। লম্বা নাক। চোখা চোয়াল। সুন্দর দাঁত।

ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে ভ্রূকুটি করল ও। ভাবছে। কী যেন একটা খুঁচিয়ে চলেছে মনকে। ডিনের কোনও একটা কথা, কিংবা বলার ভঙ্গি, কিংবা কিছু

একটা, যা ঠিক খাপে খাপে বসাতে পারছে না। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বনের ভিতর থেকে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। বিশ মিনিট লাগল খারাপ রাস্তাটুকু পেরোতে। তারপর গতি বাড়িয়ে ঘণ্টায় আট মাইলে তোলা গেল

কয়েক মাইল আসার পর লা ম্যালানির দিকে যাওয়া সরু একটা ভাল রাস্তায় পড়ল গাড়ি। ডিনকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছে ও। সোজা মিলাউতে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারে। ঘণ্টাখানেক লাগবে তাতে। কিংবা টুলুজেও যাওয়া যায়। সেখানে একজন পরিচিত ডাক্তার আছেন, ডা. রেনাও সিভেনিজ। শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে তাঁর একটা প্রাইভেট ক্লিনিক আছে—সেখানে নিয়ে যেতে পারে।

বড় কোনও জখম নেই ডিনের, অন্তত সোহানা পরীক্ষা করে দেখে যতখানি বুঝেছে। ডিনের দিকে তাকাল আবার। বয়েস খুবই কম। ফরাসি হাসপাতালে থাকার খরচ জোগাতে পারবে বলে মনে হয় না। ডাক্তার সিভেনিজের কাছে নেয়াই ভাল। কিন্তু ওকে নিয়ে এত ভাবছে কেন ও? সোজা পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়াটাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

কথাটা নিয়ে ভাবছে, ঠিক এমনি সময় গাড়িটা চোখে পড়ল ওর, মাইলখানেক দূরে রয়েছে, আসছে এইদিকেই। গোপন কোনও জায়গা থেকে আচমকা লাফিয়ে যেন রাস্তায় এসে পড়েছে। বড় একটা কালো গাড়ি, সিত্রোঁ সম্ভবত। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওটার কাছে চলে যাবে ও। একটা অগভীর গামলার মত নিচু জায়গায় গিয়ে মুখোমুখি হবে ওরা, রাস্তার দুই পাশে গাছের সারি রয়েছে ওখানে।

আস্তে ব্রেক কষল সোহানা। ড্যাশবোর্ডের নীচের কাবি হোল থেকে একটা ফিল্ড গ্লাস নিয়ে গাড়িটা দেখল ভালমত। সিত্রোঁই। দাঁড়িয়ে পড়েছে ওটাও। গাঢ় রঙের সুট পরা একজন লোক বেরিয়ে এসেছে, সে-ও ফিল্ড গ্লাস চোখে লাগিয়ে দেখছে ওদের। কালো গাড়িটাতে আরও দুজন লোক আছে মনে হলো সোহানার।

মাথার ভিতর বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল ওর। চিন্তিত ভঙ্গিতে ফিল্ড গ্লাসটা রেখে আস্তে ঠেলা দিল ডিনের কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ওর চোখ। সোহানা বুঝল, ও ঘুমায়নি, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'এই এলাকায় আপনার কোনও বন্ধু আছে, ডিন?'

'বন্ধু? না তো!'

'শত্রু?'

হাঁ করে সোহানার দিকে তাকিয়ে রইল ডিন। 'ফর গডস সেক, কী বলতে চাইছেন আপনি, খুলে বলুন তো?'

হাত তুলে দেখাল সোহানা। আবার চলতে শুরু করেছে কালো গাড়িটা। 'ওই গাড়িতে যারা আছে, আমার মনে হয় তারা আপনাকেই খুঁজছে। এ ছাড়া ওদের এখানে আসার আর কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না।'

'আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। আপনিও তো এসেছেন।'

'আর সেজন্যে আমাকে পাগলও বলেছেন। যাকগে, একটু পরেই জানা যাবে কেন এসেছে ওরা।' ক্লাচ ছেড়ে দিল সোহানা, আবার চলতে শুরু করল গাড়ি।

দুটো গাড়ির মাঝে দূরত্ব কমছে। গাছের জটলার কাছে আগে পৌঁছল সিট্রোঁটা, সোহানা তখনও দুশো গজ দূরে। রাস্তার দুই পাশ থেকে চেপে এসেছে ওখানে গাছগুলো। পথ এতই সরু, পাশ কাটাতে পারবে না ও। ওখানেই থামল গাড়িটা। মাথার বিপদসঙ্কেতটা জোরালো হলো আরও।

গাড়ি থেকে নেমে রেনাওটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজন লোক। সবার পরনেই গাঢ় রঙের সুট, দুজনের মাথায় হ্যাট। লোকগুলোর মুখ এখনও ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না, তবে বুঝে গেছে, ভাব-চক্কোর মোটেও ভাল নয় ওদের, আচরণেই সেটা প্রকট। একজন বনেটের পাশে রইল, বাকি দুজন কিছুটা সামনে এগিয়ে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়াল।

গতি কমাল সোহানা। তবে থামল না। বলল, 'ডিন, মন দিয়ে শুনুন, তর্ক কিংবা প্রশ্ন করবেন না। ওই লোকগুলো ঝামেলা করতে এসেছে। কেন এসেছে, হয়তো আপনি জানেন, হয়তো জানেন না; তবে তাতে আর কিছু এসে যায় না এখন। মারপিট সহ্য করার মত অবস্থা নেই আপনার। যা-ই ঘটুক, আপনি নড়বেন না। যেভাবে বসে আছেন, বসে থাকবেন। বুঝেছেন?'

অবিশ্বাসের হাসি হাসল ডিন। 'দেখুন, বেইবি, হঠাৎ করেই প্রলাপ বকা শুরু করেছেন আপনি। আপনার কি মনে হয়, গোটা দুই ওয়ালেটের জন্যে এখানে গাড়ি চালিয়ে এসেছে ওরা?'

'না। আরও বড় কিছুর জন্যে এসেছে। দু'হাতে বুক বেঁধে রেখেছে যে লোকটা, ওর জ্যাকেটের নীচে পিস্তল আছে।' ডিনের দিকে তাকাল সোহানা, 'আপনি বসে থাকুন। যা-ই ঘটুক, বেরোবেন না। স্রেফ বসে থাকবেন।'

কথা বলার সময় স্বর উঁচু করল না, চেহারায় ভাবের কোনও পরিবর্তন নেই, আজব একটা মেয়ে—ভাবছে ডিন। এত শান্ত রাখে কী করে নিজেকে? গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাল ও। বরফশীতল একটা আঙুল যেন ওর মেরুদণ্ড ছুঁয়ে গেল। ওদের মধ্যে এমন কিছু চোখে পড়ল...

রাস্তা এখানে অনেকটা ভাল, তাই গতিবেগ দশে তুলে দিল সোহানা। ডিনের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওর দিকের দরজার ল্যাচ খুলে দিল ও, তারপর নিজের পাশেরটাও খুলল।

'দরজার হ্যাণ্ডেলে একটা আঙুল ঠেকিয়ে রাখুন, যাতে পাল্লা খুলে না যায়,' ডিনকে বলল সোহানা।

যা করতে বলা হলো, করল ডিন। ফিরে তাকিয়ে দেখল, সোহানাও আঙুল দিয়ে নিজের পাশের হ্যাণ্ডেলটা ধরে রেখেছে। অন্যহাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাচ্ছে। ওর ঘোলাটে মগজ বুঝতে পারছে না কী করতে চাইছে মেয়েটা।

আর পঞ্চাশ গজ। আর বড়জোর দশ সেকেণ্ড পরেই থামতে হবে ওদেরকে। সিট্রোঁর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। লোকগুলোর চোখ এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ডিন। ওদের চেহারায় অস্বাভাবিক কিছুই দেখছে না, অথচ মনের গভীরে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছে, ঠাণ্ডা ঘাম জমছে কপালে।

'গাড়ি থামান,' বিড়বিড় করল ও। 'দেখি, ধমকধামক দিয়ে ওদের ভাগানো যায় কি না।'

'যা বলছি, করুন!' বলল সোহানা। 'আর, চুপ করে থাকুন।'

রাস্তার দুই পাশে দাঁড়ানো লোক দুজনের মাঝখান দিয়ে বেরোতে হবে ওকে। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে, গাড়ির দু'পাশে মাত্র দুই ফুট দূরে থাকবে ওরা। তৃতীয় লোকটার যেন এদিকে কোন খেয়ালই নেই, বনেটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা ছুরি দিয়ে নখ খোঁচাচ্ছে।

ডিনকে দরজার হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিতে বলল সোহানা। সামনের লোক দুজনকে পাশ কাটানোর সময় আচমকা ব্রেক কষল। কর্কশ শব্দ করে পিছলে গিয়ে থেমে গেল চাকা। সামনের দিকে ছুটে গেল ডিনের দেহটা, সিট-বেল্টে আটকে ঝাঁকি খেয়ে ফিরে এল আবার। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুই পাশের দরজার পাল্লা।

ডিনের পাশে জ্যাকেট পরা যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়িটা পাশ কাটানোর সময় ও খানিকটা ঘুরে গিয়েছিল—পাল্লাটা গিয়ে বাড়ি মারল ওর বাঁ হাত আর কাঁধে। পড়ে যাওয়ার সময় পাল্লার কোনা লেগে কেটে গেল মুখের একটা পাশ। অন্য লোকটার হাতে জোরসে বাড়ি লাগল—শেষ মুহূর্তে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তুলেছিল হাতটা, বাড়ি লেগে গোটা কয়েক আঙুল ভাঙল ওই হাতের, ব্যথায় চিৎকার করে উঠে অপর হাতে আঙুল চেপে ধরল, টলে পড়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে সোহানা। ঘোরের মধ্যে ডিনের মনে হলো, পাল্লাটা খোলার সময়ই মেয়েটাও লাফ দিয়েছে। দুই হাতে সিট-বেল্ট চেপে ধরেছে ডিন। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। কিন্তু সোহানার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এক পায়ে ভর দিয়ে আরেকটা পা সোজা রেখে যতটা সম্ভব ওপরে তুলে দিয়ে চরকির মত পাক খেতে দেখল ওকে। আঙুল ভাঙা লোকটার চোয়ালে গিয়ে লাগল প্রচণ্ড লাথিটা, ঠাপ করে শব্দ হলো। লোকটা পড়ে যাওয়ার আগেই বনেটে দুই হাত রেখে লাফিয়ে ডিঙালো সোহানা গাড়িটা।

অন্যপাশে দাঁড়ানো মুখে আঘাত পাওয়া লোকটা তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। কিন্তু সেটা উঁচু করার আগেই কনুইয়ের কাছে শক্ত এক লাথি খেল, পিস্তলটা হাত থেকে ছুটে উড়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল দশহাত দূরে। লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ডান হাতটা সোজা করে চোখের নিমেষে নামিয়ে আনল সোহানা। কারাতে কোপটা লাগল লোকটার কানের পিছনে নীচের দিকে। এই আঘাতে দ্বিতীয়বারের মত টলে উঠে পড়ে গেল লোকটা। জ্ঞান হারিয়েছে।

চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়াল সোহানা তৃতীয় লোকটার দিকে। দুই সঙ্গীর অবস্থা দেখে ছুটে আসছে লোকটা। অনেক কাছে চলে এসেছে ইতিমধ্যেই—হাতে ধরা ছুরির চোখা মাথাটা সোহানার দিকে তাক করা। সামনে এগোতে গিয়ে, যেন পা পিছলে, চিত হয়ে পড়ে গেল সোহানা লোকটার পায়ের কাছে। ছুরি হাতে নীচের দিকে ঝুঁকে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে লোকটা অদ্ভুত মারকুটে মেয়েটিকে। এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই জোড়া পায়ের লাথি খেল। বুকের খাঁচা সই করেছিল সোহানা, কিন্তু টের পেয়ে লোকটা সোজা হয়ে যাওয়ায় লাথিটা লাগল ওর উঠতি ভুঁড়ির উপর। গাড়িতে বসে লোকটার মুখ দিয়ে যন্ত্রণাকাতর চিৎকারের

সঙ্গে ভুস করে বাতাস বেরোনোর শব্দ শুনতে পেল ডিন। ভাঙাচোরা পুতুলের মত রাস্তায় বসে পড়ল ছুরিওয়ালা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা। দ্বিতীয় লাথিটা মারল ও লোকটার খাড়া নাক সই করে। মুড়মুড় আওয়াজ তুলে বসে গেল নাক, দাঁতও ভাঙল কয়েকটা; ঢিব করে বাড়ি খেল মাথার পিছনটা পাথুরে রাস্তায়। এবার মাটিতে পড়ে থাকা আগের লোক দুটোর দিকে তাকাল ও। নিথর হয়ে পড়ে আছে দেখে ঝুঁকল ছুরিওয়ালার দিকে।

'সোহানা...' ডাকল ডিন, ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরোল গলা থেকে। এরপর কী বলবে বুঝতে পারছে না। ওর ডাক সোহানার কানে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না, জবাব দিল না। লোকটার ওপর ঝুঁকে প্রথমে ওর জ্যাকেটের ভিতর থেকে পিস্তলটা তুলে নিল, তারপর প্যান্টের পকেট হাতড়াল। ওয়ালেটটা বের করে এনে একনজর বুলিয়ে ফেলে দিল রাস্তার উপর। একইভাবে বাকি দুজনকেও সার্চ করল। আঙুল ভাঙা লোকটার হোলস্টারে পাওয়া গেল একটা পয়েন্ট থ্রি-এইট ওয়েবলি অ্যাণ্ড স্কট রিভলভার।

একটু দূরে রাস্তার উপর ছিটকে পড়া পিস্তলটাও তুলে নিল সোহানা। তারপর সিত্রোঁ গাড়িটার দিকে এগোল। ড্রাইভিং সিটে উঠে স্টার্ট দিয়ে পিছিয়ে নিয়ে গেল ওটাকে রাস্তার চওড়া অংশে। গাড়ি থামিয়ে নেমে সামনের বনেট তুলল। ঝুঁকে দাঁড়াল ইঞ্জিনের ওপর। কিছু একটা করে সোজা হয়ে ফিরে এল নিজের গাড়িতে।

ড্রাইভিং সিটে বসে সিত্রোঁর ইঞ্জিনের ডিস্ট্রিবিউটর-আর্ম আর অস্ত্রগুলো রেখে দিল ও গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের নীচের কাবি হোলে।

সোহানার মুখটা ভ্রূকুটিতে কুঁচকে যেতে দেখল ডিন। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা এখনও জোরে বাড়ি খাচ্ছে। কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল, 'ইয়ে...কনগ্র্যা...'

সোহানাকে রাগত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল ও। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ ছাড়ল। 'লাথি মেরে পিস্তলটা বেশি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। নাগালের বাইরে। তৃতীয় লোকটা রিভলভার বের করলে বিপদে পড়তাম।'

দীর্ঘ নীরবতার পর ডিন বলল, 'ওসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। সবাই আমরা ভুল করি।' শরীরটা কাঁপছে দেখে নিজের ওপরই রেগে গেল। মুখ দিয়ে কথা বের করতেও কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ করেই রাগটা চলে গেল পাশে বসা মেয়েটার ওপর। রুক্ষকণ্ঠে বলল, 'যাদের মারলেন, ওরা পুলিশের লোক নয় তো?'

মাথা নাড়াল সোহানা। 'না।'

'আপনি শিওর?'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। ধৈর্য হারাল ডিন। 'আপনি কে, সত্যি করে বলুন তো?'

'মানে?'

ভাল হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে দেখাল ডিন। 'ওই যে, ওখানে যে কাণ্ডটা করে এলেন...' রাগত ভঙ্গিতে হাতের তালু ডলল কপালে। 'অনেক চর্চা দরকার এসবের জন্যে। স্কুলের গার্লস গাইডে এত ভয়ানক বিদ্যা

শেখায় না।'

ডিনের কথা এড়িয়ে গিয়ে সোহানা বলল, 'ওদের একজনের নাম এমিল কেন্ট, আরেকজন রোজার রোজারিও, আর তৃতীয় লোকটার নাম-পরিচয় নেই ওয়ালেটে। নাম দুটো কি আপনার চেনা লাগছে?'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ডিন। 'আমার চেনা লাগবে কেন?'

'ওরা যদি আপনার ক্ষতি করার জন্যে এসে থাকে, ধরে নিতে হবে, কোথাও একটা যোগাযোগ নিশ্চয় আছে।'

'আমার সঙ্গে কী যোগাযোগ, আমি জানি না। তবে যা ঘটতে দেখলাম, তাতে আপনার জন্যে আসার সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি। আপনি কি লেডি মাফিয়া চিফ, নাকি মিস সিক্রেট এজেন্ট, না অন্য কিছু?'

মনে মনে হাসল সোহানা। 'ইংল্যাণ্ডের কেনসিংটনে একটা হ্যাটের দোকান চালাই আমি।'

'বিশ্বাস করলাম না,' মুখ বাঁকাল ডিন। 'আমার জন্যে আসেনি ওরা। আপনার জন্যেই এসেছে। ওরা আপনাকে একা একা এখানে আসতে দেখেছিল, কুবুদ্ধি মাথায় চাড়া দিয়েছিল; ভেবেছিল, এত সুন্দর একটা মেয়েকে একা যখন নিরালায় পাওয়াই গেছে, ছাড়ব কেন?'

আস্তে করে বলল সোহানা, 'হতে পারে, তবে আমার সন্দেহ আছে।'

হাসতে শুরু করল ডিন। দুর্বল, ক্লান্ত হাসি। 'তবে যে উদ্দেশ্যেই আসুক, ভুল মেয়েকে নিশানা করেছিল ওরা।' গলা শুকিয়ে গেছে ওর। হেঁচকি উঠতে লাগল। 'কিন্তু যে খেল্‌টা দেখালেন...' হেঁচকির কারণে কথা আটকে গেল ওর। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে।

গাড়ি থামাল সোহানা। ঘাড়ের নীচে ওর ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেল ডিন। হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল। ভাঙা গলায় বলল, 'আমি ঠিকই আছি, বেইবি। আর সেবা করতে হবে না।'

মুচকি হাসল সোহানা। ওর সত্যিকারের পরিচয় জানতে না পেরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে লোকটা, আর সেকারণেই রেগে গেছে। ডিনের ঘাড় থেকে হাত সরাল না ও। আলতো করে ধরে রেখে মোলায়েম স্বরে বলল, 'অত রাগ করে না। আপনার শরীর ভাল না। দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। জেগে উঠে দেখবেন সুন্দর একটা বিছানায় শুয়ে আছেন। নতুন মানুষ মনে হবে নিজেকে।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল ডিন। পানিভরা ঝাপসা চোখে দেখল, ফার্স্ট-এইড বক্সটা তুলে এনে সেটা থেকে ওষুধ বের করছে সোহানা। ওর দিকে ফিরে হাসল। হাসিটা আন্তরিকতায় ভরা।

লজ্জা পেল ডিন। কম্পিতকণ্ঠে বলল, 'সরি... আর *বেইবি* ডাকব না। আসলে কী জানেন, আমার মেজাজটা খুবই খারাপ। অসম্ভব বদ।'

তিন

রাত ন'টা। টেমস নদীর মাইল দুয়েক দক্ষিণে বার্কশায়ার কাউন্টির উইক্সফোর্ড গ্রামের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে মাসুদ রানা। গন্তব্য, লেডি জোয়ালিন হেইফোর্ডের খামারবাড়ি।

লণ্ডনে থাকতেই সোহানার ফোন পেয়েছে রানা। সলীল সেনের নিখোঁজ সংবাদ শুনেছে। সোহানা ফোন করে জানিয়েছে, যত শীঘ্রি সম্ভব রানাকে ফ্রান্সে যেতে বলেছেন বিসিআই চিফ। এই কাজটা সেরে এমনিতেও ওর সলীল-সোহানার কাছে যাওয়ার কথা ছিল ওবার্থে।

আধ ঘণ্টা পর লেডি জোয়ালিনের মস্ত খামারবাড়িতে পৌঁছল রানা। সুসজ্জিত ড্রইং রুমে ওকে নিয়ে বসাল জোয়ালিন।

'তারপর, রানা, কেমন আছো?'

'ভাল। তুমি কেমন?'

'এমনিতে তো ভালই। পায়ের যন্ত্রণা বাদ দিলে। মাঝে মাঝে খুব চুলকায়। তখন খারাপ লাগে।'

একজন বিশিষ্ট আর্লের মেয়ে জোয়ালিন। ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে বসে এক প্লেবয়কে। মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে ওর স্বামী। গাড়িতে ছিল তখন জোয়ালিন। সেই অ্যাক্সিডেন্টে ওর স্বামী মারা যায়, আর একটা পা হারায় জোয়ালিন। নষ্ট পা-টা হাঁটুর নীচ থেকে কেটে বাদ দিয়েছেন ডাক্তাররা।

মাসখানেক পর একটা নকল পা নিয়ে, সামান্য খুঁড়িয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে জোয়ালিন। একজন নতুন মানুষ। বাবা ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজি হয়নি জোয়ালিন, স্বামীর খামারটা পরিচালনার ভার তুলে নেয় নিজের হাতে। চার বছর কঠোর পরিশ্রমের পর খামার থেকে লাভ আসতে শুরু করে। ততদিনে তার বয়েস হয়ে গেছে আটাশ। সোহানার বান্ধবী ও। সোহানার মাধ্যমেই রানার সঙ্গে পরিচয়।

'ওষুধ খাও না?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'ওষুধ খেয়ে তেমন একটা কাজ হয় না। ডাক্তার মলম দিয়েছেন, মাখালে কিছুটা কমে। যাকগে, বাদ দাও তো রোগ-শোকের কথা। তোমার কী খবর বলো। কাজকর্ম?'

সলীলের নিখোঁজ সংবাদটা জানাল ওকে রানা। ওকে চেনে জোয়ালিন। পছন্দও করে। একবার ওর খামারবাড়িতে এসেছিল সলীল, রানা-সোহানার সঙ্গে।

'আমার একটু তাড়া আছে, জোয়ালিন,' রানা বলল। 'সোহানা ফোন করেছিল। ফ্রান্সে যেতে হবে। সলীলের ঘটনাটার খোঁজ-খবর নেবার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের বস। বলো দেখি, কীজন্যে ডেকেছ আমাকে।'

'তোমাদের এই মানসিক অবস্থায় আর কোনও সমস্যার ভার চাপাতে চাই না, রানা।'

'কোনও অসুবিধে নেই, জোয়ালিন। বিপদ-মৃত্যু-ভয় নিয়েই তো আমাদের কারবার, ভেঙে পড়ি না কখনও। তুমি বলো।'

'চা খাবে?' জোয়ালিন জিজ্ঞেস করল।

'খাব।'

মেইডকে ডেকে চা আনতে বলল জোয়ালিন। মেইড চলে গেলে রানার দিকে ফিরল। 'ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত, রানা?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে কেউ?'

'না।' সামান্য দ্বিধা করে আবার বলল জোয়ালিন, 'রিয়া, আমার ছোট বোনকে। নিউ ইয়র্কের এক বিশিষ্ট শিল্পপতিকে বিয়ে করেছে ও। কয়েক দিন আগে এখানে এসেছিল। তখন বলেছে।'

'তারমানে কেউ একজন ভয় দেখাচ্ছে ওকে?'

'হ্যাঁ, দুই বছর ধরে। ভেঙে পড়েছে ও, স্নায়ুর চাপ আর সহ্য করতে পারছে না, তাই আমাকে এসে ধরেছে, কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

'সমস্যাটা কী? কী করেছিল?'

'তিন বছর আগে একটা ছেলের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়েছিল। বেশিদিন থাকেনি, দ্রুত শেষ হয়ে গেছে ব্যাপারটা। কিন্তু সেটা জেনে ফেলেছে একজন।'

'স্বামীকে সব খুলে বলে মাপ চেয়ে নিলেই তো হয়।'

'না, হয় না। এত উদার নয় ওর স্বামী যে মেনে নেবে। জানতে পারলে স্রেফ গলা টিপে খুন করবে ওকে। তা ছাড়া দুটো বাচ্চাও আছে রিয়ার।'

'ব্ল্যাকমেইল কি ছেলেটাই করছে?'

মাথা নাড়ল জোয়ালিন। 'না। হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে ও।'

'ব্ল্যাকমেইলারের কাছে প্রমাণ আছে?'

'রিয়া তো বলল, আছে। আর একজন নয়, রিয়ার ধারণা ব্ল্যাকমেইলারদের একটা সংঘবদ্ধ দল আছে। ওর গোপন কথা সব জানে ওরা। যে দেখা করে ভয় দেখিয়েছে, সে একজন নান, স্কটিশ নান।'

'নান? মানে ভুয়া নান?'

'তাই তো হওয়ার কথা। আসল নান কি আর ব্ল্যাকমেইলের মত একটা বিশ্রী অপরাধে জড়াবে?'

'কোন নোট লিখে দেয়নি নিশ্চয়? শুধু ভুয়া নানকে পাঠিয়ে হুমকি দিয়েছে, তাই না?'

'নোট পাঠিয়েছে কি না জানি না। এ প্রশ্নটাই আমার মাথায় আসেনি। তাই জিজ্ঞেস করিনি।'

'হুঁ।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তা কত করে দিতে হয় রিয়াকে, বলেছে কিছু?'

'মাসে এক হাজার ডলার।'

'ব্যস? এত কম?'

'হ্যাঁ। কমই, কিন্তু নিয়মিত দিতে হয়।'

'দেয় কীভাবে? হাতে হাতে?'

'না, ব্যাংকের মাধ্যমে। ম্যাকাও-এর এক ব্যাংকে একটা চ্যারিটি রিলিফ ফাণ্ডের অ্যাকাউন্ট আছে। সেই নাম্বারে টাকা জমা দিতে হয়।'

'ব্যাংকটার নাম জানো?'

'নাম? রিয়া তো বলেছিল, কিন্তু কেমন খটমটে নাম, মনে রাখতে পারিনি।'

'ব্যাংকো ম্যাকাও ডা কমার্শিয়াল?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে রইল জোয়ালিন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

'হং কং, ম্যাকাও, এ সব জায়গায় কাজ করেছি আমি।' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল রানা। 'চ্যারিটি ফাণ্ড। আমি শিওর, ওই নামে কোনও ফাণ্ড সত্যিই আছে, লেনদেনেও অবৈধ কিছু পাওয়া যাবে না। পুলিশ খুঁত বের করতে পারবে, এত কাঁচা কাজ করবে না ব্ল্যাকমেইলাররা।' জোয়ালিনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল ও। 'কিন্তু এত কম টাকা, মাসে মাত্র এক হাজার, ঠিক মিলতে চাইছে না।'

'কী মিলতে চাইছে না?'

'টাকার অংকটা। এত কম নিয়ে চলে কী করে দলটা?'

'রিয়া আমাকে যা বলেছে, সব জানিয়েছি তোমাকে। আমি ওকে বললাম, ব্যাংকটাতে গিয়ে খোঁজ নিতে, কারা রয়েছে এই চ্যারিটি ফাণ্ডের পিছনে। কিন্তু ও ভয় পায়। ও বলে, জেনে কী হবে? সমস্যার তো কোনও সমাধান হবে না। স্বামীর কানে কথাটা চলে যাওয়ার চেয়ে টাকা দেয়াটাই বেশি নিরাপদ মনে করে ও।'

'কিন্তু একসময় তো এর শেষ একটা হবেই। বাড়বে চাহিদার অঙ্ক... টাকা নিতে নিতে নিঃস্ব করে ফেলবে রিয়াকে।'

জবাব দেয়ার আগে ভাবল জোয়ালিন। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ব্যাপারটা ওরকম নয়, রানা। এই ব্ল্যাকমেইলাররা বেশি টাকা দাবি করে না, ওরা বছরে বারো হাজার ডলারেই সন্তুষ্ট। রিয়ার নিজের একটা উপার্জন আছে। সেখান থেকে দিয়ে দেয়। কষ্ট হলেও, প্রচণ্ড কোনও চাপে পড়ে না।'

'তারমানে প্রতি মাসে টাকাটা দিয়েই চলেছে ও?'

'হ্যাঁ। ও আমাকে বলেছে কোনও কিনারা করার জন্যে নয়, কাউকে বলে মনের ভার হালকা করার জন্যে। ওর ধারণা, এ ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারব না।' কাঁধ ঝাঁকাল জোয়ালিন। 'কিন্তু, রানা, আমি জানি ওর প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে... ইংল্যাণ্ডে হলে আমি নিজেই পুলিশের কাছে যেতাম। কিন্তু আমেরিকায় আমি অপরিচিত, কিছু করার ক্ষমতা নেই। আচ্ছা, ইন্টারপোল কি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। পুলিশ অনুরোধ করলে হয়তো ওরা এদিকে নজর দিতে পারে। কিন্তু আমেরিকান পুলিশকে জানাতে হবে তো। বোঝাই যাচ্ছে, রিয়া জানাবে না।' পুরো একটা মিনিট চুপ করে রইল রানা। ওর চোখে চিন্তার ছায়া। তারপর বলল, 'আমাকে চেষ্টা করে দেখতে বলছ?'

উত্তেজনা ফুটল জোয়ালিনের মুখে। 'তা হলে তো খুবই ভাল হয়, রানা। আমি জানি, তুমি কেসটা হাতে নিলে এর একটা কিনারা হবেই। কিন্তু তুমি কেন এ কাজটা করতে যাবে? এটা তো তোমার অফিশিয়াল ব্যাপার নয়।'

হাসল রানা। 'সব কিছুই অফিশিয়াল হতে হবে, এমন নয়। বন্ধুত্ব বলেও তো একটা কথা আছে, জোয়ালিন। তা ছাড়া সেই রাতের কথা ভাবো। সেরাতে গ্লাসগোর ওই কাসল গ্লেনক্রফটে সোহানার সঙ্গে তুমি যদি তোমার বাবার প্লেন নিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে না যেতে, আমি আজ কবরে থাকতাম। তাই না?'

জোয়ালিনও হাসল। 'তারমানে ঋণ পরিশোধ?'

'উঁহুঁ, ওই ঋণ কোনও দিন শোধ হবার নয়। তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আসলে ভাল লাগবে আমাদের। আর তা ছাড়া ব্ল্যাকমেইলারদের প্রচণ্ড ঘৃণা করি আমরা, দুচোখে দেখতে পারি না। ওদের গ্যাংটাকে শায়েস্তা করতে পারলে খুশিই হব।'

'থ্যাংক ইউ, রানা, থ্যাংক ইউ। আমি জানতাম, তোমার সাহায্য আমি পাবই।'

'তবে একটা কথা, রিয়াকে এ-সব ব্যাপারে কিছুই জানানোর দরকার নেই।'

সকাল ন'টায় লণ্ডনে সোহানার পেন্টহাউসে ফোন করলেন ডাক্তার রেনাও সিভেনিজ।

ইজেলে ছবি আঁকছিল সোহানা। গামলাভর্তি ফলের ছবি। তুলি রেখে গিয়ে ফোন ধরল। ডাক্তার বললেন, 'আপনার মিস্টার ডিন মার্টিন মোটেও সুবোধ রোগী নয়, মিস চৌধুরি।'

হেসে বলল সোহানা, 'শুনে আপনার জন্যে আমার মোটেও মায়া হচ্ছে না, ডাক্তার। আপনার বেশিরভাগ রোগীই বড়লোক, বদমেজাজি। ডিনও বদমেজাজি, তফাৎ শুধু, ওদের মত টাকা নেই। যাকগে, পরীক্ষাগুলো করেছেন? কী অবস্থা?'

'তেমন খারাপ কিছু নেই। কব্জির হাড় ভাঙেনি, মাথার খুলিও ঠিক আছে। তবে বাড়িটা খুব জোরেই লেগেছে। আরও অন্তত তিনদিন এখানে শুয়ে থাকতে হবে ওকে।'

'ও কী জানে, চিকিৎসার খরচ ওকে দিতে হবে না?'

'জানে। আর জানার পর থেকে সারাক্ষণ আমাকে জ্বালিয়ে মারছে—আপনি কোথায় গেছেন, আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে, এ-সব প্রশ্ন করে করে।'

'বলবেন না। আর যদি বেরিয়ে যেতে চায়, আটকান। প্রয়োজন হলে ওর কাপড়-চোপড় সব লুকিয়ে রাখুন। তিন দিনের আগে কোনমতেই ছাড়বেন না।'

'ঠিক আছে। বলে ওকে বোঝানো যাবে না, ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। আপনার মিস্টার ডিন মনে হচ্ছে নেশায় আসক্ত।'

'সেটা আমিও লক্ষ করেছি। আজকাল এ আর নতুন কথা কী, অনেকেই তো আসক্ত।'

'হ্যাঁ। মানসিক রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। ঠিক আছে, রাখি এখন।'

'আচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ডাক্তার, ফোন করে জানানোর জন্যে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ইজেলের দিকে তাকাল সোহানা। কিচ্ছু হয়নি, মনে মনে বলল। টিউব টিপে প্যালেটে নতুন করে রঙ ঢেলে মিশাতে শুরু করল। ডিনের কথা ভাবছে। কোথায় যেন একটা খটকা, ঠিক ধরতে পারছে না। খটকাটা খচখচ করেই চলেছে মনের কোণে।

জো লুই বলল, 'একটা মেয়ের হাতে এভাবে মার খেয়ে ফিরে এল! এমন জানলে আমি নিজেই যেতাম। ছিঁচকে চুরি আর গুণ্ডামি ছাড়া ওই ছাগলগুলোকে দিয়ে আর কোনও কাজ হবে না।'

লম্বা ডাইনিং টেবিলের এক মাথায় বসা জেনি ডান নিতম্বে দেহের ভার রাখল, বাঁ নিতম্বে যেখানে খামচে ধরেছিল জো লুই, সেখানটায় এখনও ব্যথা আছে। খাটো স্কার্টের নীচটা আরেকটু তুলে দিল, যাতে ওর পাশে বসা হুয়ান ক্যাসটিলো ওর উরু দুটো ভালমত দেখতে পারে। হুয়ানই এই হতচ্ছাড়া দুর্গে একমাত্র লোক, যাকে কিছুটা পছন্দ করে ও। কথাবার্তা তেমন বলে না লোকটা, তবে কোথায় যেন একটা আকর্ষণ রয়েছে ওর মধ্যে। এক ভাগ চিনা আর তিন ভাগ পর্তুগিজ রক্ত ওর শরীরে।

টেবিলের অন্যপাশে বসেছে টোপাক, পাতলা হয়ে আসা চুল, মাথার বেশির ভাগটাই টাক, তাতে আলো চকচক করছে। তা ছাড়া কথার আঞ্চলিক টান, সবকিছু মিলিয়ে ওকে ঘৃণা করে জেনি। এ ছাড়া আছে আরও তিনজন। ওরা জাপানি না চিনা, জানে না ও, তবে ওদেরও দেখতে পারে না। এত জঘন্য খাবার বাছাই আর রান্না করে ওরা। আর আছে জো লুই, জঘন্য স্বভাব, এত খারাপ লোক জীবনে দেখেনি ও... ওর কথা ভাবতেই ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল জেনি।

টেবিলের অন্য মাথায় যে লোকটা, তাকে পছন্দও করে না, অপছন্দও করে না ও। গায়ে উজ্জ্বল হলুদ উলেন শার্ট, গলার রুমালের দুই কোণ একটা সোনার রিঙের ভিতর ভরে অনেকটা নেকটাইয়ের মত আটকে দিয়েছে। পনির চিবুতে চিবুতে জো লুই-এর মন্তব্য শুনল। লোকটার নাম হেনরি ক্লিঙ্গার, ওদের বস্। মোটাসোটা, ওজনদার লোক, বয়েস পঞ্চাশের বেশি, ঝোলা পেটটা দেখতে অনেকটা নাশপাতির মত, কোদালের মত চোয়াল, পুরু ঠোঁট, ক্রু-কাট ধূসর চুল, আর ঘন ভুরু যেন কপালের ওপর ছোটখাট ঝোপের মত কামড়ে বসে আছে। দেখে লোকটাকে তত ভয়ঙ্কর মনে না হলেও, মাঝে মাঝে জেনি বুঝে উঠতে পারে না ভয় কাকে বেশি পায়, জো লুইকে, নাকি মিস্টার ক্লিঙ্গারকে?

হেনরি ক্লিঙ্গারকে উরু দেখানোটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বিশেষ করে ওর স্ত্রী এমিলির উপস্থিতিতে। কোটর থেকে অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে থাকা চোখ মেয়েটির, সোনালি কোঁকড়া চুল, আর মিহি কণ্ঠস্বর।

সবাই 'বস্' ডাকে ক্লিঙ্গারকে। নাম ধরে ডাকে, ডাকার সাহস দেখায়, একমাত্র তার স্ত্রী এমিলি। যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি ধূর্ত লোকটা। জেনির মনে হয়, শয়তানকেও হার মানায়। আগে আমেরিকার অপরাধ জগতে খুবই দাপটের সঙ্গে ছিল, এখন সেখান থেকে চলে এসেছে। ওর সঙ্গে দুর্গে থাকার চেয়ে অপারেশনের

কাজে বাইরে বাইরে থাকা অনেক ভাল, অন্তত জেনির তা-ই মনে হয়। দুর্গে কাছাকাছি থাকলে এমন সব আচরণ করে ক্লিঙ্গার, স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে। সেই চাপ বাড়তে বাড়তে একেক সময় মনে হয় স্নায়ুগুলো সব ছিঁড়ে-ফেটে যাবে।

স্কার্টের ঝুল আরও দু'এক ইঞ্চি ওপরে তুলে আড়চোখে হুয়ানের দিকে তাকাল জেনি, দেখল, ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে কি না।

তবে মেরির মধ্যে পুরুষমানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের তেমন কোনও চেষ্টা নেই। স্কার্টের ওপর জাম্পার পরেছে। গলায় মুক্তোর মালা। টোপাক আর জো লুই-এর মাঝখানের চেয়ারে বসে ক্রিম ক্যারামেল খাচ্ছে। চামচে করে একটু একটু তুলে মুখে পোরার সময় খুব সামান্যই ঠোঁট ফাঁক করছে। চামচটা নামিয়ে রাখল ও। মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল। কারণ, এমিলি ক্লিঙ্গার কথা বলতে যাচ্ছে। আর এমিলি কথা বলার সময় কেউ বাধা দিলে রেগে যায় ও। ওর স্বামী ক্লিঙ্গারও সেটা পছন্দ করে না।

স্বামীর বাহুতে হাত রাখল এমিলি। 'মাই ডিয়ার, আমি একটা কথা ভাবছি।' ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ওর বাড়ি, কথাতেও সে-অঞ্চলের ভারি টান।

মাথা ঝাঁকাল ক্লিঙ্গার। গভীর প্রেমের দৃষ্টিতে তাকাল স্ত্রীর দিকে, সেটা আসল না নকল বোঝা কঠিন। 'ভাববেই তো। তা ভাবনাটা কী তোমার, হানি?'

মোটা ঠোঁট ওল্টাল এমিলি। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ভারি বুকের ওপর সোয়েটারটা ডলে সমান করল। মসৃণ ভাবভঙ্গি। থাইরয়েড হরমোনের সমস্যার কারণে ঠেলে বেরিয়ে থাকা উজ্জ্বল বাদামী চোখের দৃষ্টিতে প্রবল যৌনক্ষুধার ইঙ্গিতও স্পষ্ট। 'ইয়ে, আমি যেটা ভাবছি, সেটা হলো পাহাড়ের ঢালের তাকে বসে থাকা লোকটা নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে। কাজেই ওকে খুঁজে বের করে...'

'নিশ্চয়ই, হানি। তবে ও কিছু দেখেছে কি না সেটা ভেবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন যুক্তি নেই। অকারণ সময় নষ্ট। বরং ওকে খুঁজে বের করে মুখ বন্ধ করে দেয়াটাই সবদিক থেকে ভাল।'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি, ডিয়ার।'

'সরি, হানি।' হেসে এমিলির গাল চাপড়ে আদর করল ক্লিঙ্গার। 'হ্যাঁ, বলো।'

'ইয়ে, মিস্টার জো লুই যে মেয়েলোকটার কথা বলল, তাকের ওপর বসা ওই বোকা লোকটাকে ও নিশ্চয় হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তাই না? আর এই অঞ্চলে খুব বেশি হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিক নেই। কাজেই, আমি বলছি, মেরি আর জেনি নানের পোশাক পরে ওসব জায়গায় খোঁজ নিতে গেলে কেমন হয়?'

একবার চোখ মিটমিট করে অন্যদিকে চোখ ফেরাল টোপাক, ওর চেহারায় কোনও ভাবান্তর নেই। হেসে মাথা ঝাঁকাল মেরি, কিন্তু ওর চোখের ঘৃণাটা একমাত্র জেনি বুঝতে পারল, কারণ ও মেরিকে চেনে। মদের গ্লাসে চুমুক দিল হুয়ান ক্যাসটিলো। জো লুই খাচ্ছে তাজা ফল, বাদাম আর মধু। সবার মধ্যে একমাত্র ও-ই প্রতিক্রিয়া লুকানোর চেষ্টা করল না। বলল, 'কিন্তু মিসেস ক্লিঙ্গার, গতকাল দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তো এই কাজটিই করেছে মেয়ে দুটো। মেয়েলোকটার হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে বুঁদো মিস্টার ক্লিঙ্গারকে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে ওই দুজনকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন তিনি।'

এমিলির ভুরু দুটো অনেকখানি উঁচু হয়ে ধনুকের মত বেঁকে গেল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি, ডিয়ার?'

'হ্যাঁ, হানি। ওদের যখন পাঠালাম, তুমি তো এখানেই ছিলে।'

'ছিলাম? তা হলে জানলাম না কেন? নিশ্চয়ই অন্য কথা ভাবছিলাম।'

এমিলির দিকে ঝুঁকল ক্লিঙ্গার। হেসে মস্ত একটা থাবা রাখল স্ত্রীর উরুতে। 'হানি সারাক্ষণ শুধু একটা কাজের কথাই ভাবে, আমি জানি।'

'ডিয়ার! সবার সামনে আমাকে লজ্জা দিচ্ছ তুমি?' সাপের মত শরীর মোচড়াল এমিলি।

'ব্যবসা নিয়ে তোমার সুন্দর মাথাটা না ঘামালেও চলবে। ওটার জন্যে তো আমিই আছি।' জো লুই-এর দিকে তাকাল ক্লিঙ্গার। হাসিটা এখনও লেগে রয়েছে মুখে. তবে সেটা বদলে অন্যরকম হয়ে গেছে; মুহূর্ত আগেও যেটা ছিল প্রেমের হাসি, এখন সেটা ভয়ঙ্কর। 'ওই মেয়েলোকটাকে তুমি চেনো, মিস্টার জো লুই?'

'নামে চিনি। ওর নাম সোহানা চৌধুরি। সলীল সেন ওর সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিল। জন আমাদেরকে ওর কথা বলেছিল, আর বুঁদোর বর্ণনার সঙ্গেও ওর চেহারা মিলে যাচ্ছে। বুঁদো আর ওর দুই পালোয়ান সঙ্গীকে পেটানোর সাধ্য আমার জানামতে আর কোন মেয়েমানুষের নেই। এমনকী জেনি আর মেরি দুজন মিলেও পারবে না।'

'সোহানা না কী নাম বললে, ও তোমাকে চেনে?'

'মনে হয় না। আমি এ লাইনে এলামই তো মাত্র দু'বছর আগে।'

'হুঁ। ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

'দেখি, আজ রাতেই কাজে নামব ভাবছি।' একটু থেমে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল জো লুই, 'আর কতদিন সলীলকে অনিশ্চয়তায় রাখতে চান?'

'আরও চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর হালকা আলাপ-আলোচনা শুরু করব। আর তারপর খানিকটা ধোলাই দেবে তুমি। দিয়ে টোপাকের হাতে ছেড়ে দেবে।' একটা সিগারের ব্যাণ্ড ছিঁড়ল ক্লিঙ্গার। 'মেরি ওর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবে, কিন্তু এমন সব কথা বলবে, যাতে ভয়ে ঘাম ছুটে যায় লোকটার। জেনি অন্যভাবে চেষ্টা করবে, দরকার হলে ওর সঙ্গে বিছানায় শোবে। তারপর আবার খানিকটা আলাপ-আলোচনা করব আমরা, মৃদু ধোলাই দেয়া হবে...' শ্রাগ করল ও। 'এভাবেই কিছুদিন চলবে। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাব আমরা।' সিগারের দিক থেকে মুখ তুলে তাকাল ও, হাসল, কিন্তু চোখের দৃষ্টি কঠিন। 'আমার ইচ্ছে, ওকে তুমি বেশি মারবে না, মিস্টার জো লুই। সাধারণ মক্কেল নয় ও, ওর কাছ থেকে আমাদের অনেক প্রত্যাশা, নেশার ঘোরে বেশি পিটিয়ে ফেললে শেষে দেখা যাবে কিছুই পাব না।'

মাথা ঝাঁকাল জো লুই। 'না, সাবধানে মারব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

ক্লিঙ্গারের হয়ে এমিলি বলল, 'তা তো নিশ্চিন্ত থাকবেই, ওর ইচ্ছে কী আর তুমি পালন করবে না?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল জো লুই। 'ওঁর ইচ্ছে আমার জন্যে আদেশ।'

'বাহ্, খুব সুন্দর জবাব দিয়েছ তো।'

হেসে সিগারটা সরিয়ে রাখল ক্লিঙ্গার, এখনও ধরায়নি ওটা। 'তুমিও খুব সুন্দর, হানি। সত্যি তুমি সুন্দরী।' উঠে দাঁড়াল ও। এমিলির হাত ধরে টানল। 'ওঠো। এবার আমরা যাই।'

হাসল এমিলি। 'তুমি একটা বাঘের বাচ্চা, ডিয়ার।'

এমিলিকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল, এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে। ধীরস্থির পদক্ষেপ ওর, ভুঁড়িটা বড় হলেও ঝুলে পড়েনি। মেদ কম। পেশিই বেশি। দরজার কাছে গিয়ে না ফিরেই বলল, 'গুড নাইট, বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস।' সবাই ওর কথার জবাব দিল বিড়বিড় করে। বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল ও।

উঠে দাঁড়াল মেরি। 'ব্রিজ খেলার ইচ্ছে আছে কারও?' ও জানে, হুয়ান ক্যাসটিলো রাজি হবে না। ব্রিজের চেয়ে পোকারে বেশি আগ্রহী জেনি, তবে হুয়ান বললে সে-ও ব্রিজই খেলবে। জো লুই কখনও তাস খেলে না। টোপাকের দিকে তাকাল মেরি। 'মিস্টার টোপাক?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নীরবে নিজের সম্মতি জানাল টোপাক। হাতে এখনও ব্র্যাণ্ডির গ্লাস, চোখ দরজার দিকে। এক মুহূর্ত পর মাথা নেড়ে বলল, 'অসাধারণ। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না আমি।'

জো লুই জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝতে পারো না?'

'মিস্টার ক্লিঙ্গার আর মিসেস এমিলির ব্যাপারটা।'

হাতের ন্যাপকিন রেখে উঠে দাঁড়াল জো লুই। ওর উজ্জ্বল, পরিষ্কার চোখে কৌতুকের ছায়া। 'না বোঝার কী হলো? এ তো সহজ।' টেবিলে ঘুরে এসে টোপাকের কাঁধে আলতো টোকা দিল ও। চমকে গেল টোপাক। অস্বস্তি বোধ করছে। 'তুমি হলে টেকনিকাল এক্সপার্ট, টোপাক; তোমার তো বোঝা উচিত। মহিলাকে দিয়ে ও নিজের প্রয়োজন মেটায়। এ ছাড়া আর কী?'

জেনি বিড়বিড় করল, 'মুখে এক, মনে আরেক।'

'সবাই তো আমরা তা-ই, তা-ই না, জেনি?' জেনির দিকে তাকাল জো লুই। 'তোমার তো সেটা জানার কথা।' হাসিটা এখনও লেগে রয়েছে ওর মুখে, তবে কৌতুকেভরা হালকা ভাবটা নেই। 'কিন্তু ভুলেও ভেবো না, বস তার স্ত্রীর প্রেমে পাগল। তেমন প্রয়োজন পড়লে আমাকে দিয়ে স্ত্রীর ঘাড় মটকাতে সামান্যতম দ্বিধা করবে না বস। তারপর খুব সহজেই ওর মত আরেকটা মেয়েমানুষ খুঁজে নেবে।'

একটা তাস খেলার টেবিলের চারপাশে চেয়ার এনে রাখল মেরি। 'আহ্হা, এমন করে বলেন কেন, মিস্টার জো লুই। আপনার মধ্যে কোনরকম রোমাণ্টিকতা নেই।'

'আমাদের ব্যবসার মধ্যে কি কোনও রোমাণ্টিকতা আছে, মিসেস ফ্রিজেট?'

'ব্যবসার সঙ্গে রোমাণ্টিকতা না ঢোকানোই ভাল, মিস্টার জো লুই। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন বলেও তো একটা কথা আছে।'

'তাই নাকি? তুমি যে এত নরম দিলের মানুষ, তা তো জানতাম না। মিস্টার

ফ্রিজেটের জন্যে এখনও মন খারাপ লাগে নাকি তোমার, যে তোমাকে বিয়ে করল, ভোগ করল, তারপর লাথি মেরে ফেলে দিয়ে চলে গেল?'

হেসে উঠল জেনি। 'মিস্টার ফ্রিজেটকে কী করেছে ও, আপনি জানেন না বুঝি? একটা ক্ষুর নিয়ে ওর পিছু ধাওয়া করে স্যাণ্টিয়াগোতে চলে গিয়েছিল মেরি, তারপর ঘুমের মধ্যে ওর গলাটা ফাঁক করে দিয়ে এসেছিল।'

'এর মধ্যে হাসির কিছু নেই, জেনি,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল মেরি 'আমরা মেয়েরা নরম স্বভাবের হলেও প্রয়োজনে কতটা কঠিন হতে পারি, ফ্রিজেট এটা মনে রাখলে ভাল করত।'

'তুমি এক আশ্চর্য মহিলা, মেরি। সত্যিই আশ্চর্য!'

ধীরে ধীরে হুয়ান ক্যাসটিলো বলল, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি, মিস্টার জো লুই?'

'কী?'

'আপনি...মিস্টার ক্লিঙ্গারকে ভয় পান?' হুয়ানের কথায় হঠাৎ করেই কামরায় থমথমে নীরবতা নেমে এল।

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল টোপাক। ভুরু উঁচু হয়ে গেল জেনির, চোখে ভয়।

শান্তকণ্ঠে জো লুই বলল, 'না, ক্যাসটিলো। তোমরা ওকে ভয় পাও, পেতে হবেও। কিন্তু আমি দুনিয়ার কাউকেই ভয় পাই না, সেটা আমার জন্যে এক বিরাট স্বস্তি।'

দ্বিধা করে হুয়ান বলল, 'আমি ওর হয়ে কাজ করি, যতটা না টাকার জন্যে, তারচেয়ে বেশি ভয়ে। এখানে সবার বেলায়ই কথাটা প্রযোজ্য, একমাত্র আপনি ছাড়া। আপনি কেন করেন, আমি জানি না।'

সোনালি চুলওয়ালা মাথাটা পিছনে ঝাঁকি দিয়ে হেসে উঠল জো লুই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মেরি, জেনি ও টোপাক। 'আমি কেন কাজ করি?' জো লুই বলল, 'খুব সহজ। ক্লিঙ্গার আমার জন্যে মক্কেল জোগাড় করে দেয়, হুয়ান। মক্কেল না বলে রোগী বললেই বোধহয় ঠিক হয়।' টেবিলে দুই হাত রাখল ও। টেবিল ঘিরে বসা প্রতিটি মুখ খুঁটিয়ে দেখল। তারপর আবার বলল, 'বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কমব্যাট-ম্যান বলা যেতে পারে আমাকে, এটা নিশ্চয় সবাই স্বীকার করবে তোমরা। ফুজিয়ামো আর ওর বন্ধুদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করার সময়ই বুঝেছ। ওদের মত ওস্তাদ ফাইটারদেরও কীভাবে হারিয়ে দিই দেখেছ। এই ফাইটিং শেখার পিছনে আমি আমার সারাটা জীবন ব্যয় করেছি। জাপান, কোরিয়া, থাইল্যাণ্ডের মহা মহা ওস্তাদদের খেলা মনোযোগ দিয়ে দেখেছি, গবেষণা করেছি। এখন আমি ওদেরও ওস্তাদ, সবাইকে ছাড়িয়ে গেছি—সবার সেরা।'

লম্বা বক্তৃতা দিয়ে থামল জো লুই। আবার সবার মুখের ওপর ঘুরে বেড়াল ওর দৃষ্টি। সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'এখন প্রশ্নটা হলো, কেন আমি মিস্টার ক্লিঙ্গারের কাজ করি। শোনো, কেউ যদি এ ধরনের কোনও ক্ষমতা অর্জন করে, সেটার চর্চা করতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমাকে সেই চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে মিস্টার ক্লিঙ্গার।'

ব্লেজারের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে রেখেছে জো লুই। হুয়ান ক্যাসটিলোর

দিকে তাকিয়ে আছে। 'তা হলে, তোমার জবাব পেলে, হুয়ান। দ্বিতীয়বার আর আমাকে প্রশ্ন করার আগে ভালমত ভেবে নিয়ো, বুঝলে? পরের বার হয়তো এত ভাল মেজাজে না-ও থাকতে পারি আমি।' খোশমেজাজি ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে বাউ করে বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই-এর মতই হেলেদুলে ধীরপায়ে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও।

ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল জেনি। তাড়াহুড়া করে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের জন্যে আঁইঢাই করছিল প্রাণটা। কিন্তু ধরানোর সাহস পায়নি। একমাত্র ক্লিঙ্গার ছাড়া জো লুই-এর সামনে সিগারেট টানার সাহস পায় না কেউ। তামাকের ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না জো লুই। হুয়ানের কাঁধে হাত রাখল জেনি। বলল, 'ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগে দশবার চিন্তা কোরো, হুয়ান। ও যে কখন কী করবে, কেউ জানে না। আমার এখনও মাথায় ঢুকছে না, হেনরি ক্লিঙ্গারের কাছে কাজ করতে এলাম কেন? আমেরিকায় কাজের অভাব ছিল না। মাফিয়া আছে, আরও কত দল আছে, যাদের সঙ্গে আমি সহজেই ভিড়ে যেতে পারতাম।'

'মাঝে মাঝে আমার খুব অবাক লাগে, জেনি, তোমার ভুলে যাওয়া দেখে,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল মেরি। 'মিস্টার জো লুই একজন ভদ্রলোক, মিস্টার ক্লিঙ্গারও তাই, আমেরিকার যেসব দলের কথা বলছ, ওরা তো নিতান্তই সাধারণ গুণ্ডাপাণ্ডা। ওসব কথা বাদ দাও তো।' প্যাকেট থেকে তাস বের করতে শুরু করল। 'মিস্টার টোপাক, আপনি আমার পার্টনার হবেন?'

ঘড়ি দেখল টোপাক। 'বেশিক্ষণ খেলতে পারব না। ঘুমাতে যাবার আগে সলীলকে ঘণ্টাখানেক ধোলাই করতে হবে।' পাতলা নাকটায় টোকা দিল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। 'হেনরি ক্লিঙ্গারের জায়গায় আমি হলে প্রথমে ডিগ্রেডেশন টেকনিক ব্যবহার করতাম। গর্তে ফেলে রাখতাম। পায়খানা-পেসাব করে করে তার মধ্যে পড়ে থাকতে থাকতে যখন নিজের ওপরই ঘেন্না এসে যেত, তখন তোলার কথা ভাবতাম।'

হাসল জেনি। 'এখন যে খুপরিটার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে, সেটাও গর্তের চেয়ে ভাল কিছু নয়। আর তা ছাড়া আপনি যা করতে চাইছেন, সেটা করলে মিস্টার জো লুই রেগে যেত, কারণ তখন ওর আর কিছু করার থাকত না।' টেবিল থেকে তাস তুলে নিল ও। চেয়ারে পিঠ খাড়া করে এক নিতম্ব থেকে অন্য নিতম্বে ভার বদল করল। 'উফ্, ব্যথায় মরে গেলাম! চিমটি দিয়ে কেউ যে এত ব্যথা দিতে পারে... উফ্!'

চার

বার বার একটা নাটকের সংলাপ আউড়ে চলেছে সলীল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় নাটকটায় অভিনয় করেছিল ও। এমনভাবে সংলাপ মুখস্থ করেছিল, এখনও পরিষ্কার মনে আছে।

অনুমান করল, আরও অন্তত একটি ঘণ্টা পার করেছে। গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা ফেলে দিয়ে উঠে বসল। শক্ত কাঠের তক্তপোশে পড়ে থেকে থেকে গা ব্যথা হয়ে গেছে। বিছানা থেকে নেমে পায়চারি শুরু করল স্বল্প পরিসরে। কারাগারটা এতই ছোট, মাত্র চার কদম হাঁটা যায়। আর ভীষণ ঠাণ্ডা। দরজার উল্টো দিকে দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে তক্তপোশ। শক্ত, পুরু, ওক গাছের তক্তা দিয়ে তৈরি পাল্লা। সামান্যতম ফাঁকফোকর কিংবা একটা ফুটো নেই যেটা দিয়ে অন্যপাশে দেখা যায়। ঘরের এক মাথায় ছোট একটা টেবিল, তাতে একটা পাঁউরুটির খানিকটা আর আধ ফ্লাস্ক পানি রাখা। অন্য প্রান্তে বড় একটা বালতি কাঠের ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। ছাতের প্রাচীন কড়িকাঠে লাগানো হোল্ডারে একটা কম পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌ব্। পকেটে কিছুই নেই ওর, একটা রুমালও না, হাতঘড়িটাও নিয়ে গেছে কিডন্যাপাররা।

ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানোর পর এই ঘরটাতেই জ্ঞান ফিরেছে ওর। কতক্ষণ আগে? চব্বিশ ঘণ্টা? তিরিশ? চল্লিশ? বোঝা কঠিন। জানালা নেই যে, দিন কিংবা রাত দেখে সময় বোঝা যাবে। এ পর্যন্ত কাউকে দেখেনি, কোন শব্দ শোনেনি। এ যেন এক নিস্তব্ধতার রাজত্ব। মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, স্নায়ুকে ভীষণ পীড়া দেয়। হাতের তালু দিয়ে গাল ডলে বোঝার চেষ্টা করেছে ও, কত দিনের দাড়ি, সম্ভবত দুদিন।

কারা ওকে ধরে এনেছে? হাজারবার এই প্রশ্নটা করেছে নিজেকে। কিছুই বুঝতে পারেনি। শুধু বুঝেছে, যেহেতু মেরে ফেলেনি, এত সহজে মারবে না, কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ওকে এখানে আনা হয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্যটা তথ্য সংগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কিছু তথ্য, যেগুলো ওদের কাজে লাগবে। সেসব জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ তো অবশ্যই করা হবে, নির্যাতনও করা হতে পারে। এখন এখানে আটকে রেখে ওর স্নায়ু দুর্বল করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, যাতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় খুব বেশি প্রতিরোধ করতে না পারে। কী ধরনের নির্যাতন করবে ওরা? মারপিট করবে? ড্রাগ ব্যবহার করবে? দীর্ঘদিন না খাইয়ে ফেলে রাখবে?

নাহ্, খাবার দেবে। অতি সামান্য আর সাধারণ খাবার হলেও দেবে। টেবিলে রাখা পাঁউরুটি আর পানির দিকে তাকাল ও। খেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু না, এত তাড়াতাড়ি খাবে না। আবার কখন খাবার দিয়ে যাবে ওরা, জানে না। ততক্ষণ এই খাবার দিয়েই চালাতে হবে। কাজেই হিসেব করে খাওয়া উচিত।

পায়চারি চালিয়ে গেল ও। পেটের মধ্যে থেকে থেকেই এক ধরনের সুড়সুড়ির মত অনুভূতি হচ্ছে, যেন প্রজাপতি ডানা ঝাপটাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে ও। নির্যাতনের কথা ভেবে। কারণ একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, যারা ওকে এখানে ধরে এনেছে, তারা জানে কীভাবে মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন করে কথা আদায় করতে হয়।

যদি সহ্য করতে না পারে ও? আত্মহত্যা করে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাইবে নাকি? আত্মহত্যার কথা মাথায় আসতেই ঘরটায় চোখ বোলাল আরেকবার। পানি রাখার পাত্রটা নরম প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। ওটা ভেঙে হাতের

শিরা কেটে রক্ত বের করে দিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারবে না। কম্বল ছিঁড়ে দড়ির মত পাকিয়ে গলায় ফাঁস পরাতে পারে, কিন্তু সেটার অন্য মাথা ছাতে বাঁধার মত কোনও কিছু নেই। অর্থাৎ ফাঁসি দিয়েও মরতে পারছে না। দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকতে পারে। ওভাবে মরাটা খুবই কষ্টকর হবে। তা ছাড়া প্রথমবারেই যদি খুলি ফাটাতে না পারে, হয়তো বেহুঁশ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার আর ও ধরনের কিছু করার সুযোগ পাবে না, সুযোগ দেয়া হবে না।

ভাবনাটাকে অন্য খাতে সরানোর চেষ্টা করল সলীল। সোহানার কথা ভাবল। ও কি বুঝতে পারবে, ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে? যদি বোঝে, তা হলে যেভাবে পারে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেই। হয়তো রানাকেও খবর দিতে পারে। আর রানা জানলে সব ফেলে ছুটে আসবেই।

এখনই আত্মহত্যার চিন্তা না করে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। দেখা যাক, কিডন্যাপাররা কী করে। হয়তো এমন কোনও সুযোগ এসে যাবে, নিজেই নিজেকে মুক্ত করে ফেলতে পারবে, যদিও সে-সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও, দেখা যাক না কী হয়।

বসে পড়ল ও চৌকির উপর। চোখ রগড়াল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠে পায়চারি শুরু করল। বার বার মনে মনে আউড়াতে থাকল: সময় কাটাতে হবে, নার্ভগুলো শান্ত রাখতে হবে...সময় কাটাতে হবে, নার্ভগুলো শান্ত রাখতে হবে...

'একজন ড্যাকটিলিওম্যানসিস্ট মেয়েকে চিনতাম আমি,' সোহানা বলল। নিজের পেন্টহাউসের বিরাট রান্নাঘরে উঁচু টুলে বসে আছে ও, টেবিলে হাতের কাছে রাখা বয়াম থেকে রানার তৈরি নিমকপারা বের করে খাচ্ছে একটার পর একটা।

টেবিলে সোহানার মুখোমুখি বসে আছে রানা। একটা রান্নার বই পড়ছে। ইদানীং অবসর সময়ে নানারকম রান্নার বাতিকে ধরেছে ওকে।

মার্চের সন্ধ্যা। রাত ন'টা। সলীল সেনের মৃত্যু-সংবাদ জানার দুদিন পর লণ্ডনে ফিরে এসেছে রানা-সোহানা। কয়েক ঘণ্টা আগে লণ্ডন এয়ারপোর্ট থেকে ওকে তুলে এনেছে রানা এজেন্সির স্থানীয় চিফ আফরোজা। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর সেই যে রান্নার বই নিয়ে বসেছে রানা, অন্য কোনদিকে মনোযোগ নেই।

'কী বললাম, শুনলে? ড্যাকটিলিওম্যানসিস্ট...'

অবশেষে বই থেকে মুখ তুলল রানা। 'কী বললে?'

'ড্যাকটিলিওম্যানসিস্ট। যে মেয়েটাকে আমি চিনতাম।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আচ্ছা, তা-ই?'

'হ্যাঁ,' আবার কয়েকটা নিমকপারা মুখে ফেলল সোহানা। 'দুই ইঞ্চি ব্যাসের একটা লোহার ঝুলন্ত রিং ব্যবহার করত ও।'

'মন্দ না,' বই থেকে মুখ না তুলেই বলল রানা।

'কী মন্দ না মন্দ না করছ!'

'ড্যাকটিলিওম্যানসিস্ট?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

উঠে দাঁড়াল রানা। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কান খাড়া করে ওর পায়ের শব্দ শুনছে সোহানা। রানা কোথায় যাচ্ছে, জানে। স্টাডিতে। মুচকি হাসল ও। কনসাইযড্ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে পাবে না শব্দটা।

আরও কয়েকটা নিমকপারা তুলে মুখে পুরল ও। বরফির মত করে কাটা ঘিয়ে ভাজা এ-জিনিস খুবই প্রিয় ওর। চিবাচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে। মুখটাকে কেমন বানিয়ে ফিরে আসে রানা, দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছে।

অবশেষে ফিরে এল রানা। ভ্রূকুটিতে কুঁচকে রয়েছে কপাল। একটা আর্মচেয়ারে বসে সোহানার দিকে তাকাল। মুখ-চোখ গম্ভীর।

মনে মনে হাসল সোহানা। ভাবল, খটমটে শব্দটার মানে বের করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে আছে রানা।

কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে সোহানার দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'কী করবে আর কী করবে না, সাধারণ একটা লোহার রিং দিয়ে কীভাবে সেই সিদ্ধান্ত নিত তোমার পরিচিত মেয়েটা, বুঝি না। খুব একটা সহজ উপায় ছিল না ওটা। বরং আমি আরও সহজ একটা উপায় বাতলাতে পারি। দুই টুকরো কাগজের একটাতে *হ্যাঁ* আরেকটাতে *না* লিখে ভাঁজ করে টেবিলে রাখো, তারপর যে-কাজটা করতে চাও, সেটার কথা ভেবে যে-কোনও একটা কাগজ তুলে নাও। যদি *হ্যাঁ* লেখা কাগজটা ওঠে, তা হলে কাজটা করবে, আর *না* লেখা উঠলে করবে না। এ ধরনের মানুষকেই তো তোমার ওই *ড্যাকটিলিওম্যানসিস্ট* বলে, তাই না?'

হাঁ হয়ে গেল সোহানা। নিমকপারা চিবানো বন্ধ। একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে আস্তে করে বলল, 'তুমি জানলে কী করে! এ বাড়িতে কনসাইয্ড্ ছাড়া আর কোনও ডিকশনারি নেই!'

মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'না, নেই। কিন্তু মোবাইল ফোন তো আছে! কাউকে রিং দিয়ে জেনে নিতে কতক্ষণ লাগে? কঠিন কঠিন শব্দ বলে আমাকে বেকায়দায় ফেলার দিন তোমার শেষ, মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি। এখন বলো তো, সত্যিই ওই রিং দিয়ে ভবিষ্যৎ বলতে পারত মেয়েটা, নাকি পুরোটাই তোমার বানানো?'

'না, বানানো নয়, সত্যি।' হতাশ ভঙ্গিতে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সোহানা। 'যাকগে, ঠকাতে গিয়ে নিজেই বোকা বনলাম। এখন আসল কথায় আসা যাক। জোয়ালিনের বোনকে ব্ল্যাকমেইল করার কথাটা তো ভাল করে শোনাই হলো না।'

'আলোচনাটা শুরু করার আগে দু'কাপ কফি বানিয়ে আনলে কেমন হয়?' উঠতে গেল রানা।

'তুমি বসো,' বাধা দিল সোহানা। 'কাবাব বানিয়ে খাইয়েছ, নিমকপারাও খাচ্ছি। কফিটা আমিই বানাই।'

চুলায় কেটলি চাপাল ও।

রানা গিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারে জর্জ মাইকেলের একটা নতুন অ্যালবাম চাপাল। মৃদু মিষ্টি বাজনা যেন ছড়িয়ে পড়ল ঘরের আনাচে-কানাচে, তারপর দরদি কণ্ঠে দুঃখের গান—সামান্য একটা ভুল করেছিল বেচারা, কিন্তু ভুলের মাশুল খুব চড়া।

যাকে ভালবাসতো, সে মেয়েটা পর হয়ে গেল চিরতরে। আরাম করে চেয়ারে বসে চোখ বুজে তালে তালে মাথা নাড়ছে রানা।

কফি নিয়ে ফিরে এল সোহানা। একটা কাপ রানার সামনে টেবিলে রেখে আরেকটা নিল নিজে।

কাপে চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'কফিটা তুমি সত্যিই ভাল বানাও। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ব্ল্যাকমেইল। এতক্ষণ চোখ বুজে ওই কথাটাই ভাবছিলাম। মাথামুণ্ডু এখনও কিছু বুঝতে পারছি না আমি। ব্যাংকো ম্যাকাও ডা কমার্শিয়াল মানেই ফু ক্যানটাকি। সাউথ-ইস্ট এশিয়ার সবচেয়ে ঝানু বদমাশ।'

'ওই লোক তো মাসে মাত্র এক হাজার ডলার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার পাত্র নয়। তারমানে আরও অনেক ভিকটিম আছে।'

'কিন্তু সেই অনেকের মানেটা কী?' সোহানার দিকে তাকিয়ে বললেও প্রশ্নটা আসলে নিজেকেই করেছে রানা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কফির কাপে চুমুক দিতে থাকল দুজনে, ম্যাকাওয়ের লোকটার কথা ভাবছে। ওকে ভাল করেই চেনে ওরা। ফু ক্যানটাকি অপরাধগুলো সরাসরি নিজে করে না; কিন্তু অপরাধীদের সহায়তা থেকে শুরু করে আশ্রয়-প্রশ্রয় সবই দেয়, মোটা কমিশনের বিনিময়ে। প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে মোটা সুদে টাকাও ধার দেয়। ড্রাগ, নারী পাচারকারী, সোনা চোরাচালানি, ব্ল্যাকমেইলার, সবার সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। চোরাই মাল নিজের গুদামে জমা রেখে ব্ল্যাকমার্কেটে বিক্রিতেও সহায়তা করে ও। মোটকথা, সব ধরনের অপরাধীচক্রের সঙ্গে ওর কারবার।

অবশেষে রানা বলল আবার, 'ব্ল্যাকমেইলিং ব্যবসায় মাত্র একজনকে ব্ল্যাকমেইল করে দল চালানো সম্ভব নয়। জানা কথা, শুধু জোয়ালিনের বোনকে ব্ল্যাকমেইল করছে না ওরা, আরও বহু লোককে করছে। আর যারা এ-কাজটা করছে, তাদের সহযোগিতা করছে ফু ক্যানটাকি। ও ভাল করেই জানে তারা কারা।'

কিছুটা অবাক মনে হলো সোহানাকে। 'আমি তো জানতাম, কেউ একজন অন্য একজনের কোনও দুর্বলতা জেনে গিয়ে গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে। দল গঠন করে বহু মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করার কথা কখনও শুনিনি। মক্কেল জোগাড় করে কীভাবে, বিজ্ঞাপন দিয়ে নিশ্চয় নয়?'

'এ রকম ব্ল্যাকমেইল ব্যবসার কথা অবশ্য আমিও আগে শুনিনি,' রানা বলল।

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সোহানা আবার বলল, 'কিন্তু মক্কেলের খোঁজ জোগাড় করে কীভাবে? মানসিক ডাক্তারের কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রোগীরা যায়, ডাক্তারকে সমস্ত গোপন কথা বলে, কোনও অসাধু ডাক্তারের কাছ থেকে ওসব খবর জেনে নেয় না তো ব্ল্যাকমেইলারদের দলটা?'

হাসল রানা। 'একদম মনের কথা বলেছ। আমারও কিন্তু তা-ই ধারণা। এক কাজ করো। জোয়ালিনকে ফোন করে জেনে নাও, ওর বোন রিয়া কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায় কি না।'

'হ্যাঁ, করব।'

'আরও একটা কাজ করতে পারে ওরা. ডাক্তারদের চেম্বারে গোপন মাইক্রোফোন আর টেপরেকর্ডার লুকিয়ে রেখে আসতে পারে। রোগী আর ডাক্তারের কথাবার্তা তাতে রেকর্ড হয়ে যায়। সেসব শুনে মক্কেল জোগাড় করাও কঠিন কিছু নয়।'

'আর তারপর শুরু করে ব্ল্যাকমেইল,' রানার কথায় যোগ করল সোহানা। 'একবারে বেশি টাকা না নিয়ে নিয়মিত অল্প অল্প করে আদায় করে, সোনার ডিমপাড়া হাঁসটাকে একবারে জবাই করে না ফেলে প্রতিবারে একটা ডিম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। অনেক হাঁস জোগাড় করতে পারলে একটা করে ডিম পেলেও অনেক ডিম হয়ে যায়। বিরাট ইনকাম।'

'মনে হচ্ছে, ম্যাকাওয়ের ব্যাংকো ম্যাকাও ডা কমার্শিয়াল-এ ফু ক্যানটাকির সহযোগিতায় একটা ভুয়া চ্যারিটি অ্যাকাউন্ট খুলে রেখেছে ব্ল্যাকমেইলাররা,' রানা বলল। 'মক্কেলদের সবাইকে ওই নম্বর দিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিমাসে সেই অ্যাকাউন্টে নিয়মিত টাকা জমা করে দেয় মক্কেলরা। চ্যারিটি ফাণ্ড, তাই ট্যাক্সও দিতে হয় না, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরাও সন্দেহ করে না।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'ব্যাপারটার তদন্ত করতে হলে ম্যাকাও যেতে হবে আমাদের, কী বলো?'

'তুমিও যেতে চাও? এখানে আমাদের একজনের থাকা দরকার না? মানুষ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে-কোনও সময়ে সলীলের খবর জানা যেতে পারে।'

'অসুবিধে কী? খবর পেলেই উড়ে চলে আসব আমরা। একজনের জায়গায় দুজন থাকলে সুবিধে হবে না?'

'তা হয়তো হবে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে রানা বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

'কিন্তু ফু ক্যানটাকির মুখ থেকে কথা আদায় করবে কী করে? গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো আর গড়গড় করে বলে দেবে না।'

'দেখি, কিছু একটা প্ল্যান তো বের করতেই হবে।' উঠে দাঁড়াল রানা।

'কোথায় চললে?'

'ট্র্যাভেল এজেন্সিতে ফোন করতে। হং কং-এর দুটো টিকেট দরকার। নেক্সট ফ্লাইটটাই ধরব আমরা।'

'ঠিক আছে। রিটার্ন টিকেট কোরো।'

'এ-মুহূর্তে সলীলের ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমাদের,' বলল রানা। চেহারাটা মলিন হয়ে গেছে ওর। 'খামোখা উদ্বেগের মধ্যে সময় পার করা। এখন পর্যন্ত সামান্য কোনও লিড পাওয়া গেল না। ঝাঁপিয়ে যে পড়ব, কোথায়? তার চেয়ে অন্য একটা কাজ দেখা যাক সেরে আসতে পারি কি না। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় দুর্ঘটনাটা সাজানো?'

উপর-নীচে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আমার বিশ্বাস ওটা একটা সাজানো অ্যাক্সিডেন্ট। নীচে নেমে গাড়িটা দেখেছি আমি। দেয়ালে ধাক্কা খাওয়ার দাগ আছে, কিন্তু দরজা ছাড়া আর কোথাও তেমন ভাংচুরের চিহ্ন নেই। দরজাটা

যেভাবে মোচড়ানো দেখলাম পাথরে ড্রপ খেয়ে ওরকম হয় না।'

'বুঝলাম। সলীলকে উদ্ধার করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। বেঁচে থাকলে ঠিকই ওকে উদ্ধার করব আমরা, জেনে যাব কী করতে হবে। তার আগে এই কাজটা সেরে আসি।'

'তা হলে তোমার ধারণা, তোমার ওয়ালেট দেখে তোমার পরিচয় জেনে গেছে সোহানা?' জিজ্ঞেস করল জো লুই।

চোয়ালে লাগানো প্লাস্টারটায় আঙুল বোলাল বুঁদো। 'হ্যাঁ।' টপ-কোটের পকেটে হাত ঢোকাল ও। 'এ-সব ফালতু প্রশ্ন করতে এ রকম একটা অজায়গায় নিয়ে এসেছেন আমাদের?'

পাহাড়ের পাদদেশে পাথরে তৈরি পুরানো একটা ভাঙা কুঁড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। কাঁচা মেঝে, ছাতের পচা কড়িকাঠের বেশির ভাগই ধসে পড়েছে বহুকাল আগে। কব্জা ছুটে গিয়ে খসে পড়েছে দরজার পাল্লা। কোনও জানালা নেই।

পিঠে বাঁধা রাকস্যাকটা খুলে মাটিতে নামিয়ে রাখল জো লুই। বুঁদোর কথার জবাবে বলল, 'আমরা যে আলোচনা করতে এসেছি, তার জন্যে এটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে মিলেট-এ পৌঁছেছ, তারপর সেখান থেকে হেঁটে এসেছ এখানে, যেমন যেমন বলা হয়েছিল তোমাদের, তাই তো?'

তিনজনের মধ্যে যার দেহটা বড়সড়, ওদের নেতা, সে বলল, 'আট কিলোমিটার অকারণে হেঁটেছি।'

'না, অকারণে নয়। ওই সোহানা মেয়েমানুষটা এ-অঞ্চলে খুব প্রভাবশালী, ফ্রান্সের ওপর মহলে বড় বড় জায়গায় যোগাযোগ আছে ওর। নিশ্চয় পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে ও। সাবধান না হলে এতক্ষণে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে।'

রোজার রোজারিও—যার দুটো আঙুল ভেঙে দিয়েছে সোহানা, স্প্লিন্টার লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রেখেছে, ও বলল, 'পুলিশ আমাদের পাবে না। আর যদি পায়ও, মুখ খুলব না আমরা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

মুচকি হাসল জো লুই। 'তা থাকব।'

নেতা বলল, 'এখন টাকার কথা বলুন, আমাদের পেমেন্টের কী হবে? যেটা আমাদের দিতে চেয়েছেন? টাকা দিতেই তো এখানে ডেকে এনেছেন, নাকি?'

'পেমেন্ট? কিন্তু তোমরা তো কাজটা করতে পারনি, ব্যর্থ হয়েছ। বরং সবকিছু উল্টোপাল্টা করে দিয়েছ। এখন তোমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে। আমি চাই না, তোমরা পুলিশের হাতে ধরা পড়, আর পুলিশ তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করুক।'

'কিন্তু আপনি আমাদের জানাননি সোহানার মত একটা দাঙ্গাবাজ মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে আমাদের।'

'সেটা আমরাও জানতাম না। তবে দাঙ্গাবাজদের পরাস্ত করে কাজটা করে দেয়ার জন্যেই তো তোমাদের টাকা দিতে চেয়েছি।'

'আপনার কথা মানতে পারছি না, মিস্টার জো লুই। আপনি আমাদের

পেমেন্ট ছাড়াই উধাও হতে বলছেন?'

সামান্য আগে বাড়ল তিন ফরাসী। জো লুইকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল। ওদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ভারি হয়ে উঠল পরিবেশ। মৃদু শব্দ করে হাসল জো লুই। 'তোমাদের উধাও করতেই তো চাই,' কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ও। ওপরে উঠে ভাঁজ করা বাঁ পা'টা বিদ্যুদ্বেগে সোজা করল। বুঁদোর গলার একপাশে আঘাত হেনে 'মট্' করে ওর ঘাড়ের হাড় ভেঙে দিল।

নিঃশব্দে ডান পায়ের ওপর নেমে এল জো লুই-এর দেহটা, স্প্রিঙের মত সামান্য বাঁকা হয়ে ঝটকা দিয়ে সোজা হলো আবার, একই সঙ্গে চরকির মত পাক খেল ওর দেহটা, বাঁ পা'টা সামনে বাড়ানোই আছে। বুঁদোকে মারার আগে জো লুই যে জায়গাটায় দাঁড়ানো ছিল, সেখানে চলে এসেছে গুণ্ডাদের নেতা। ওর দুই হাঁটুর পিছনে মুগুরের মত আঘাত হানল জো লুই-এর বাঁ পা। ব্যথায় চিৎকার দিয়ে উঠল নেতা। পা দুটো মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়েছে। ধড়াস করে চিত হয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল রোজারিও। অর্ধেক বের করছে, এ সময় ওর কব্জি চেপে ধরল সাঁড়াশির মত কঠিন কয়েকটা আঙুল। পরক্ষণে ওর এক কানের ওপর লাগল কারাতের কোপ। মুখ দিয়ে বেরোনো তীক্ষ্ণ চিৎকারটা মাঝপথে থেমে গেল।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে নেতা। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর সোলার প্লেক্সাসে ঘুসি চালাল জো লুই। সামনে বাঁকা হয়ে গেল নেতার দেহ। দম নিতে পারছে না। যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করছে। দুই হাতে ওর মাথার দু'পাশ চেপে ধরে বেমক্কা এক মোচড় দিল জো লুই। 'কড়াৎ' করে বিশ্রী শব্দে ভেঙে গেল লোকটার ঘাড়ের হাড়।

হাত সরিয়ে আনল জো লুই। মাটিতে পড়ে গেল নেতার লাশ। তিনজনের ওপর চোখ বোলাল জো লুই। কেউ নড়ছে না। হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রাকস্যাকের চেন খুলল। ভিতর থেকে বের করল একটা ইস্পাতের শিকল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দরজার পাশের একটা ফোকর দিয়ে শিকলের এক মাথা ঢুকিয়ে টেনে এনে পেঁচিয়ে বাঁধল দরজার চৌকাঠের একপাশে।

পুরু দস্তানা পরে নিয়ে শিকলের আরেক মাথা এক হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে দুই হাতে শক্ত করে চেপে ধরল ও। বাইরে বেরিয়ে পাহাড়ের গা থেকে বেরোনো একটা পাথরে দুই পা ঠেকিয়ে শিকল ধরে টানতে শুরু করল।

পুরো আধ মিনিট কিছুই ঘটল না। ভারি হচ্ছে ওর নিঃশ্বাস। তারপর নড়ে উঠল পুরানো দরজার চৌকাঠ। গুঙিয়ে উঠল মোটা কাঠ। টান কমাল না ও। ফাটল ধরছে দেয়ালে। চৌকাঠের ওপর দেয়াল থেকে একটা বড় পাথর খুলে খসে পড়ল। টলে উঠল দেয়াল। দরজাসহ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ল গোটা দেয়ালটা।

নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আপনমনে মাথা ঝাঁকাল ও। শিকলটা খুলে নিল। একপাশের দেয়াল ধসে পড়াতে ওটার দুই পাশের দেয়ালের ভার বহন করার ক্ষমতা গেল কমে। বাকি দেয়ালগুলো ধসিয়ে দিতে খুব একটা কষ্ট হলো না ওর।

দশ মিনিটের মাথায় ধসে পড়া পাথরের একটা স্তূপে পরিণত হলো কুঁড়েটা।

তিনটে লাশ চাপা পড়ে রইল তার নীচে। চারপাশে ঘুরে ভালমত দেখল আরেকবার জো লুই, কোথাও কোনও খুঁত রয়ে গেল কি না। তারপর শিকলটা রাকস্যাকে ভরে শিস দিতে দিতে হেঁটে চলল পাহাড়ি পথ ধরে, পনেরো কিলোমিটার দূরে যেখানে ওর গাড়িটা রেখে এসেছে।

পাঁচ

একশো টনী মোটর ক্রুজারের গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠতে উঠতে মস্ত বড় হাই তুলল ফু ক্যানটাকি। টাইপা বন্দরে ওর ব্যক্তিগত মুরিঙে নোঙর করা আছে জাহাজটা। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পর্তুগালের লাল-সবুজ পতাকা উড়ছে জাহাজের মাস্তুলে।

মনটা ফুরফুরে হয়ে আছে ওর। ঝিঁঝির লড়াইয়ে বাজি ধরে পাঁচ হাজার আমেরিকান ডলার জিতে এসেছে আজ। ওর ঝিঁঝি পোকা *গ্রেভ ডিগার* ওর পুরানো বন্ধু সুং-এর জনপ্রিয় পোকাটাকে বিশ মিনিটের তুমুল লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছে। জাহাজের চকচকে পিতলের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ফু নিশ্চিন্তে —ঘষেমেজে এতই পরিষ্কার রাখা হয় ওটা যে, ওর পরনের ধবধবে সাদা দামি সুটে সামান্যতম ময়লা লাগার সম্ভাবনা নেই।

প্রচুর যত্নের সঙ্গে অনেক সময় নিয়ে ট্রেনিং দেয়া হয় এই পোকাগুলোকে। লড়াকু পোকা গোরস্থান থেকে জোগাড় করা হয়। গোরস্থানের পোকারা নাকি ভয়ঙ্কর লড়াকু হয়। *গ্রেভ ডিগার*কে আনা হয়েছে হং কং-এর একটা পুরানো গোরস্থান থেকে। ইংরেজদের কবর, সেজন্যই এটা এত ভয়ঙ্কর যোদ্ধা হয়েছে—ফু-এর ধারণা। ওই গোরস্থানের মাটিতে ওর কোনও প্রাচীন পূর্বপুরুষের হাড়ের গুঁড়ো মিশে রয়েছে ভেবে গর্ব বোধ করে ও। পদ্মফুলের বিচি ও চালের গুঁড়ো দুধে ভিজিয়ে ব্যাঙের পায়ের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করে খাওয়াতে হয় লড়াকু ঝিঁঝিকে, তবেই এদের লড়াইয়ের মেজাজ আসে। সপ্তাহে একবার করে মেয়ে ঝিঁঝির সঙ্গে *গ্রেভ ডিগার*কে রাখে ফু, দৈহিক মিলনের মাধ্যমে মেয়ে ঝিঁঝির কাছ থেকে টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জনের জন্য। যাই হোক, আজ রাতে গ্রেভ ডিগার জিতেছে, সুং-এর সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে। নিজের ঝিঁঝিটার শুঁয়ায় একটা চুলের সুড়সুড়ি দিয়ে রাগানোর চেষ্টা করেছিল সুং, রেগেওছিল ঝিঁঝিটা, কিন্তু কাজ হয়নি, গ্রেভ ডিগারের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠেনি ওটা।

হ্যাঁ, দারুণ একটা সন্ধ্যা কাটিয়ে এসে খুবই আনন্দিত ফু। আসলে এই বছরটাই ওর জন্য একটা সুখের বছর। বিভিন্ন খাত থেকে প্রচুর টাকা উপার্জন হচ্ছে। যে ব্যবসায় হাত দিচ্ছে, তাতেই সফল হচ্ছে। তবে এটাই ওর প্রথম সাফল্য নয়। অতীতের কথা ভাবল ও। ভাগ্যিস, প্রায় চারশো বছর আগে একজন চিনা ম্যানডারিন পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করতে গিয়ে ওদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে চিনা ভূখণ্ডের এই জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়েছিলেন! তাই এখানে এখন বসবাস

করতে পারছে ফু।

বিশাল চিন দেশে হাতির গায়ে উকুনের মত বসে রয়েছে এই খুদে পর্তুগিজ কলোনিটি। প্রায় আড়াই লাখ মানুষের বাস মূল ভূখণ্ডের গা থেকে বেরোনো উপদ্বীপ সহ দুটো দ্বীপ টাইপা আর কোলোন-এ। সব মিলিয়ে জায়গাটা কেনেডি এয়ারপোর্টের চেয়ে বড় হবে না—একবার প্লেনে করে আমেরিকা পেরোনোর সময় দেখেছে ও—তবে ছোট জায়গার সুবিধেও আছে।

এত ছোট জায়গা বলেই ম্যাকাওয়ের প্রতি কোন নজর নেই রেড চায়নার, লোভের দৃষ্টি পড়ে না। হাইড্রোফয়েলে চড়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চক্কর দিয়ে আসা যায় প্রায় পুরো দেশটা। হং কং-এর মতই অর্থনৈতিক অবস্থা এর, খুবই উন্নত। এই উপনিবেশের সরকারকে সমর্থন করে ফু। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে বসে থাকা কর্তৃপক্ষরা এই দেশটিকে অপরাধের অতলে তলিয়ে দিতে চান না, কিন্তু অবৈধভাবে এখানে উপার্জিত বিপুল অর্থের কথা জেনেও না জানার ভান করেন। কারণ, টাকাটা ওদের দরকার। প্রচুর সোনা আমদানী হয় এখানে, অবশ্যই সরকারিভাবে নয়, বার্ষিক প্রায় বাইশ টন। ছোট ছোট প্যাকেটে সেসব সোনা আসে দূরপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে, যেখানকার ধনী মানুষেরা কাগজের নোটের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, গোপনে প্রচুর পরিমাণে সোনা জমা করে রাখে বিদেশী ব্যাংকে, চড়া সুদের বিনিময়ে।

এসব ধনীদের কারণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ব্যাংকো ম্যাকাও ডা কমার্শিয়াল। আর এই ব্যাংকের সহায়তায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে রমরমা ব্যবসা করছে। ব্যাংকটার মালিক ফু-র মাধ্যমে আলেপ্পো থেকে মেয়েমানুষ কিনে মণ্টি ভিডিওতে বিক্রি করতে পারে নারী পাচারকারীরা। থাইল্যাণ্ড আর লাওসের সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছে মায়ানমার, সেই গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল থেকে কাঁচা অপিয়াম কিনে ম্যাকাওয়ের ত্রিসীমানায় না এনেও হেরোইন তৈরি করে মার্সেইয়ের ভিতর দিয়ে পার করে দিতে পারে চোরাচালানীরা তারই সহযোগিতায়।

এমনকী *কমুনিস্টদের* সঙ্গে সীমান্ত পারাপারের ব্যবসাটাও জমজমাট। এমন কিছু পণ্যের প্রয়োজন হয় চিনাদের, যেটার সরবরাহ ফু-র মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ব্যারিয়ার গেট-এর ওপাশে কুয়াংট্রয়াং-এর প্রচণ্ড প্রভাবশালী জেনারেল চিং পো-র সঙ্গে ফু-র গলায় গলায় ভাব থাকাতে এসব অবৈধ কাজ করতে কোনই অসুবিধে হয় না ওর এজেন্টদের। তবে সীমান্ত অতিক্রম করে ওপাশে যাওয়ার কথা কোনদিন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে না ফু। ওপারের ওদেরকে সামান্যতম বিশ্বাস করে না ও। বাণিজ্যিক বিষয়ে ওদের ওপর কিছুটা নির্ভর করা গেলেও রাজনৈতিকভাবে ওরা ভয়ানক বিপজ্জনক, সহিংসতা আর যুক্তিহীনতা অন্ধ করে রাখে ওদেরকে। রাখুক, ওটা ওদের ব্যাপার, ওসব নিয়ে ভাবে না ফু। নিজেকে কোনরকম বিপদের মধ্যে না ঠেলে দিয়ে ব্যবসা করে যেতে পারছে, এতেই খুশি ও।

নিজেকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য যতটা সাবধান থাকা দরকার, থাকে ফু। অকারণে বিপদে ঝাঁপ দেয় না। ও জানে, আইনের ভিতরে-বাইরে প্রচুর শত্রু আছে ওর, অপরাধ জগতের প্রতিপক্ষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। নিজের

।র্সোন্যাল বডিগার্ড ছাড়া কোথাও নড়ে না ও, চুপচাপ স্বভাবের একজন থাইল্যাণ্ডার, দুই কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে এখন। ফু-র বাড়িটাকেও একটা সুরক্ষিত দুর্গ বলা চলে। আবহাওয়া ভাল থাকলে যখন এই মোটর ক্রুজারে ঘুমাতে আসে, কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয় তখন। তীর থেকে আধ মাইল দূরে নোঙর করা হয় জাহাজটাকে। ফু'র থাইল্যাণ্ডার বডিগার্ড ছাড়াও আরও পাঁচজন গার্ড পালা করে পাহারা দেয় জাহাজ। সবাই সশস্ত্র। ফু যতক্ষণ জাহাজে থাকে, একজন গার্ড তখন সারাক্ষণ রেডারের পর্দায় সতর্ক দৃষ্টি রাখে, সন্দেহজনক কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

সন্ধ্যাটাকে আরও মোহনীয় করে তোলার জন্য কোন মেয়েকে ডাকবে কি না ভাবল ফু। বাদ দিল চিন্তাটা। ঝিঁঝির লড়াইয়ে যে আনন্দ পেয়েছে, এক সন্ধ্যার জন্য যথেষ্ট। ওর মতে, বোকারাই কেবল একটা বিনোদনের ওপর আরেকটা বিনোদন চাপিয়ে মজা নষ্ট করে।

থাইল্যাণ্ডার বডিগার্ডের দিকে তাকিয়ে চিনা ভাষায় ফু বলল, 'জাহাজ ছাড়তে বলো। অ্যাঙ্করেজে নিয়ে গিয়ে নোঙর ফেলুক। আমি এবার ঘুমাব।'

কেবিনে ঢুকতেই ইঞ্জিনের মৃদু মসৃণ গুঞ্জন অনুভব করল। মুরিং থেকে সরে যাচ্ছে জাহাজ।

কেউ জানে না, খোলের নীচে এই মুহূর্তে ইস্পাতের ধাতব পাতের গায়ে দুটো ম্যাগনেটিক লিমপেট লাগিয়ে সেগুলো ধরে ঝুলে রয়েছে দুজন স্কুবা ডাইভার। জাহাজ জোরে চললে এভাবে ঝুলে থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ, কিন্তু এখন দূরে কোথাও যাচ্ছে না ক্রুজারটা, শুধু তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে নোঙর ফেলবে, তাই গতি কমিয়ে রাখা হয়েছে।

দশ মিনিটেই জায়গামত পৌঁছে গেল জাহাজ। নোঙর ফেলে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হলো। রেডারের সামনে পাহারায় বসল একজন গার্ড। দুজন টহল দিতে লাগল জাহাজে। অন্য দুজন ঘুমাতে গেল। চার ঘণ্টা পর পাহারা বদল হবে। ফু কেবিনে ঢুকে গেলে ওর ব্যক্তিগত বডিগার্ডও ঘুমাতে গেল। লিমপেট ছেড়ে দিল দুই স্কুবা ডাইভার। ডুব-সাঁতার দিয়ে জাহাজের পিছনে চলে এল। আস্তে মাথা তুলল খোলের গা ঘেঁষে। অ্যাকোয়ালাং আর ওয়েইট-বেল্ট আগেই খুলে ফেলে দিয়েছে। পানিতে তলিয়ে গেছে ওগুলো। বোটে করে কেউ আসে কি না, গার্ডদের নজর সেদিকে, জাহাজের খোল আঁকড়ে যে কেউ চলে আসতে পারে, কল্পনাতেও নেই ওদের।

দুই স্কুবা ডাইভার রানা ও সোহানা। রানার উরুর সঙ্গে একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ বাঁধা। সেটা থেকে টিউবের মত একটা রাবার রিং বের করে ফুলিয়ে বাতাস ভরল রানা, তারপর ওটায় ভর দিয়ে চুপচাপ ভেসে রইল দুজন। হাত-পা নেড়ে ভাসতে হলে পানিতে আলোড়ন উঠত, কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। ছোট একটা নাইলনের দড়ির এক মাথা রিঙে বাঁধা, আরেক মাথায় একটা সাকশন ডিস্ক লাগানো—সেটা জাহাজের পিছনের খোলে আটকে দিয়েছে রানা। অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল দুজনে। পানি মোটামুটি ঠাণ্ডা, তবে তত বেশি নয়, তা ছাড়া গায়ের ওয়েট-সুটও ঠাণ্ডা ঠেকাচ্ছে।

রাত একটায় হুইলহাউসে রেডার-স্ক্রিনের সামনে বসা গার্ডের মনে হলো দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে, কিন্তু দরজা খোলার শব্দ পায়নি ও। ঘুরে তাকাতে গেল, আর ঠিক এই সময় নিভে গেল ঘরের আলো। তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেহুঁশ হয়ে গেল ও। বাইরে পাহারারত দুজন পেট্রল গার্ডের অবস্থা আগেই ওর মত হয়ে গেছে। একজন ঘাড়ে কারাতের কোপ খেয়েছে, আরেকজন কানের একটু উপরে মাথায় কীসের যেন বাড়ি খেয়েছে—গোল আলুর মত ফুলে গেছে জায়গাটা। তবে দুজনেই কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে বাকি দুজন প্রহরী ও ফু ক্যানটাকির ব্যক্তিগত বডিগার্ডেরও একই হাল হলো। তবে এদেরকে আর আঘাত করতে হয়নি, ঘুমন্ত অবস্থায় নাকের কাছে অ্যারোসল কনটেইনারে ভরা ইথার স্প্রে করাতে আরও গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে। আর সবশেষে বিলাসবহুল কেবিনের ভিতর ফু ক্যানটাকিকেও নাকে ইথার স্প্রে করে ঘুম পাড়ানো হলো।

দশ মিনিট পর ডেক থেকে একটা টর্চ লাইটের সাহায্যে সঙ্কেত দেয়া হলো, টর্চের সাহায্যেই জবাব এল আধমাইল দূরের ছোট একটা ডিঙি থেকে। চালু হলো বোটের ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দুই মিনিটের জন্য ফু'র জাহাজের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তিনজন প্যাসেঞ্জার উঠল বোটে, তাদের একজনকে ধরাধরি করে তোলা হলো, কম্বল দিয়ে পেঁচানো তার দেহ। রওনা হয়ে গেল ডিঙ্গি।

জেগে উঠে ফু ক্যানটাকি দেখল, একটা ক্যানভাসের খাটিয়ায় শুয়ে আছে। ছোট্ট ঘরটার সাদা দেয়ালগুলো রঙচটা। চমকে উঠল ও। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। নিচু ছাত থেকে ঝুলছে একটা ইলেকট্রিক বাল্‌ব্। এত বেশি পাওয়ারের, ওটার দিকে তাকালে আপনিই বুজে আসে চোখের পাতা। একধারে বড় একটা জানালা মোটা কাপড়ের পুরানো পর্দা দিয়ে ঢাকা।

এক কনুইয়ে ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করল ফু। এটা কী করে সম্ভব? ভাবল ও। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। ও তো ঘুমিয়ে ছিল ওর নিজের মোটর ক্রুজারের বিলাসবহুল কেবিনে, কড়া পাহারার মধ্যে; অথচ জেগে উঠল এমন একটা বিশ্রী জায়গায়! কাঠের সাধারণ টেবিল, সাধারণ চেয়ার, দেয়াল ঘেঁষে রাখা ফাইলিং কেবিনেট, এ-কী অবস্থা! সেনাছাউনির ছিমছাম, সাদামাটা ঘরের মত লাগছে অনেকটা।

টেবিলের অন্যপাশে বসা মানুষটার দিকে তাকিয়ে পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল ওর। চল্লিশ-পঞ্চাশের মত বয়েস। খাটো করে ছাঁটা চুল। মেটে সবুজের উপর ধূসর ছাপ দেয়া কাপড়ের ইউনিফর্ম, কলারে লাল ব্যাজ। টেবিলে কনুইয়ের পাশে ফেলে রাখা আর্মি ক্যাপটায় লাল রঙের পাঁচ মাথাওয়ালা তারকা দেখে চমকে গেল আত্মা। গভীর মনোযোগে একটা খোলা ফাইল দেখছেন জেনারেল। এঁকে চেনে না ও।

ধীরে ধীরে উঠে বসল ফু। অসুস্থ বোধ করছে। দরজায় দাঁড়ানো একজন সিপাইকে পাহারা দিতে দেখল। কাঁধে ঝোলানো টাইপ ৫৬ অ্যাসোল্ট রাইফেল, রাশান ৭.৬২ এমএম এ কে-ফোরটিসেভেন রাইফেলের চাইনিজ ভার্শন। এক

কোণে একটা রেডিওর সামনে কানে ইয়ার-ফোন লাগিয়ে বসে আছে আরেকজন পেটি অফিসার. একটা মেসেজ-প্যাডে কী সব লিখছে। ফু'র চোখ আবার ফিরে এল টেবিলে বসা জেনারেলের দিকে।

মুখ তুললেন জেনারেল। 'ঘুম ভেঙেছে তা হলে,' চীনা ভাষায় বলে একটা সিগারেট ধরালেন। ব্র্যাণ্ডটা চিনতে পারল ফু। ক্যাণ্টনের সিগারেট কারখানায় তৈরি।

কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল ফু, 'এ-সব কী?'

মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কয়েক সেকেণ্ড কঠিন, শীতল, ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। 'আমি জেনারেল হিং কু-ফুয়ান। অনুমতি না নিয়ে গোপনে অবৈধভাবে পিপলস রিপাবলিকে ঢুকেছ তুমি।'

ঢোক গিলল ফু। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। মাথা দপ্‌দপ্‌ করছে। মগজটা ঘোলাটে। 'গোপনে ঢুকিনি আমি—মানে, আমি বলতে চাইছি নিজের ইচ্ছেয় ঢুকিনি!'

'তা হলে কার ইচ্ছেয় ঢুকেছ?'

'আ-আমি জানি না!'

ফাইল বন্ধ করে দরজায় দাঁড়ানো সিপাহির দিকে তাকালেন কু-ফুয়ান। 'ওকে নিয়ে যাও তো। ঠিক সাতদিন পর আবার নিয়ে আসবে। এমন আচ্ছামত বানিয়ে আনবে, যাতে কিছু জিজ্ঞেস করলেই হড়বড় করে মুখে খই ফোটে।'

'না না না!' মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল ফু। 'প্লিজ, জেনারেল, আমি সত্যি বলছি, নিজের ইচ্ছেয় ঢুকিনি! আমি জানিই না কীভাবে এখানে এলাম। আপনি দয়া করে যদি একবার জেনারেল হুয়ান কি-চানকে ফোন করে আমার কথা বলেন, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, আমার পক্ষে কথা বলবেন তিনি। পিপলস রিপাবলিকের পক্ষে আমি যে কত কিছু করেছি, সব বলবেন।'

'হুয়ান কি-চানকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে,' কু-ফুয়ানের শীতল দৃষ্টি রাগে জ্বলে উঠল। 'হঠাৎ করেই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে আমাদের সিক্রেট সার্ভিস, হুয়ান কি-চান একটা বিদেশি রাষ্ট্রের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করছিল।'

ফু ক্যানটাকির মনে হলো, মাথায় হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে ওকে। জোরে জোরে কয়েকবার দম নিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে যা জিজ্ঞেস করবেন, সব কথার জবাব দেব আমি, জেনারেল। একটা মিথ্যে কথা বলব না। বলুন, কী জানতে চান।'

একটা প্যাড টেনে নিলেন জেনারেল হিং কু-ফুয়ান। সিগারেটের জ্বলন্ত মাথাটা ফু'র দিকে পিস্তলের নলের মত তাক করে ধরলেন। 'একটা কথা মাথায় রাখো, তোমার কাজকর্মের অনেক কিছুই আমাদের জানা, ফু ক্যানটাকি। তোমার জবাব যদি আমাদের জানা তথ্যের সঙ্গে না মেলে, ভীষণ পস্তাতে হবে তোমাকে। দ্বিতীয় আর কোনও সুযোগ পাবে না।'

ফু'র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। 'মিথ্যে বলার প্রশ্নই ওঠে না, জেনারেল।'

'এখানে এসে বসো,' সিগারেটের মাথা নেড়ে টেবিলের সামনে ওঁর মুখোমুখি

রাখা চেয়ারটা দেখালেন জেনারেল।

কম্পিত পায়ে হেঁটে এসে চেয়ারটায় ধপ করে এমন ভঙ্গিতে বসল ফু, যেন পড়ে যাচ্ছিল।

কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখলেন জেনারেল। 'হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্রদ্রোহী হুয়ান কি-চানকে দিয়েই শুরু করা যাক।'

ঘণ্টাখানেক পর, ভয় আর অনর্গল কথা বলার কারণে শুকিয়ে যাওয়া গলা দিয়ে স্বর বের করতে কষ্ট হতে লাগল ফু'র। এতকাল ধরে যেসব কথা গোপন ছিল, সে-সবের কিছুই আর গোপন রাখতে পারেনি, সব ফাঁস করে দিয়েছে প্রচণ্ড আতঙ্কে। তবে সেসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ও। ওর এখন একটাই লক্ষ্য, জেনারেল কু-ফুয়ানের হাত থেকে মুক্তি। সব বলে দেয়ার পরও মুক্তি আদৌ পাবে কি না জানে না এখনও।

সোনার কথা জানাল ও, জানাল ড্রাগ, হীরা আর অবৈধভাবে গম রপ্তানীর কথা; বিদেশি মুদ্রার অবৈধ ব্যবসা, ক্যাসিনোতে জুয়া আর মদের কারবারের কথা বলল। উচ্চপদস্থ ঘুষখোর কর্মচারীদের কথা জানাল। লাপা আইল্যাণ্ড থেকে প্রণালী পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া আদম ব্যবসায়ীদের নামও বলল। পিপল'স রিপাবলিকের শাসকগোষ্ঠীর *সুখের স্বর্গ* ছেড়ে পালিয়ে আসা সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর *বিশ্বাসঘাতকদের* কথা বলতেও ভুলল না—তবে এই একটি ব্যাপারে যে ওর কোনও হাত নেই সেটা জানিয়ে দিল বিনয়ের সঙ্গে।

প্যাডের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে পেপারক্লিপ দিয়ে আটকে রাখলেন জেনারেল। একটা সাদা পাতায় পেন্সিলের সীসটা আলতোভাবে ধরে রেখে বললেন, 'এবার তোমার ব্যাংকটার কথা বলো। ব্যাংকো ম্যাকাও ডা কমার্শিয়াল। ওতে একটা অ্যাকাউণ্ট আছে দি ওরিয়েণ্ট রিফিউজি রিলিফ ফাণ্ড-এর নামে।'

মাথা নাড়ল ফু। 'না।'

কঠিন হলো জেনারেলের কালো চোখজোড়া। হুমকির ভঙ্গিতে পেন্সিলের পিছনটা ঠুকলেন টেবিলে। 'ভাবো, ফু, ভাল করে ভেবে বলো। তোমাকে আগেই বলেছি, তোমার সব খবর আমরা রাখি।' ফাইলের স্তূপে রাখা একটা লাল রঙের মোটা ফাইলের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'সব লেখা আছে ওটাতে।'

উদ্বেগ ফুটল ফু'র চোখে। কোলের ওপর রাখা হাত দুটো কাঁপছে। 'আমি সত্যি বলছি, জেনারেল, বিশ্বাস করুন, ওই নামে কোনও অ্যাকাউণ্ট আমার ব্যাংকে নেই।'

'আরও ভাবো। হতে পারে, ওই ফাণ্ডের অসৎ ডিরেক্টরদের একজন হয়তো অন্য নামে অ্যাকাউণ্ট খুলেছে। তোমার সুবিধের জন্যে একটা সূত্র দিচ্ছি, ওটা একটা চ্যারিটি ফাণ্ড।'

'ও, তাই বলুন!' স্বস্তির পরশ ছড়িয়ে পড়ল ফু ক্যানটাকির সারা মুখে। 'একটাই চ্যারিটি ফাণ্ডের অ্যাকাউণ্ট আছে আমার ব্যাংকে। আপনি নিশ্চয় দি ওরিয়েণ্ট সোসাইটি ফর দ্য চিলড্রেন অ্যাণ্ড ডিসেবল্‌ড্-এর কথা বলছেন।'

'হয়তো।' জেনারেলের চোখে সন্দেহের ছায়া। 'ওটার ডিরেক্টর কে?'

'ডিরেক্টর নয়, প্রিন্সিপাল। ওর সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি আমার। ওই ফাণ্ডের

হয়ে যে লোকটা কাজ করে, আমার কাছে আসে, সে একজন শ্বেতাঙ্গ পর্তুগিজ, নাম হুয়ান ক্যাসটিলো।'

'প্রিন্সিপালের নাম কী?' নোটবুকের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ফু'র দিকে মুখ তুললেন জেনারেল।

'টাকা তোলার জন্যে সমস্ত চেক, ড্রাফট ও আদেশ-নির্দেশের কাগজ-পত্রে এইচ. ক্লিঙ্গার নামে একজনের সই থাকে। ওই লোকটাই প্রিন্সিপাল কি না, আমি জানি না।'

'বানান বলো।' নামটা প্যাডে লিখে নিয়ে জেনারেল বললেন, 'বিদেশি মনে হচ্ছে। আমেরিকান, ইংলিশ, আইরিশ, এ-সব দেশের কেউ হবে। থাকে কোথায়? হং কং-এ?'

'না। কয়েক বছর আগে প্রথমে ওদের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগের যে ঠিকানাটা দিয়েছিল, সেটা ছিল নিউ ইয়র্কের। মাস দুয়েক আগে ওটা বদলানোর নির্দেশ এসেছে। নতুন যে ঠিকানা দিয়েছে, সেটা ফ্রান্সের।' জোরে জোরে কপাল ডলে যেন ঠিকানাটা মনে করার চেষ্টা করল ফু। 'একটা দুর্গের ঠিকানা...কী যেন...হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শ্যাতো ল্যানসিউ। ওটা কোনও শহর নাকি গ্রামে তা জানি না—নামটা অবশ্য দিয়েছে, মনে করতে পারছি না, তবে অ্যারিয়েজের কোথাও হবে। রেজিস্টার দেখলে সব বলতে পারব। যদি চান, তো ফিরে গিয়ে সেটা ফোন করে জানাতে পারি আপনাকে...'

'না, ওটা জরুরি কোন বিষয় নয়।' প্যাড থেকে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে দলামোচড়া করলেন জেনারেল। 'কিছু কিছু প্রশ্ন করে আমি বুঝতে চেয়েছি তুমি সত্যি বলছ, না মিথ্যে বলছ।'

'আমি সত্যি বলছি...'

'সত্যি-মিথ্যের ব্যাপারটা আমি বুঝব। এখন অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। তুমি নোংরা ছবি বানানোর একটা সঙ্ঘবদ্ধ দলকে টাকা সাপ্লাই দাও।'

'নোংরা ছবি, জেনারেল?' আঁতকে উঠল যেন ফু। 'মানে ব্লু ফিল্মের কথা বলছেন? বিশ্বাস করুন, ওই ছবির ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। একটা ছবিও দেখিনি জীবনে।'

আবার চলল প্রশ্নের পর প্রশ্ন। ফু'র মনে হলো অনন্তকাল ধরে চলছে এই জেরা। অবশেষে পেন্সিল নামিয়ে রাখলেন জেনারেল। দরজায় দাঁড়ানো সিপাই-এর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। এক গ্লাস পানি এনে দিল সিপাই।

কাঁপা হাতে গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলল ফু। ওপরে-নীচে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ, জেনারেল,' কোলাব্যাঙের স্বর বেরোল কণ্ঠ থেকে। 'আপনার মত ভালমানুষ আমি কমই দেখেছি...' গ্লাসটা ওর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিল সিপাই। সামান্য থমকে গিয়ে জেনারেলের দিকে তাকিয়ে হাসল ফু। 'এবার আমার পিপল'স রিপাবলিকে ঢুকে পড়াটা মাপ করবেন তো? সত্যি বলছি, আমি ইচ্ছে করে ঢুকিনি...'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিলেন জেনারেল। তবে নরম হয়ে এসেছে দৃষ্টি। তাতে আশা জাগল ফু'র মনে। জেনারেল বললেন, 'সেটা এখনও ভেবে দেখিনি।

তবে জেরা করার সময় তুমি কোনও উল্টোপাল্টা জবাব দাওনি, এটা তোমার পক্ষে যাবে...'

শেষ কথাগুলো আর কানে গেল না ফু'র। তার আগেই কালো অন্ধকার নেমে এল চোখের সামনে। টেবিল থেকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল ওকে সিপাই। রেডিও অপারেটরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল। উঠে দাঁড়াল অপারেটর। সে আর সিপাই মিলে ফু'কে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল হিং কু-ফুয়ান। বেশ স্পষ্ট ইংরেজিতে বললেন, 'উফ্, হ্যামলেট নাটকে অভিনয় করতে গিয়েও এত ক্লান্ত হইনি।'

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল রানা ও সোহানা। দুজনের পরনেই স্ল্যাকস আর সোয়েটার। হাসিমুখে এগিয়ে এসে জেনারেলের হাত চেপে ধরল রানা। 'তোমাকে একটা অস্কার দিয়ে দেয়া উচিত, ওয়াং। তোমাদের সব কথা টেপে রেকর্ড করে নিয়েছি। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা রিহার্সাল দিয়ে যে অভিনয়টা করলে, সত্যি, প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না!'

কেমব্রিজের পেমব্রোক কলেজ থেকে অভিনয়ের ওপর ডিগ্রি নেয়া রানার চিনা বন্ধু ওয়াং শি চেন হেসে বলল, 'তুমি যেভাবে শিখিয়েছ, সেভাবেই করেছি। আমি তো আর কখনও আর্মিতে ছিলাম না।'

'কিন্তু তোমার কথাবার্তায় আমার নিজেরই ভুল হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো সত্যিই তুমি আর্মির জেনারেল। যাকগে, আবার তোমাকে দেখলে চিনতে পারবে না তো ও?'

'না, পারবে না, চিক-প্যাড দুটো খুলে ফেললে, আর মাথায় আবার চুল গজিয়ে গেলে আমি তখন অন্য মানুষ। তা ছাড়া এমনিতেই হং কং-এ ও বিশেষ আসে-টাসে না। এলেও কিছু করতে পারবে না। যাকগে, বাদ দাও ওসব। আসল কথা বলো, ওর কথা থেকে তোমার লোকটাকে বের করতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, ক্লিঙ্গার। শ্যাতো ল্যানসিউ।'

'গুড।' ফু'কে দেখাল ওয়াং শি চেন। 'এটাকে কী করবে?'

'যেখান থেকে তুলে এনেছি, সেখানেই ফেলে রেখে আসব,' রানা বলল। 'তবে ওর নিজের বোটে নয়। জেগে উঠে ও দেখবে, ম্যাকাওয়ের বন্দরে কোনও একটা বোটের মধ্যে পড়ে রয়েছে।'

'ভাবছি,' তরলকণ্ঠে সোহানা বলল, 'ওকে যে ঠকানো হয়েছে, সেটা বুঝতে পারবে কি না ও?'

'প্রথমে পারবে না,' রানা বলল। 'তারপর যখন দেখবে বহাল তবিয়তেই কুয়াংটুয়াঙে কর্তৃত্ব করছে জেনারেল হুয়ান কি-চান, তখন কপাল চাপড়াবে।' রানার চোখে মিটিমিটি হাসি। 'আর তারপর...আমার ধারণা আগামী কয়েকটা মাস মাথা ঘামিয়ে প্রচুর সময় নষ্ট করবে ও, জানতে চেষ্টা করবে কে বা কারা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে কথা বলতে বাধ্য করেছে।'

বাংকে নেতিয়ে থেকে হাত-পাগুলো টান টান করে দিল সলীল সেন। মুখের ভিতরটা পিত্তরসে ভরে গেছে। আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠছে দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলো। সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। কুঁচকে গেছে পরনের নোংরা পোশাকগুলো, জ্যাকেটটা ছেঁড়া। নিজেকে একটা জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া মনে হচ্ছে ওর।

তবে মগজ অনেকটা সাফ হয়ে এসেছে, টোপাক ও ক্লিঙ্গারের সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পর যেমন ছিল, তারচেয়ে ভাল এখন। ওষুধের আড়ষ্টতাও অনেকখানি কেটেছে জো লুই-এর কল্যাণে।

বাংকের মাথার কাছে কাঠের গায়ে সরু দাগগুলোর দিকে তাকাল ও, নখ দিয়ে আঁচড় কেটে দাগ দিয়েছে। ছয়টা দাগ। তারমানে অন্তত ছয়দিন পেরিয়েছে, যদি ওর অনুমান সঠিক হয়ে থাকে। খুব সাবধানে আর ধীরে ধীরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিডন্যাপাররা, এ জন্যে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল ও। কেন এ রকম করছে ওরা, সেটাও বুঝতে পেরেছে। প্রচণ্ড নির্যাতনের মাধ্যমে একজন মানুষকে খুব দ্রুত নরম করে ফেলা যায়, কিন্তু তাতে কিছু কিছু মানসিক সমস্যা তৈরি হয়। আর তখন কথা আদায়ে বিঘ্ন ঘটে। কারণ স্মৃতিশক্তি ব্যাহত হয়। তখন যেসব কথা সে বলে, তার বেশির ভাগই সঠিক হয় না, গা বাঁচাবার জন্য উল্টোপাল্টা জবাব দেয়।

বেশি পরিমাণে বারবিচিউরেট জাতীয় ঘুমের বড়ি কিংবা স্নায়ু উত্তেজক ওষুধ একইসঙ্গে খাইয়ে দিলে দেহের ভিতরে ভয়ানক একটা পরস্পরবিরোধী আলোড়ন সৃষ্টি হয়, আর তাতেও উদ্দেশ্য পূরণে অসুবিধে হয়। আর সত্যি কথা বলানোর জন্যে খাওয়ানো তথাকথিত *ট্রুথ ড্রাগ* তো হলো একটা ভুয়া জিনিস। গালভরা নাম, কাজের কাজ কিচ্ছু করে না। ও-সব ওষুধ খাওয়ালে উত্তেজনা প্রশমন হয়, দ্রুত ঘুম চলে আসে, আবার খরচও বেশি। তারচেয়ে মেথামফেটামিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ওষুধগুলো দেহকে প্রাণবন্ত আর মেজাজ ফুরফুরে করে তোলে। প্রচুর কথা বলতে ইচ্ছে করে, মুখে যেন খই ফুটতে থাকে, কথা বলা ঠেকানো রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে।

চোখ বুজে ক্লান্ত দেহটাকে শিথিল করে দেয়ার চেষ্টা করল সলীল। ছয় দিন হয়ে গেছে। হাল ছেড়ে দেয়ার ভান করে কিছু কিছু মিথ্যে তথ্য দেয়ার সময় এসে গেছে। তাতে আরও কয়েকটা দিন নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম দিনটির কথা ভাবল ও, যেদিন দাড়িওয়ালা বিশালদেহী লোকটা এসে ওকে জেরা করার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। লোকটার আসল নাম কী জানে না ও, তবে সবাই *মিস্টার জো লুই* বলে ডাকে। ইতিমধ্যে বাকি সবার নাম জেনে গেছে সলীল। যে বাড়িটার ছোট্ট এই সেলে রয়েছে ও, সেই বাড়িটার নামও জানে, শ্যাতো ল্যানসিউ। পিরেনিজের পাদদেশে তৈরি ছোটখাট একটা দুর্গ। ষোলো শতকে বানানো এই দুর্গের একটা অংশ উনিশশ' সালে মেরামত করেছিল সেনাবাহিনী। তবে বর্তমানে কেউ আর থাকতে আসে না, হেনরি ক্লিঙ্গারের মত লোকেরা ছাড়া।

স্টাডির যে ঘরটাতে ক্লিঙ্গারকে প্রথম দেখেছে সলীল, সে ঘরটা এককালে সম্ভবত সিউইং রুম ছিল। ডেস্কের ওপাশে বসে ছিল লোকটা। পাশের একটা

আর্মচেয়ারে বসে নখে রঙ লাগাচ্ছিল ওর সোনালি চুলওয়ালি, অসম্ভব মাথামোটা বউটা। পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সলীলকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল জো লুই। বেরিয়ে যাচ্ছিল ঈগলের মত বাঁকা নাকওয়ালা মহিলাটা, নাম মেরি ফ্রিজেট, এখানকার সবাই শুধু মেরি বলে ডাকলেও জো লুই ওকে ডাকে *মিসেস ফ্রিজেট*। সলীলকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মেরি।

প্রেমময় দৃষ্টিতে স্ত্রীর নেইলপলিশ লাগানো দেখছিল ক্লিঙ্গার। সলীলকে নিয়ে জো লুই ঘরে ঢুকতেই ফিরে তাকিয়েছিল। জো লুই বলেছিল, 'সলীল সেন, বস্।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মস্ত থাবা তুলে চেয়ার দেখিয়ে সলীলকে বসার ইঙ্গিত করে ক্লিঙ্গার বলেছে, 'বসুন, মিস্টার সেন। মেরি, তুমি এখন যাও।'

ডেস্কে ক্লিঙ্গারের মুখোমুখি বসেছে সলীল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে লোকটার দিকে। কোন্ দেশি বোঝার চেষ্টা করেছে। সম্ভবত, আমেরিকান। তবে লোকটা যে ভয়ঙ্কর তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। জো লুই সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সলীলের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসে বলেছে ক্লিঙ্গার, 'আসল কথায় আসা যাক, মিস্টার সেন। গত কয়েক দিনে প্রচুর চিন্তা করার সময় পেয়েছেন। আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধে হয়নি, মূল্যবান গোপন তথ্য আদায়ের জন্যেই আপনাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে।'

খিলখিল করে হেসেছে সোনালিচুলো মহিলাটা। 'এই যেমন, গোপন ফর্মুলা-টর্মুলা, তাই না, ডিয়ার? হয়তো নতুন ধরনের কোনও অ্যাটমিক সাবমেরিনের কার্বুরেটর।'

'তুমি থামো, হানি,' মোলায়েম স্বরে ক্লিঙ্গার বলল। 'আমি এখন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে জরুরি কথা বলছি।' সলীলের দিকে তাকাল ও। 'এত ঘামছেন কেন? আপনার গোপন তথ্য তো এখনই শুনতে চাইছি না আমরা। বরং আমাদের ব্যবসার কথা বলি, শুনুন।' ডেস্কে রাখা একটা সিগারের বাক্স খুলল ও। সলীলের দিকে তাকাল। 'সিগার?'

শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল সলীল, 'না, থ্যাংক ইউ।'

একটা সিগার ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল ক্লিঙ্গার। চুরুটের জ্বলন্ত মাথাটার দিকে তাকাল। 'সোজাসাপ্টাভাবেই বলা যাক: আমি ব্ল্যাকমেইলের ব্যবসা করি। ব্যবসা ব্যবসাই, আমি একে খারাপভাবে দেখি না। একেকজন মানুষ একেক ব্যবসা করে, ফোর্ডও তো গাড়ির ব্যবসা করত, সেটা কি খারাপ? যাকগে, একটা প্রশ্ন করি আপনাকে, মিস্টার সেন, সবচেয়ে বেশি টাকা আজকাল কোনখান থেকে আসে, বলুন তো? টাকাও বেশি, অথচ ট্যাক্সও দিতে হয় না?'

সলীল জবাব দিল, 'আপনিই বলুন।'

'ক্রাইম, মিস্টার সেন, অপরাধ-জগৎ থেকে। ড্রাগ, চোরা-চালান, পতিতাবৃত্তি, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং, জুয়া এ-সব থেকে প্রচুর টাকা আসে। কিন্তু এগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় বেশি, পুলিশি হামলার ভয়ও বেশি। কিন্তু ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারটা অন্যরকম।' সামনে ঝুঁকে সিগারের জ্বলন্ত মাথা দিয়ে বাতাস খোঁচা দিল ক্লিঙ্গার। 'এটা একমাত্র অপরাধ, যেখানে শিকারের কাছ থেকে

সহযোগিতা পাওয়া যায়। ঠিক? আর ব্ল্যাকমেইলারের চেয়ে ব্ল্যাকমেইলড্ যে হয়, সে-ই পুলিশকে বেশি ভয় পায়। ঠিক কি না, বলুন?'

সলীল কিছু বলার আগেই ক্লিঙ্গারের স্ত্রী বলল, 'ঠিক, মাই ডিয়ার।' দুই হাতের দশ আঙুল ছড়িয়ে স্বামীকে নখগুলো দেখাল ও। 'রঙটা পছন্দ হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, হানি, খুব সুন্দর। তো, মিস্টার সেন, এই ব্যবসাটা সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে?'

একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ক্লিঙ্গারের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল সলীল, 'খুব বেশি না। তবে আমাকে মক্কেল হিসেবে মূল্যবান ভাবলে ভুল করবেন।'

হাসল ক্লিঙ্গার। 'আপনি মক্কেল নন, মিস্টার সেন। আপনি আসলে কাঁচামালের ডিপো, যেখান থেকে প্রচুর মূল্যবান মক্কেল সংগ্রহ করা যাবে। যে ব্যবসা করছি, তাতে সব সময় আমাদেরকে নতুন নতুন মক্কেলের খোঁজে থাকতে হয়। আমেরিকায় মানসিক চিকিৎসার জন্যে ছয়টা বিশাল প্রাইভেট নার্সিং হোম খুলেছিলাম আমি। অবৈধ কাজ বলতে পারবেন না, তাই না? ওসব ক্লিনিকে পরামর্শ নিতে আসত রোগী, ভর্তি হতো। ওদের রেকর্ড দেখতাম। কেউ বিষণ্নতায় ভোগা রোগী, কেউ যৌন সমস্যার কারণে ভর্তি হতো, কেউ বা মাতলামি সারাতে, কিছু কিছু জটিল মানসিক রোগীও আসত। রোগগুলো কেন হয়েছে ওদের, খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাতাম আমরা। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে, সম্মোহন আর আধুনিক ওষুধের সাহায্যে বের করে আনতাম ওদের মনের গভীরে লুকানো তথ্য, জেনে নিতাম ওদের কার কী দুর্বলতা। কী বলতে চাইছি, আশা করি বুঝতে পারছেন, মিস্টার সেন?'

তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল সলীল, 'কার কী দুর্বলতা সেসব জেনে নিয়ে ওদের ব্ল্যাকমেইল করতেন।'

'ঠিক ধরেছেন। এক জায়গায় বেশিদিন ব্যবসা চালাতে গেলে কিছু তো অসুবিধে হয়ই। তা ছাড়া ব্যবসা না বাড়ালে রোজগার কমে যায়। তাই ওখানকার ব্যবসা দেখাশোনার জন্যে লোক রেখে দিয়ে চলে এসেছি ইউরোপে, কাঁচামালের খোঁজে। তবে এখানে আমেরিকার মত অত সহজে নার্সিং-হোমের অনুমতি দিতে চায় না কোনও সরকার। ফ্রান্স, সুইডেন, জার্মানি, স্পেন, ইটালি, ইউ-কে —কোথাও না।'

মুখ তুলে তাকাল ওর স্ত্রী। স্বামীর কথায় যোগ করল, 'ওরা বলে আমরা বিদেশি। বুঝুন দেখি! বিদেশি হলেও সেবা করার অনুমতি দিতে বাধাটা কোথায়? হাঁদার দল!'

'ওরা ওদের নিয়ম মেনে চলে, হানি, হাঁদা বলার কিছু নেই,' শান্তকণ্ঠে বলল ক্লিঙ্গার। সলীলের দিকে ফিরল আবার। 'তা হলে বুঝতেই পারছেন, আমাদের অসুবিধেটা। আপনার কাছ থেকে কাঁচামাল জোগাড় করে আমরা কাজ শুরু করতে চাই।'

ভ্রূকুটি করল সলীল। 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না,' মিথ্যে কথা বলল ও।

দুই হাত ছড়াল ক্লিঙ্গার। 'আপনি এমন একটা প্রতিষ্ঠানের ইউরোপিয়ান চিফ—আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি—বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর যোগাযোগ রয়েছে আপনার। আণ্ডারওয়ার্ল্ড সহ নানা লোকের সঙ্গে ওঠা-বসা, পরিচয় আছে। অনেক অপরাধীকে চেনেন। অনেকের অনেক গোপন তথ্য জানেন। খুব বেশি না, আপনি আমাদের মাত্র ষাটজনের নাম বললেই চলবে।'

'অসম্ভব! এত লোকের নাম আমি পাব কোথায়?'

'পাবেন পাবেন, চেষ্টা করলে আরও অনেক বেশি লোকের নাম পাবেন। তবে আপত্তি যখন করছেন, ঠিক আছে, দশজন বাদ দিলাম, পঞ্চাশজনের নাম বলুন, তাতেই হবে। কোথায় কোন্ নতুন অস্ত্র, বোমা, মানুষ মারার জিনিসপত্র তৈরি হচ্ছে, সেসব জানতে চাই না আমি। আমি শুধু তাদেরই নাম জানতে ইচ্ছুক, যারা এমন কিছু করে বসে আছে, যা ফাঁস হয়ে গেলে বিপদে পড়বে। আর ফাঁস যাতে না হয় তার জন্যে নিয়মিত কিছু মাসোহারা দিয়ে যাবে আমাকে।'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল সলীল, হাত তুলে থামিয়ে দিল ক্লিঙ্গার। 'আরেকটা কথা। ধনী মক্কেল হলে খুবই ভাল। না হলেও অসুবিধে নেই, নিয়মিত মাসোহারাটা দিয়ে যেতে পারলেই আমরা খুশি। যতটা দেয়ার সামর্থ্য নেই, ততটা দাবি করি না আমরা। দাঁড়ান, আরেকটু বুঝিয়ে বলি। মক্কেলের ওপর এতটা চাপ সৃষ্টি করি না আমরা, যাতে ও ভেঙে পড়ে। শুধু অল্প অল্প করে রস চিপে নিই।' মোটা আঙুলগুলোকে এমনভাবে বন্ধ করল ও, যেন চামড়া ছাড়ানো কমলা চিপছে। 'মক্কেল যতটা দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তারচেয়ে অন্তত পঁচিশ পার্সেন্ট কম দাবি করি আমরা। ফলে, মনে মনে আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত থাকলেও, সহজে পুলিশের কাছে যায় না ওরা। কিছু বুঝলেন?'

'অর্থাৎ কোনরকম ঝামেলা না করে টাকাটা দিয়ে যায়?'

'নব্বই ভাগ ক্লায়েন্ট তা-ই করে। আজ পর্যন্ত মাত্র তিনজন মাথা ঠিক রাখতে না পেরে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ শুধু আমাদের রিসিভিং এজেন্সির সন্ধান করতে পেরেছে, আমাদের টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সেটা চাপা দেয়ার ব্যবস্থা করে মিস্টার জো লুই।'

'লোকগুলোকে ধমক-ধামক দিয়ে আসে?'

'আরে, না। ওসব ঝামেলার মধ্যে যায় না মিস্টার জো লুই। স্রেফ খুন করে। এমনভাবে কাজটা করে, মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট, পুলিশও ধরতে পারে না। এ-সব কাজে ও একটা শিল্পী। আপনার তো জানার কথা।'

'কিন্তু পুলিশ আপনার রিসিভিং এজেন্সির খোঁজ পেয়েই যায়।'

'পায়, তবে বিদেশের এমন জায়গায় রাখা হয় ওসব এজেন্সি, ব্যবস্থা নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সরাসরি অ্যাকশনে যেতে পারে না পুলিশ। এফবিআই কিংবা ইন্টারপোলের সাহায্য নিতে হয়। আমাদের এজেন্টরা ওদের কাছে কোন কথাই স্বীকার করে না। আশ্চর্য হয়ে কপালে চোখ তুলে বরং জিজ্ঞেস করে, কেউ যদি নিয়মিত চ্যারিটি রিলিফ ফাণ্ডে টাকা দেয়, তাকে ব্ল্যাকমেইল বলে কীভাবে? তা হলে কি সে টাকা ফেরত চায়? আর সেটা আদায়ের জন্যেই ব্ল্যাকমেইলের মত উদ্ভট কাহিনি বানিয়ে বলছে? বেশ, ওদের টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। পুরো

টাকাটাই নিয়ে যাক। এবং জীবনে আর কোনদিন ওদের কাছ থেকে কোনও সাহায্যের টাকা আমরা গ্রহণ করব না।' হাসল ক্লিঙ্গার। 'পুলিশ ভাবে, যে-লোক ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে, সে হয় পাগল, নয়তো ওদের সঙ্গে মজা করেছে। তারপর যখন লোকটা *আত্মহত্যা* করে কিংবা কোনও *অ্যাক্সিডেন্টে* মারা যায়, তখন ওদের ধারণা যে ঠিক, সে-ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হয়ে যায় পুলিশ। তবে বার বার এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পুলিশ সজাগ হয়ে উঠবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তবে ঘটে না; পুলিশের কাছে যেতে ভয় পায় ব্ল্যাকমেইলের শিকার বেশির ভাগ লোকই।'

অনেক কষ্টে চেহারাটাকে স্বাভাবিক রাখল সলীল। রুক্ষকণ্ঠে বলল, 'আপনার কাজে লাগতে পারে, এমন কোনও তথ্য নেই আমার কাছে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্লিঙ্গার। 'জানি। এ কথাই তো বলবেন। তবে আমাদের কোন তাড়াহুড়ো নেই, মিস্টার সেন। চিন্তা-ভাবনার জন্যে সময় দেয়া হবে আপনাকে।' চেয়ার থেকে বিশাল বপুটা টেনে তুলল ও। স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, 'এসো, হানি, চেয়ার ছেড়ে এখন স্বামীর কোলের ওপর বসো।'

নির্লজ্জের মত হেসে উঠল এমিলি।

তাকিয়ে আছে সলীল। একটা আর্মচেয়ারে বসতে দেখল ক্লিঙ্গারকে। ওর কোলের ওপর গিয়ে বসল এমিলি। এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল ক্লিঙ্গার। জো লুই-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাজ শুরু করো। তবে দুই মিনিটের বেশি এক সেকেণ্ডও না।'

কালো ব্লেজার পরা লোকটা, যাকে ভাইকিং কিংবা ক্রুসেডার বলে চালিয়ে দেয়া যায় অনায়াসেই, দ্রুত এগিয়ে এল। সলীলের একটা হাত ধরল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সলীল দেখল চেয়ারে নেই আর ও। এত শক্তি থাকতে পারে কোনও মানুষের দেহে, কল্পনাই করতে পারেনি। এক সেকেণ্ডের বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ও, জো লুই-এর একটা আঙুল দু'বার খোঁচা মারল ওর দেহে—একবার কাঁধের জোড়ায়, একবার উরুর জোড়ায়, নার্ভ সেন্টারে। সলীলের মনে হলো ইস্পাতের দণ্ড দিয়ে আঘাত করা হয়েছে ওকে। হাত আর পায়ে অবর্ণনীয় ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল। দেহটা ভাঁজ হয়ে গেল, দড়াম করে মাটিতে পড়ল ও। পরক্ষণে জো লুই-এর জুতোর ঠোকা লাগল এক পায়ের হাঁটুর একপাশে।

দাঁতে দাঁত চেপে আর্তনাদটা ঠেকাল সলীল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকল, গোঙানি বেরোচ্ছে গলার গভীর থেকে। একটানে ওকে তুলে দাঁড় করাল আবার জো লুই। হাত চালাল সলীল, কিন্তু আগেই কাবু হয়ে গেছে বলে ওর মনে হলো যেন পানির নীচে ঘুসি মারছে। খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলল জো লুই, মুচড়ে ধরে জোর এক ধাক্কায় ফেলল চেয়ারের ওপর। নতুন ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে গেল সলীলের দেহে। ওর মনে হলো, হাতটা ভেঙে গেছে।

পরের সময়টুকু প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটাল যেন ও। দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে জো লুই। নিখুঁত পেশাদারি ভঙ্গি—যেন স্বনামধন্য কোনও সার্জন অপারেশন করছে রোগীর দেহে। বেশির ভাগ ব্যথা দিচ্ছে নার্ভ সেন্টারগুলোতে মাঝারি আঘাত করে, হাড় না ভেঙে, পেশি জখম না করে।

কখনও মেঝেতে আছড়ে পড়ছে সলীল, কখনও হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ছে, কখনও লাফিয়ে উঠছে শূন্যে। একটা তুলো ভর্তি পুতুলের মত ওকে নিয়ে যেন খেলা করছে জো লুই; ওপরে তুলছে, নীচে ফেলছে, ঝাঁকি খাওয়াচ্ছে। একবার, জন্তুর মত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে যখন নিজেকে মেঝে থেকে টেনে তুলছে সলীল, চোখ পড়ল ক্লিঙ্গার ও তার স্ত্রীর দিকে। মহা উৎসাহে সলীলের যন্ত্রণা উপভোগ করছে দুজনে। জান্তব আনন্দে সাপের মত শরীরে মোচড়াচ্ছে উত্তেজিত এমিলি, জ্বলজ্বল করছে চোখ।

দুই মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর মেঝেতে কুকুরের মত কুঁকড়ে শুয়ে হাঁপাতে থাকল সলীল। পিছিয়ে গেল জো লুই। নিজের কানে নিজের ফোঁপানি আর গোঙানির শব্দ অদ্ভুত লাগল সলীলের, মনে হলো বহুদূর থেকে শুনতে পাচ্ছে শব্দগুলো, চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। কখনও কল্পনাও করেনি, ওর মত ট্রেনিং পাওয়া একজন এসপিওনাজ এজেন্টকে কেউ এমন অনায়াসে দুই মিনিটের মধ্যে এই অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে।

কিছুক্ষণ পর, নিজের সেলে বিছানায় পড়ে এই কথাগুলোই ভাবছে ও। রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, ঘৃণা, একইসঙ্গে খেলা করছে মনের ভিতর। ভাবছে, এ-লোকের সঙ্গে পারার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু কতদিন সহ্য করতে পারবে ও এই অত্যাচার? কতদিন মুখ না খুলে থাকতে পারবে? নানাভাবে নির্যাতন চালাবে ওরা ওর ওপর, চালাতেই থাকবে। ওর মুখ খুলিয়ে ছাড়বে।

বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ পেল না ও। সেই স্কটিশ মহিলাটা, মেরি ফ্রিজেট, ঢুকল ওর সেলে। মেরে ওকে অজ্ঞান করে বেরোনোর চিন্তাটা বাদ দিল সলীল। সীসার মত ভারি হয়ে আছে ওর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তা ছাড়া মোটেও দুর্বল মনে হচ্ছে না মহিলাকে। এবং নিশ্চয়ই এ-ধরনের সম্ভাবনার কথা না-ভাবার মত বোকা নয় ক্লিঙ্গার, দরজার বাইরে কাউকে না কাউকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সেটা জো লুইও হতে পারে।

সঙ্গে করে একটা হালকা ফোল্ডিং চেয়ার এনেছে মেরি। সেটাতে বসে কাঁটা আর সুতো বের করে লেস বুনতে আরম্ভ করল। মানুষকে নির্যাতনের ভয়াবহ গল্প শুরু করল ওর মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে, এতই সহজ ভঙ্গিতে, যেন ড্রইং রুমে টি-পার্টিতে বসে কেক বানানোর গল্প বলছে।

'জানেন, মিস্টার সেন... আপনার মত ভদ্রলোককে মিস্টার সেন বলেই ডাকা উচিত, কী বলেন? হ্যাঁ, যা বলতে এলাম, জো লুই-এর নির্যাতনের কাহিনি, কয়েক মাস আগে, সেপ্টেম্বরেই বোধহয়, না না, অক্টোবরের শেষে, মনে আছে, তার কারণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল তখন। লোকটার ওপর অনেক কিছুই করল ও, শেষমেশ একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করল। কী যন্ত্র, বলতে পারব না, যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, তবে ওটা দিয়ে লোকটার প্রজনন ক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছিল ও, সর্বনাশ করে দিয়েছিল একেবারে, পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে জেনি এসে আমাকে বলেছিল। ওর কথা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম লোকটার জন্য—কোনদিনই আর মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারবে না বেচারা! তবে তখনও জানতাম না, মেয়েদের সংস্পর্শে আসার সুযোগই পাবে না

ও আর কোনদিন, একটা একটা করে ওর হাড়গুলো ভেঙেছিল মিস্টার জো লুই, প্রচুর সময় নিয়ে, ধীরে ধীরে। তারপরও ছাড়েনি। অমানুষিক অত্যাচার করে মেরে ফেলেছিল লোকটাকে...'

একের পর এক এ-ধরনের আরও অনেক গল্প বলল মেরি।

এ-সব ওকে কেন শোনাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না সলীলের। ভয় দেখিয়ে ওকে মানসিকভাবে দুর্বল করতে চাইছে।

পরদিন সকালে আবার স্টাডিতে নিয়ে আসা হলো সলীলকে। কটা রঙের পাতলা চুলওয়ালা এক লোক ওর হাতে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে ড্রাগ ঢুকিয়ে দিল, আর তারপর শুরু হলো প্রশ্নের পালা। ক্লিঙ্গার ও তার স্ত্রী এমিলি বসে বসে মজা দেখছে। ক্লিঙ্গার ওর স্ত্রীকে মুখে তুলে চকলেট খাওয়াচ্ছে। একটু পর পরই মুখ বাড়িয়ে দেয় এমিলি, গোল করে রাখা ঠোঁটের ভিতর একটা করে চকলেট ঢুকিয়ে দেয় ক্লিঙ্গার।

এবারে নিজেকে অনেকটা সংযত করতে পেরেছে সলীল, তাতে মনে মনে একটু হলেও সন্তুষ্ট ও। ড্রাগের কারণে মুখ বন্ধ রাখতে পারছে না ও, প্রচুর কথা বেরিয়ে আসছে আপনাআপনি, তবে সেসব কথার বেশির ভাগই ঠিক নয়, হয় পুরোটাই বানানো, নয়তো সত্যের ওপর ভিত্তি করে এমন সব কথা বলছে, যা একেবারে অর্থহীন, কোনও কাজে আসবে না ক্লিঙ্গারের। কিছুক্ষণ পর নিজের সেলে ফিরে সে-সব নিয়ে ভাবল ও। টের পেল, মাথাটা যদিও ঘোলাটে, চিন্তাশক্তি মোটামুটি ঠিকই আছে।

সেদিন বিকেলেই আরেক দফা দৈহিক নির্যাতন চালাল ওর ওপর জো লুই। এবার ক্লিঙ্গারের স্টাডিতে নয়, মস্তবড় একটা ঘরে, তাতে সারি সারি সিট। একসময় গ্যালারি ছিল, এখন শরীরচর্চা কেন্দ্র বানানো হয়েছে। সিটে বসে মহানন্দে সলীলের ওপর জো লুই-এর নির্যাতন উপভোগ করছে জনা কয়েক দর্শক।

নিখুঁত শৈল্পিকভাবে, যেন রবিশঙ্করের সেতারের টোকায়, ওকে ব্যথা দিয়ে চলেছে জো লুই, সীমাহীন কষ্ট; কোনরকম প্রশ্ন করছে না, না পিটানোর আগে, না পরে। হেনরি ক্লিঙ্গার আর তার সঙ্গীসাথীরা তো আছেই, ওদের সঙ্গে এখন নতুন আরেকজন দর্শক যোগ হয়েছে; চেহারা অনেকটা চীনাদের মত, নাম হুয়ান ক্যাসটিলো, দেখার আগেই ওর নাম শুনেছে সলীল। প্রথমবারের চেয়ে এবার আরও বেশি সময় ধরে চলল নির্যাতন, আর সারাক্ষণ আনন্দে উহ্-আহ্ করতে থাকল এমিলি। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মারো, মারো, মিস্টার জো লুই! আরও ব্যথা দাও! শুয়োরের মত যাতে চেঁচায়!' কিন্তু কী করে যেন ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে সলীলের—মার খেতে খেতে এভাবেই বোধহয় ক্ষমতাটা অর্জন করে নেয় মানুষের দেহ। পাজি মেয়েলোকটার জঘন্য কথাগুলো কানে নিচ্ছে না। চুপচাপ নিজেকে যেন সঁপে দিয়েছে জো লুই-এর হাতে, যদিও এ-ছাড়া আর কিছু করারও নেই। সেইসঙ্গে অন্যমনস্ক থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

সেই রাতে সলীলের সেলে ঢুকল জেনিফার। মোলায়েম স্বরে ওকে সমবেদনা

জানাল। সেলের দরজার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে আর বার বার গালি দিচ্ছে *অত্যাচারী জানোয়ারগুলোকে*, যারা সলীলের ওপর এমন অমানুষিক নির্যাতন করেছে। একটা সময় বাংকে বসে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল, নিজেকে সমর্পণ করতে চাইল সলীলের কাছে। কিন্তু সতর্ক রয়েছে সলীল। মেয়েটার উদ্দেশ্য বুঝে গেছে। ওর মুখ থেকে কথা বের করার নতুন কৌশল এটা ব্ল্যাকমেইলারদের। ওরা ভেবেছে, দৈহিক মিলনের সময় দুর্বল মুহূর্তে এক-আধটা গোপন কথা ফাঁস করে দিতে পারে সলীল। তারপর একইঞ্চি-দুইইঞ্চি করে বেরিয়ে আসবে বাকি সব। মোটকথা, কোনওদিকে ফাঁক রাখছে না লোকগুলো। তবে ওদের ফাঁদে পা দিল না সলীল।

পরদিন সকালে ওকে রুটি আর ঠাণ্ডা সুপ দেয়া হলো। আজকে ওকে ধরে আনার ষষ্ঠ না দশম দিন, জানে না সলীল। খাওয়ার পর ওকে নিয়ে যাওয়া হলো স্টাডিতে। ড্রাগ ইঞ্জেক্ট করে দিল টোপাক। তারপর শুরু হলো জেরা।

কয়েক ঘণ্টা পর একটা সুন্দর বাথরুমে ওকে নিয়ে এল জো লুই। শেভ করার জন্য ইলেকট্রিক রেজর দিল। ভালমত টয়লেট করার সুযোগ দিল। নির্বিকার মুখভঙ্গি করে রইল সলীল। ও যে আরাম পেয়েছে, সেটা বুঝতে দিল না জো লুইকে। তবে শেভ আর সাবান ঘষে গোসলের পর যখন আবার ওকে সেই পুরানো নোংরা পোশাকগুলোই পরতে দেয়া হলো, ভীষণ খারাপ লাগল।

এরপর ডাইনিং রুমে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। ওখানে ক্লিঙ্গার আর ওর সঙ্গীরা খেতে বসেছে। নীরবে খাবার সরবরাহ করে যাচ্ছে দুজন জাপানী পরিচারক। দুজনেরই চওড়া কাঁধ, জাপানীদের গড় উচ্চতার চেয়ে কিছুটা বেশি লম্বা, নিঃশব্দে এমন ভঙ্গিতে হাঁটছে, যেন মাটি স্পর্শ করছে না পা। আর হাতের তালুর কিনারা দেখলেই বোঝা যায় ওরা কারাতে ওস্তাদ।

ডিনারটা হলো সলীলের জন্য এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আলোচনাগুলো খুবই স্থূল, আধিপত্যটা বেশির ভাগই রইল এমিলির দখলে, বিরক্তিকর প্রসঙ্গহীন সব কথাবার্তা, ক্লিঙ্গার আর জো লুই কিছু বললেই তাতে নাক গলানো, এ-সবই চলল। সলীলকে ওরা আলোচনায় অংশ নিতেও দিল না, আবার বাধাও দিল না। যা খেতে দেয়া হলো, তা-ই খেল ও, শুধু মদ বাদে।

ডিনার শেষ হলে শরীরচর্চা কেন্দ্রে চলে এল সবাই, যেন খাবার-পরবর্তী বিনোদন হিসেবে হজমের সুবিধে হবে বলে পিটানো হলো সলীলকে। ভাল আচরণ আর ভাল খাবারের পর হঠাৎ এই ব্যথার প্রচণ্ড ধাক্কাটা হয়ে উঠল সহ্যের অতীত। মানুষকে কী করে কষ্ট দিতে হয়, খুব ভালমত জানে এই লোকগুলো, বিশেষ করে জো লুই। ব্যথা দেয়ার *শিল্পী* বলা যেতে পারে ওকে।

মারার পর আবার ওকে সেলে নিয়ে আসা হলো। খাটিয়ায় পড়ে হাঁপাতে থাকল ও। মানসিক ভারসাম্য সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে। আগামী দিন কোন্‌ভাবে নির্যাতন করা হবে, ভাবছে। হয়তো আবার তুলে দেয়া হবে টোপাকের হাতে। শরীরে ড্রাগ ঢুকিয়ে কথা আদায়ের চেষ্টা চলবে। হয়তো নিয়ে যাওয়া হবে ক্লিঙ্গারের স্টাডিতে। ভদ্র ভাষায় ওকে জেরা করবে ক্লিঙ্গার। কিংবা মেরি এসে ভয়দেখানো গল্প বলবে, অথবা জেনি এসে নগ্ন হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টিকণ্ঠে

সহানুভূতি জানাবে, ভিন্ন পদ্ধতিতে কথা আদায়ের চেষ্টা চালাবে। কিংবা একেবারেই নতুন কোনও কৌশল করবে ওরা। কিছু কিছু ভুল তথ্য যদি ওদের গেলাতে পারে, তা হলে হয়তো যন্ত্রণা কম দেবে।

নিজের দেহের কথা ভাবল সলীল। একটা চোখ প্রায় বুজে গেছে। সারা দেহে অসংখ্য কালশিটে দাগ, একটা কনুই আর এক হাঁটু অনেকখানি ফোলা। সারা গায়েই টনটনে ব্যথা। তবে হাড়টাড় ভাঙেনি এখনও। নিজের কাজ বোঝে জো লুই। দেহের খুব বেশি ক্ষতি করলে কিংবা জখম করলে স্মৃতি ঠিকমত কাজ করতে চাইবে না, তাতে তথ্য মিস্ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, ভুলভাল তথ্যও বেরোতে পারে, সেজন্য মগজটাকে ঠিক রেখে ব্যথা দিয়ে চলেছে। সমস্ত তথ্য আদায় না করে মেরে ফেলবে না ওকে।

অনেক দিন পার হয়ে গেছে। আরও কয়েক দিন সহ্য করতে পারবে ও, নিজেকে বোঝাল সলীল, রানা আসা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে—টিকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু কতদিনে আসবে রানা? কয়েক দিন পর? নাকি কয়েক সপ্তাহ? আসতে অনেক দেরি করে ফেলবে না তো? থামো, গাধা কোথাকার! নেতিবাচক ভাবনা ভেবো না! তা হলে আর এক দিনও টিকতে পারবে না!

প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে একপাশে কাত হয়ে শুলো ও। বার বার নিজেকে বলতে থাকল: কোনমতেই মচকাব না আমি! নিজেকে টিকিয়ে রাখব! যেমন করে পারি। রাখব! রাখব! কোন তথ্য দেব না শয়তানগুলোকে!

ছয়

'আরে, দাও দাও, আমিই ধুই,' বলে জোর করে নিজের এঁটো প্লেটটা সোহানার প্লেটের ওপর রাখল রানা। 'বেশির ভাগ কাজ তো তুমিই করলে। এসে পর্যন্ত সমস্ত কাজ—রান্না বাড়া।'

'সুবোধ গৃহকর্তা হতে চাইছ?' হাসল সোহানা। 'ঠিক আছে, হও। একটা বোতল খুলব নাকি? খাবে আজ? মুড তো ভালই মনে হচ্ছে।'

'খোলো।' বলে এঁটো প্লেট আর চামচগুলো নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল রানা। আবার যখন ফিরে এল ও, দেখল দুটো গ্লাসে ফ্রেঞ্চ রেড ওয়াইন ঢেলেছে সোহানা। কফি টেবিলের পাশে রাখা আর্মচেয়ারে বসে নিজের গ্লাসটা তুলে নিল রানা। সেদিন সকালেই হিথ্রো বিমান বন্দরে নেমে সোহানার সঙ্গে চলে এসেছে ওর পেন্টহাউসে, তারপর সারাটা দিনই প্রায় ঘুমিয়েছে।

গাঢ় নীল শার্ট আর ধূসর স্কার্ট পরেছে সোহানা, কোমরের কাছে সোনালি বেল্ট। আর রানা পরেছে কালো সোয়েটার আর নরম মোটা কাপড়ের সাদা পাজামা।

'ঘুমানো হলো, খাওয়া হলো, এরপর কী, ম্যাডাম?' ভুরু নাচাল রানা।

'ঘুম তো আর সহজে আসবে না।' এক মুহূর্ত ভাবল সোহানা। 'আচ্ছা,

একবার জোয়ালিনের সঙ্গে কথা বললে হতো না?'

'তুমি কী ভেবেছ, বসে আছি? এয়ারপোর্টে নেমেই করেছি, তুমি যখন টয়লেটে।'

'কই, বলনি তো?'

'প্রসঙ্গই ওঠেনি।'

'ভাবছি, কাল গিয়ে দেখা করব।'

'হ্যাঁ, তা-ই করব। আমাকে বলেছে, কাল শহরে আসবে। ভাবছি, ফোন করে বলে দেব, বিকেলে দেখা করব। কী বলো?'

'আমার অসুবিধে নেই।' হাতের গ্লাসটার দিকে তাকাল সোহানা। 'এখানে এলেই বা ক্ষতি কী?'

'কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু...

ফোন বাজল। রিসিভারটা রয়েছে সোহানার হাতের কাছে। তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। ওপাশের কথা শুনে বলল, 'থ্যাংক ইউ, জিম, এখানে চলে আসতে বলো।' রিসিভার রেখে রানার দিকে তাকাল ও। 'রয় কনারি।'

রিসেপশন এরিয়া থেকে একটা প্রাইভেট লিফট পেন্টহাউসে উঠে এল। লিফটের দরজা খুলতেই করিডোরে নেমে এল রয়। সোহানা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, ওকে এগিয়ে নিতে এসেছে। পদবীতে নীচে হলেও সলীল কিংবা রানার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। ছোটখাট একজন অতি সাধারণ চেহারার মানুষ রয়, গাঢ় রঙের সুট পরনে, মাথায় বাউলার হ্যাট, হাতে গোটানো ছাতা, দেখে মনেই হয় না একটা উচ্চ পর্যায়ের গুপ্তচর সংস্থার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। সব সময় কেমন একটা কাঁচুমাচু ভাব। এতে অবশ্য খুবই সুবিধে হয়েছে, কেউ ওকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে না, ভাবে কোনও সদাগরী অফিসের হেডক্লার্ক। অথচ রীতিমত দুর্ধর্ষ একজন স্পাই ও।

ঘরে ঢুকে প্রথমে ছাতাটা টেবিলে রাখল ও। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে রাখল তার পাশে। লিফট থেকে নামার পর একটা কথাও বলেনি, এখন বলল সোহানার দিকে তাকিয়ে, 'কিছু মনে করবেন না, ম্যা'ম। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দিতে পারেন আমাকে? গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

'শিওর,' সোহানা বলল।

রানার ওপর চোখ পড়ল রয়ের। 'এই যে, সার, আপনিও আছেন দেখছি। যাক, ভালই হলো।'

'সলীলের ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক, রয়,' রানা বলল।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা নিল রয়। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিল সোহানাকে। তারপর লম্বা সোফাটার দিকে এগোল। সোহানা একদিকে বসলে, ও আরেকদিকে বসল। তারপর যেন ছুঁড়ে মারল কথাটা, 'আজই সকালে জানলাম, জন ঘুষ খেয়েছিল।'

'সলীলের পিজোর ড্রাইভার?' ভুরু কোঁচকাল সোহানা।

'হ্যাঁ।' গ্লাসে চুমুক দিল রয়। নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। 'টাকাটা রেখেছে লণ্ডনের একটা ব্যাংকে। হঠাৎ করেই দশ হাজার পাউণ্ড জমা পড়েছে। বেতন যা পায়, তাতে এত টাকা একসঙ্গে কোনদিনই জমা দিতে পারার কথা নয়

ওর। টাকাটা পেল কোথায়? খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, ব্যাংকো ম্যাকাও ডা কমার্শিয়াল থেকে রয়ের অ্যাকাউন্টে জমা দেয়া হয়েছে, আর দিয়েছে ব্যাংকটার মালিক...'

'ফু ক্যানটাকি,' রানা বলল।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থেকে রয় বলল, 'ঘুষটা কেন দিল রয়কে, সেটা আন্দাজ করতে পারছি না, সার। মিস্টার সেনকে খুন করার জন্যে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ। সেটা ভাবা যেত, যদি জন বেঁচে থাকত। কিন্তু সে-ও মারা গেছে। আমার ধারণা, ওর অ্যাকাউন্টে প্রথমে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দেয়া হয়েছে, সলীলকে কারও হাতে তুলে দেয়ার জন্যে।'

এক মুহূর্ত থেমে হাতের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল রয়, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক এই সন্দেহটাই আসছে আমার মনে। মিস্টার সেন মারা গেছেন, এটা আমিও মানতে রাজি নই, সার। কারণ, এখনও লাশটা পাওয়া যায়নি।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল রানা। 'বোঝাই যাচ্ছে, গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট স্রেফ ধাপ্পাবাজি, সবার চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে।'

শ্রাগ করল রয়। 'ঠিক। কেউ ওঁকে তুলে নিয়ে গেছে তথ্য আদায়ের জন্যে—সেই তথ্য কে, কোন্ কাজে লাগাবে, সেটা অবশ্য এখনও জানি না। সব কথা জেনে নেয়ার পর নিশ্চয়ই ওঁকে মেরে ফেলা হবে।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে রয়। সোহানাও তাকিয়ে আছে। কোলের ওপর আলতো করে ফেলে রেখেছে ও হাত দুটো। চোখে শূন্য দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ধীরে ধীরে বলল সোহানা, 'খোদা! একটা কথা মনে করার চেষ্টা করছি আমি কদিন ধরে!'

'কোন্ কথাটা, ম্যা'ম?' জিজ্ঞেস করল রয়।

উঠে দাঁড়াল সোহানা। পায়চারি শুরু করল। চোখ আধবোজা। হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘুরে তাকাল রানার দিকে। 'ডিন মার্টিনের কথাটা বলো ওকে, রানা। তুমি বলতে থাকো, আর আমি তোমার মুখে শুনতে শুনতে আমার মন খুঁতখুঁত করার কারণটা বোঝার চেষ্টা করি।'

নদীর ওপর পাহাড়ের তাকে আটকে পড়া লোকটাকে কীভাবে উদ্ধার করেছে সোহানা, কীভাবে নির্জন পথে তিনজন লোকের সঙ্গে মারামারি করেছে, এ-সব রয়কে বলল রানা।

রয় বলল, 'তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন, ওই লোকটা কিছু দেখেছিল?'

পায়চারি থামিয়ে ফিরে তাকাল সোহানা। 'মাথায় বাড়ি খেয়েছিল ও, বার বার জ্ঞান হারাচ্ছিল, তাই অনেক কিছুই গুলিয়ে ফেলেছিল। আমি ওকে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করেছি। আমি বলেছিলাম: *কাল গাড়িটা যখন রাস্তার কিনারা দিয়ে নদীতে পড়ে যায়, নিশ্চয় আপনি তখন ছিলেন এখানে। একটা ধূসর পিজো। ঘটনাটা ঘটতে দেখেছেন?* ও কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিয়েছে: *কিনারা দিয়ে নদীতে পড়ে গেছে? নাহ্, কই, দেখিনি তো।*'

ভ্রূকুটি করল রানা। 'তারমানে গণ্ডগোলটা এখানেই, আর এটাই তোমার মন খুঁতখুঁত করার কারণ।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'হ্যাঁ। গাড়িটা দেখেছে ও, কিন্তু নদীতে পড়তে দেখেনি।'

'গাড়িটা দেখেছে, কিন্তু পড়তে দেখেনি,' রানা বলল, 'তারমানে, ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ, ওই নদীর ওপারের বাঁকটাতে।' রয়ের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল ও। 'কিছু বুঝলেন?'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘামে ভেজা ভুরু মুছল রয়। 'হয়তো আগে থেকেই জনের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছিল কিডন্যাপাররা। হয়তো নদীর অন্যপাড়ে পাহাড়ের তাকের ওপর পড়ে থাকা লোকটাকে...কী যেন নাম লোকটার?' সোহানার দিকে তাকাল।

'ডিন মার্টিন।'

'হ্যাঁ, ডিন মার্টিনকেও দেখে ফেলেছে ওরা। আর সেজন্যেই তিন গুণ্ডা গিয়ে হাজির হয়েছিল,' সোহানার দিকে তাকাল রয়, 'আপনার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে। ম্যা'ম, ডিনকে দরকার এখন আমাদের, তা-ই না? মূল্যবান তথ্য রয়েছে ওর মগজে।'

ঠোঁট কামড়াল সোহানা। 'তাই তো মনে হচ্ছে। এতদিনে নিশ্চয়ই ডাক্তার রেনোয়া সিভেনিজের ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে ও। বেরিয়ে কোথায় গেছে, কে জানে! ইস্, আমি একটা গাধা! ওকে এভাবে ফেলে রেখে আসা মোটেও উচিত হয়নি আমার।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ও সুস্থ হওয়ার পর আরও প্রশ্ন করা উচিত ছিল। যা-ই হোক, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন ওকে খুঁজে বের করা দরকার।' সামনে ঝুঁকল রানা। 'শোনেন, রয়, আমরা ধরে নেব, সলীল বেঁচেই আছে।'

গ্লাসের ব্র্যাণ্ডি শেষ করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রয়। 'কিন্তু এ-মুহূর্তে কোথায় আছেন, জানি না। হয়তো ইটালিতে কোনও মাফিয়া ডনের খামারবাড়িতে, কিংবা পাকিস্তান অথবা আফগানিস্তানের জঙ্গি অথবা সন্ত্রাসীদের আস্তানায়। তথ্য সংগ্রহের জন্যে হয়তো অমানুষিক নির্যাতন করা হচ্ছে।'

রানা বলল, 'ঠিক বলেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে বের করে আনতে হবে আমাদের।' মুখের ভঙ্গি শান্ত, কিন্তু কণ্ঠের উদ্বেগ চাপা দিতে পারল না ও।

'কিন্তু কোথায় খুঁজব আমরা?' রয়ের প্রশ্ন। 'ইটালি, পাকিস্তান, না আফগানিস্তান?'

সোহানার দিকে তাকাল রানা। আবার রয়ের দিকে ফিরল। 'আমার বিশ্বাস, ফ্রান্সেই আছে। আমেরিকান এক ব্ল্যাকমেইলারের হাতে বন্দি।'

'হুঁ,' বলল সোহানা। 'কোনও এক দুর্গে।'

'আমাদের প্রথম কাজ এখন ডিনকে খুঁজে বের করা, বলল রয়। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওকে প্রশ্ন করলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, ডাক্তার সিভেনিজকে তো ফোন করতে পারি,' সোহানা বলল। 'ডিন হয়তো ঠিকানা রেখে গেছে তাঁর কাছে।'

'করে দেখতে পারো,' রানা বলল। 'তবে লাভ হবে বলে মনে হয় না। ক্লিনিকে ডিনের ঠিকানা রেখে আসার কোন কারণ নেই।'

'তা হলে উপায়?' আবার ঠোঁট কামড়াল সোহানা। বসে পড়ল একটা সোফায়।

চিন্তিত ভঙ্গিতে পায়চারি করছে রানা। 'ক্লিনিকের ওপর যদি নজর রেখে থাকে কিডন্যাপাররা, তা হলে ও বেরোনো মাত্র খপ্ করে ধরবে। তারপর স্রেফ ওর মুখটা বন্ধ করে দেবে—পুলিশ কিংবা অন্য কারও হাতে পড়ার আগেই...' ফোনের শব্দে ফিরে তাকাল ও। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো...হ্যাঁ, জিম, বলো...কে এসেছে?' দুই ভুরু উঁচু হয়ে গেছে ওর। বিস্মিত দৃষ্টি চট করে একবার ঘুরে গেল সোহানার মুখের ওপর দিয়ে। 'আমি আসব?' থেমে এক মুহূর্ত ওপাশের কথা শুনল ও। 'ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। পাঠাও।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে চুলে আঙুল চালাল ও। 'কাকতালীয় ঘটনা আর কাকে বলে! সোহানা, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে। রিসিপশনে বসে আছে। জিম বলছে, লোকটা অসুস্থ। নাম ডিন মার্টিন।'

হাঁ করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রয়, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর হাসি ফুটল মুখে।

দুই মিনিট পর পিছলে খুলে গেল লিফটের দরজা। সতর্ক ভঙ্গিতে ফয়ারে বেরিয়ে এল ডিন। মস্ত সিটিং রুমের দিকে তাকাল। সোহানা ছাড়াও আরও দুজনকে দেখল ওখানে। মোটা সুতির ট্রাউজার পরেছে ডিন, গায়ে ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট। এক হাতে একটা ট্র্যাভেলিং কেস। মুখটা ফ্যাকাসে। উজ্জ্বল চকচকে চোখজোড়া এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন কোনও এক জায়গায় দৃষ্টি স্থির করতে অসুবিধে হচ্ছে ওর। কেসটা নামিয়ে রেখে সোজা হতে গিয়ে সামান্য টলে উঠল ও, তারপর এগিয়ে এল সামনে।

হাসল সোহানা। 'হ্যালো, ডিন।' বলে ওর হাতটা ধরল।

'আহ্, দারুণ জায়গা তো! আর আপনি বলেছিলেন কেনসিংটনে একটা হ্যাটের দোকান চালান। হ্যাটের দোকানের মালিক এত শান-শওকতের সঙ্গে থাকে কীভাবে?'

'এসো। বসো, ডিন।' হাত ধরে ওকে নিয়ে এসে লম্বা সোফাটায় বসিয়ে দিল। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডিন, 'এঁরা কারা?'

'আমার বন্ধু,' সোহানা জবাব দিল। 'কফি খাবে?'

'বাহ্! কফিও বানাতে পারেন? আপনি পারেন না কী?' হেসে কাঁপা কাঁপা একটা আঙুল তুলে সোহানার পায়ের দিকে দেখাল। 'প্রথমে মনে করেছিলাম আপনি ডাক্তার। আর তারপর কারাতের গ্র্যাণ্ড-মাস্টারনি। তারপর বললেন হ্যাটের দোকান করেন। তা হলে এ-সব কী? ও, বুঝেছি। সিক্রেট এজেন্ট, তাই না?' রসিকতার ঢঙে হেসে উঠল ও।

সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মাথার কী অবস্থা?'

'মাথা? ভালই তো ছিল। কিন্তু এখন সামান্য ঘুরছে। ও ঠিক হয়ে যাবে। আর এই যে দেখুন, এই হাতটা।' বাঁ হাত তুলে নাড়াল ডিন। 'একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। সাংঘাতিক ডাক্তার ডক্টর সিভেনিজ। এত সুন্দর চিকিৎসা করেন। ক্লিনিকটাও খুব আরামের, কোনও টাকাপয়সা নিলেন না। বিনে পয়সায় এত দামি

চিকিৎসা কেন করছে, জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাব দিল : আমি জনসেবা করি। বিশ্বাস করিনি। বুঝেছিলাম, সমস্ত খরচ সোহানা চৌধুরি নামের ওই মেয়েটা দিয়েছে। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কেন দিল? নিজেই জবাব বানিয়ে নিলাম *তোমাকে ওর ভাল লেগে গেছে, মিস্টার ডিন মার্টিন।'*

ডিনের পাশে বসল সোহানা। 'এখানে কোথায় উঠেছ?'

'কোথায় উঠেছি?' চোখে পানি জমায় ঝাপসা দেখছে ডিন। 'উঠিনি এখনও। এলামই তো আজ সকালে।' চোখ টিপল ও। টিপতে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেল মুখের একটা পাশ, মনে হলো ব্যথা পাচ্ছে। 'তবে বুড়ো ডিনকে বোকা ভাবার কোনও কারণ নেই। ফ্লিট স্ট্রিটে এক বন্ধু আছে আমার, বুঝলেন? খবরের কাগজের লোক। ক্রাইম বিভাগের দুঁদে রিপোর্টার। অনেককে চেনে, অনেকের সঙ্গে খাতির। ওর সঙ্গে দেখা করলাম। একসঙ্গে বসে মদ খেলাম, প্রচুর, প্রচুর।' চটচটে মুখ থেকে ঘাম মুছল ও। 'আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম *সোহানা চৌধুরি নামে কাউকে চেনো? ভীষণ সুন্দরী। আর রহস্যময় একটা চরিত্র। কারাতে মারের ওস্তাদ।* ও প্রায় চমকে উঠে বলল *ক্রাইস্ট, ওর সঙ্গে জড়ালে কী করে? হাজার হাজার গুজব শোনা যায় ওর নামে।* তারপর প্রশ্ন করে করে ওর কাছ থেকে অনেক কথাই জেনে নিলাম। এই বাড়ির ঠিকানাটাও সংগ্রহ করে দিল ও।'

থেমে গেল ডিন। দম ফুরিয়ে এসেছে। সবজে হয়ে উঠল মুখটা। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ভালমত সোজা হওয়ার আগেই পড়ে গেল কাত হয়ে, সোহানার গায়ের ওপর। বিড়বিড় করল, 'ওহ্ গড, আবার অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি।'

পনেরো মিনিট পর গরম পানির শাওয়ারের নীচ থেকে ওকে টেনে সরাল রানা। ওর হাতে বন্দি অবস্থায় এতক্ষণ দুর্বল ভঙ্গিতে ধস্তাধস্তি ও গালাগাল করছিল ডিন। লম্বা একটা ম্যাসাজ টেবিলে শুইয়ে তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে চামড়ায় ঘষা দিতে লাগল রানা।

তিরিশ মিনিট পর পেন্টহাউসের গেস্টরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, সোহানার কাছে। জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে অন্ধকার পার্কের দিকে। রয় কনারি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে। ও জানে, ডিনকে যখন পাওয়া গেছে, বস্‌কে উদ্ধারের ব্যবস্থা রানা আর সোহানাই করবে।

রানা বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

চুপচাপ রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। রানা কী বলে শোনার অপেক্ষা করছে।

'আমাদের হাতে এখন এটাই জরুরি কাজ,' রানা বলল। 'কাল জোয়ালিন হেইফোর্ডের সঙ্গে দেখা করব কি না ভাবছি।'

'কথা দিয়েছ যখন, করা তো উচিত। তা ছাড়া দুটো ব্যাপারে কোথায় যেন একটা লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না? তবে সন্দীলের ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে আর্জেন্ট। সকালে ডিনের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে কী ভাবে এগোনো দরকার।'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা। 'ওর রুমের ইন্টারকম থেকে আমাকে একটা রিং দিয়ে ক্রেইড্‌লটা নামিয়ে রেখো। আমার ঘরেরটাও আমি তুলে নামিয়ে রাখব।

রাতে জেগে উঠে বা ঘুমের মধ্যে যদি প্রলাপ বকতে আরম্ভ করে শুনতে পারব। ওর প্রলাপ থেকে মনে হয় মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।'

'রাখব। সলীলের ব্যাপারে আর কিছু ভাবলে?'

'নাহ্, তবে আশা ছাড়তে রাজি নই।'

'আমিও না। ধরেই মেরে ফেলবে বলে মনে হচ্ছে না আমার। ধীরে ধীরে শেষ করবে। যতটা সম্ভব বেশি তথ্য আদায়ের চেষ্টা করবে।'

'যাই করুক, শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি ওকে খুঁজে বের করা সেজন্যেই দরকার।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

রানা হাত বাড়াতেই চট্ করে সরে গেল একটু। 'এই, না! আমি শুতে যাচ্ছি—খুব ক্লান্তি লাগছে, অনেস্ট। গুডনাইট, রানা।'

'গুডনাইট।'

জড়িয়ে ধরে ওর গালে চুমো দিল রানা। নিজের শোবার ঘরের দিকে চলে গেল সোহানা। ওর গমনপথের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা। জানে, যতই ঘুমের ভান করুক, আজ রাতেও ওর ঘরে না এসে থাকতে পারবে না সোহানা।

মিল্‌স্ গ্রেনেডের লিভারটা খুলে উড়ে গিয়ে পড়ল। আনারস-আকৃতির সাক্ষাৎ মৃত্যুটা আছড়ে পড়ল বিমানের ডেকে। আধা-বেহুঁশ পাকিস্তানি জঙ্গির পাশে উপুড় হয়ে পড়ল ডিন। মাথা তুলে কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল লোকটা, দুই সারি আসনের মাঝখানের সরুপথে ভয়ানক জিনিসটাকে গড়াগড়ি খেতে দেখে একটা আতঙ্কিত নীরব চিৎকার যেন স্থির হয়ে গেল ওর হাঁ করা মুখে।

দীর্ঘ কয়েকটা সেকেণ্ড আশা-নিরাশার দোলায় দুলল ডিনের মন। তাকিয়ে আছে কালো কুৎসিত বস্তুটার দিকে। পুরানো আমলের মিলস গ্রিনেড। বহু বছর আগে হয়তো বানানো হয়েছিল। হয়তো স্প্রিংটা দুর্বল হয়ে গেছে, হয়তো স্ট্রাইকারটা আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা পাঁচ সেকেণ্ডের সেফটি ফিউজটাকে ইগনাইট করতে ব্যর্থ হয়েছে পারকাশন ক্যাপ, কিংবা...কিংবা আরও অনেক কারণেই তো ওটা না-ও ফাটতে পারে।

সিটের সারির বাঁ প্রান্তে বসা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া লোকটা ঝাঁপ দিল সামনে। ইচ্ছাকৃতভাবেই যেন কোনও বুদ্ধিমান প্রাণীর মত গড়িয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে সরে গেল কালো বস্তুটা। চলে গেল লোকটার বাচ্চা ও স্ত্রীর সিটের নীচে। এবং তারপরই কানে এল ভয়ানক বিস্ফোরণের শব্দ।

কিছুই ব্যর্থ হয়নি। একমাত্র ডিন ছাড়া—সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ও। জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে ওর।

ইণ্টারকমে ডিনের গোঙানি আর বিড়বিড়ানি শুনতে পেল রানা। পিছলে বিছানা থেকে নেমে ছুটল ও। বারান্দায় দেখা হয়ে গেল সোহানার সঙ্গে। সে-ও জেগে ছিল, ডিনের গোঙানি শুনেছে।

'দুঃস্বপ্ন দেখছে বোধহয়,' রানা বলল। 'যে-রকম জোরে গোঙাচ্ছে, শোনার জন্যে ইন্টারকমের প্রয়োজন পড়ে না।'

'তুমি সামলাতে পারবে না,' সোহানা বলল। 'তুমি তোমার ঘরে চলে যাও। আমি দেখছি কী করা যায়।'

'যাব?' দ্বিধা করছে রানা।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'মনে হয় কথা বের করার এটাই সুযোগ। তোমার কাছে মুখ খুলবে না।' বলে ঘুরে গেল আবার ডিনের ঘরের দরজার দিকে। আধখোলা পাল্লাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঘুমের মধ্যে মোচড় খাচ্ছে ডিনের দেহটা, যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায়।

পাশে বসল সোহানা। আস্তে করে ডিনের কাঁধে ঠেলা দিয়ে বলল, 'কী হয়েছে, ডিন? দুঃস্বপ্ন দেখছ?'

খুলে গেল ডিনের চোখের পাতা। একটা ঝাঁকি খেয়ে বিছানায় উঠে বসল।

'ওহ্ গড!' দুই হাতে সোহানার একটা হাত আঁকড়ে ধরল ও। হাঁপাচ্ছে। এখনও চোখে ঘুমের রেশ।

আলতোভাবে ওর পিঠ চাপড়ে দিতে দিতে সোহানা বলল, 'তুমি বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখছিলে।'

আচমকা হাত দুটো আবার সরিয়ে আনল ডিন। ঘরের চারপাশে তাকাল। ধীরে ধীরে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল চেহারা। মদের ঘোর কেটে যাচ্ছে যেন। অবশেষে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিরক্তকণ্ঠে বলল, 'নাটক করে ফেলেছিলাম নাকি?'

'দুঃস্বপ্ন সবাই দেখে,' মোলায়েম স্বরে বলল সোহানা।

'দুঃস্বপ্নটা যদি বাস্তব হয়?'

'আগে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার কথা বলছ? ঘুমের মধ্যে দেখেছ আবার?'

'কোন্ ঘটনাটা? প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা দানব আমাকে শাওয়ারের নীচে চেপে ধরে রেখেছিল অনন্তকাল ধরে... সেটা কি বাস্তব না দুঃস্বপ্ন?'

'তোমাকে আসলে গোসল করানো হচ্ছিল। ওভাবে না ভেজালে ঘুমাতে পারতে না।'

এক মুহূর্ত ভাবল ডিন। 'ওই লোকটা আপনার বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'ওর কাছ থেকে ভয়ের কিছু নেই?'

'না। নাও, শুয়ে পড়ো এখন। কম্বলটা গা থেকে ফেলো না। আবার তো কাঁপুনি শুরু হয়েছে। সিগারেট খাবে?'

'প্লিজ!'

বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার থেকে সিগারেটের বাক্স বের করল সোহানা। নিজেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ডিনের ঠোঁটে লাগিয়ে দিল। একটা অ্যাশট্রে রাখল বিছানার ওপর।

ক্লান্তকণ্ঠে ডিন বলল, 'কেন জানি না, যখনই যা করতে যাই, সব ভুল হয়ে যায় আমার। আপনাকে খুঁজে বের করে আমাকে বাঁচানোর জন্যে একটা ধন্যবাদ

দিতে এসেছিলাম। একগোছা ফুল আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কী করলাম? মদ খেয়ে পাঁড় মাতাল হয়ে ঘরে ঢুকলাম... আসার পর থেকে কী কী অকাজ করেছি. বলুন তো?'

'তেমন কিছু না, বেশি মদ খেলে যা হয়। এ ছাড়া স্বাভাবিকই ছিলে।'

'তারমানে মাতলামি করেছি। যাক, সত্যি কথাটা বলার জন্যে ধন্যবাদ।'

'তুমি জিজ্ঞেস করাতেই বলেছি।' হাসল সোহানা। 'তবে *বেইবি* বলে ডাকনি আর।'

'যাক, শুনে ভাল লাগছে।' হাসিটা ফিরিয়ে দিল ডিন। এই প্রথম ওর স্বাভাবিক হাসি দেখল সোহানা, তাতে ব্যঙ্গ কিংবা তিক্ততা নেই। 'এখন বলি, আমার জন্যে যা করেছেন আপনি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই আমার।'

'বোঝা যাচ্ছে, মাতলামি কেটে গেছে তোমার। খাবে কিছু? রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু আনিয়ে দেব?'

'নাহ্, লাগবে না।' দ্বিধা করল ডিন। 'তবে রান্নাঘরটা দেখিয়ে দিলে নিজেই কফি বানিয়ে নিতে পারতাম।'

'রাত দুটোয় কফি? ঘুম চলে যাবে তো।'

'সেটাই তো চাই।' পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করল ডিন। কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত রাখতে পারল না। সোহানা দেখল, ওর সিগারেট ধরা হাতটা কাঁপছে।

ও বলল, 'এ রকম কি প্রায়ই ঘটে? এই দুঃস্বপ্ন?'

'প্রায়ই।' সিগারেট টানতেও কষ্ট হচ্ছে ডিনের।

'আমাকে বললে মনের বোঝা হালকা হবে?'

'মনে হয় হবে। পত্রিকায় পড়ে থাকতে পারেন, আমিরাত এয়ারলাইনসের একটা ট্রাইডেন্ট প্লেন গত সেপ্টেম্বরে হাইজ্যাক করা হয়েছিল, আমি ছিলাম ওটার সেকেণ্ড অফিসার।'

'কিছুদিন ধরে প্রচুর হাইজ্যাকিং হচ্ছে, তা ছাড়া গত সেপ্টেম্বরে দুই হপ্তা খবরের কাগজ পড়া বা টেলিভিশন দেখারও সুযোগ পাইনি তেমন।'

শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল ডিন। 'দুজন আত্মঘাতী জঙ্গি। সৌদি আরব থেকে প্লেনে ওঠে ওরা। রোমে ল্যাণ্ড করতে আমাদের বাধ্য করে। মাটিতে নামতেই ওরা ভারতের জেলখানায় আটকানো ওদের দোসর তিন জঙ্গির মুক্তি দাবি করে। নইলে সমস্ত যাত্রীসহ পুরো প্লেনটাই বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। পুরো আঠারো ঘণ্টা ধরে চলে বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা চালাচালি।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে নেভানোর চেষ্টা করল ও। কিন্তু হাত এতই কাঁপছে, পারল না। শেষে সোহানা সিগারেটটা নিয়ে নিভিয়ে দিল।

'তিনজন লোককে খুন করেছি আমি।' চোখ মুদল ডিন। 'ওদের একজন, শিশু।'

'তার মানে?'

সোহানার একটা হাত আঁকড়ে ধরল ডিন। সোহানা বুঝল, নিজের অজান্তেই কাজটা করছে ও। বলল, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে ভয়ানক স্নায়ুর চাপ

সইতে পারছিলাম না। বারো ঘণ্টা...চোদ্দ ঘণ্টা...ষোলো ঘণ্টা...চলছিল তো চলছিলই...ওহ্, ক্রাইস্ট, ওই শয়তানগুলোর ওপর কী যে রাগ হচ্ছিল! ভয় চলে গেল একটা সময়, খেপামি তৈরি হলো। মনে মনে গালি দিতে লাগলাম। শয়তানের দল! তোদের এতবড় সাহস, এতগুলো যাত্রীকে... মহিলা... শিশুদেরকে হুমকি দিস, এমন কষ্টের মধ্যে রেখেছিস!'

এক হাতে গাল ডলল ও। 'আসলে...আসলে আপনাকে বোঝাতে পারব না পরিস্থিতিটা... ভয়ানক স্নায়ুর চাপ! ভয়াবহ!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল ডিন, 'নিয়মমাফিক যা করা উচিত তাই করে যাচ্ছিলাম আমরা, মানে প্লেনের লোকেরা। যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলাম। মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। এর মানে কি অনন্তকাল ধরে চুপ করে বসে থাকতে হবে? আর থাকার পর যে বাঁচানো যাবে সবাইকে তার নিশ্চয়তা কী? ওই শয়তানগুলোর ওপর নির্ভর করে চুপচাপ হাত গুটিয়ে থেকে মনে মনে প্রার্থনা করা যে ওরা আমাদেরকে ছেড়ে দেবে? নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তারপর, একটা সময় এল, যখন জঙ্গিদের একজন বাইরে চলে গেল কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ কারও সঙ্গে দেনদরবার করার জন্যে। অন্যজন হাতে গ্রেনেড নিয়ে সিটের সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। একটা মিল্‌স্ বম্ব। পিনটা খোলেনি।' সোহানার দিকে তাকাল ডিন, ওর চোখে আগুন। 'শুধু ওই পিনটা টেনে খুলে দিলেই হলো, ওই একটা পিনের ওপর নির্ভর করছে এতগুলো মানুষের জীবন, বুঝতে পারছেন অবস্থাটা?'

'পারছি।'

'যাত্রীদের খাবার সময় হলো। ট্রে হাতে একজন হোস্টেস রান্নাঘরের দিকে এগোল। আর তখনই দেখতে পেলাম সুযোগটা। জঙ্গির কাঁধে ঝোলানো রয়েছে একটা এস.এম.জি। গ্রেনেডটা আলতোভাবে ধরে রেখেছে হাতে। হোস্টেসকে থামিয়ে ওর হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে আমিই রওনা হলাম রান্নাঘরে। রান্নাঘরের তাকে একটা খাটো হাতলওয়ালা হাতুড়ি পাওয়া গেল। কাজটা করব কি না ভেবে ঘামতে শুরু করলাম। খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক আমাদের ক্যাপ্টেন, আমার অস্থিরতা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর কথা ভাবলাম। হাতুড়িটা হাতে নিয়ে বার বার বিড়বিড় করতে লাগলাম *বোকামি কোরো না, ডিন! যদি কাজটা ঠিকমত করতে না পারো, উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে যায়, সর্বনাশ হবে!* কিন্তু এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করতেও ইচ্ছে করছিল না। ট্রে-র নীচে হাতুড়িটা লুকিয়ে নিয়ে খাবার সহ বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর থেকে। জঙ্গিটার কাছে গিয়ে হাত থেকে ট্রে ফেলে হাতুড়ি ঘুরিয়ে *হেঁইয়ো* বলে বাড়ি মারলাম ওর কব্জি সই করে।'

ডিনের চোখে শূন্য দৃষ্টি। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এলেও কথাগুলো জড়ানো আর দ্রুততর হচ্ছে। 'গ্রেনেডটা ওর হাত থেকে ফেলে দিতে পারলেই আর কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু মিস করলাম। মানে, বাড়িটা লাগল ঠিকই, কিন্তু ততটা জোরে নয়। গ্রেনেডটা ধরে রেখে লাফিয়ে সরে গেল ও। টান দিয়ে খুলে ফেলল পিনটা। আমিও ছাড়লাম না। ওর মাথায় বাড়ি মারলাম। ও পড়ে গেল। আমি পড়লাম ওর ওপর। গ্রেনেডটা পড়ার শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি গড়িয়ে চলে

যাচ্ছে ওটা সিটের নীচে। বেচারা সেই লোকটাও গ্রেনেড দেখে বউ-বাচ্চাকে বাঁচাতে ওটার ওপর ঝাঁপ দিল। ক্রাইস্ট, সাহস আছে বলতে হবে ওর! তারপর শুরু হলো নরক গুলজার, বোমা ফাটার শব্দ, হই-হই, চিৎকার...'

কথা বলতে গিয়ে ভীষণভাবে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে এখন ডিনের। এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাচ্ছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ওর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখে অপেক্ষা করছে সোহানা। কিন্তু ডিনের স্বাভাবিক হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড অসহায় দেখাচ্ছে ওকে এই মুহূর্তে।

অবশেষে আবার কথা বলল ও, 'একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা। বিস্ফোরণে প্লেনের এক পাশের দেয়াল উড়ে গেল। বেশির ভাগ ধাক্কাটাই গেল দেয়ালের ওপর দিয়ে। যে লোকটা ঝাঁপ দিয়েছিল, তার কিছু হলো না, ওর স্ত্রীও বেঁচে গেল, কিন্তু মারা গেল ওই বাচ্চা মেয়েটা, আর ওর পিছনের দুজন লোক। বাইরে বেরিয়েছিল যে জঙ্গি, কারও কোন ক্ষতি করার আগেই ওকে আটকে ফেলা হলো, ভিতরের লোকটাকে মাথায় বাড়ি মেরে কাবু করে ফেলেছি, ও আর কিছু করতে পারল না। তারপর তদন্ত কমিটি গঠিত হলো। হঠকারিতার অভিযোগ আনা হলো আমার বিরুদ্ধে, সে অভিযোগটা ভিত্তিহীন ছিল না।'

তারপর শুয়ে শুয়ে এমনভাবে হাঁপাতে থাকল ডিন, যেন বহু মাইল পথ দৌড়ে এসেছে। মুখে নেমে এল দুঃখভরা স্মৃতির কালো ছায়া। 'এখন আপনি হয়তো বলবেন, এতে আমার কোনও দোষ ছিল না, নিছকই দুর্ভাগ্য—আমার সব বন্ধুই এ কথা বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছে। অন্তত আমার মুখের ওপর সত্যি কথাটা বলার সাহস দেখায়নি।'

শান্তকণ্ঠে সোহানা বলল, 'ওরা কী বলল, কিংবা আমি কী ভাবলাম, তাতে কিছু যায়-আসে না। এটা তোমার সমস্যা, ডিন, তোমাকেই সামলাতে হবে। কেউ তোমার জন্যে কিছু করতে পারবে না।'

অবাক হলো ডিন। 'জেসাস! আপনি সত্যি সত্যিই কঠিন চরিত্রের মানুষ। তবু, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কী ভাবছেন।'

'আমি কিছুই ভাবছি না। যদি তুমি সফল হতে, হিরো হয়ে যেতে। পত্রিকায় বড় করে হেডিং ছাপা হতো *দুঃসাহসী পাইলটের দুর্দান্ত কৃতিত্ব।* অনেকেই তখন ভাবত না, *দুঃসাহসী* হতে গিয়ে কতটা ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। ব্যাপারটা উল্টোও হয়ে যেতে পারত, এখন যেমন হয়েছে।'

'এখন তো খারাপই হয়েছে।'

'খুব খারাপ। তবে, আমার ধারণা, বাধা দেয়া দরকার। নইলে জিম্মি করে ওরা পার পেয়ে যেতে থাকলে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়বে এ ধরনের ঘটনা।'

'কিন্তু বাধা দিতে গিয়ে একটা বাচ্চা আর দুজন মানুষকে যে খুন করলাম।'

'প্রতিদিনই কোনও না কোনওভাবে মারা যাচ্ছে মানুষ, দুর্ঘটনায়, গুলি খেয়ে, বোমা বিস্ফোরণে, আরও নানানভাবে। সবচেয়ে বেশি মরছে না-খেতে পেয়ে।'

'আর, আপনি বলতে চান, তার সঙ্গে আরও একজন বা দুজন যুক্ত হলে কোন ক্ষতি নেই? দারুণ, দারুণ!'

'দু'একজন মারা গিয়ে যদি একশো বা দুশো লোককে বাঁচিয়ে দেয়, সেটাকে

ভালই বলতে হবে। মহামারীটাও বন্ধ হবে।'

চুপচাপ দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে থাকল ডিন ঝাড়া দুই মিনিট। তারপর ফিরল সোহানার দিকে। দৃষ্টিতে মুগ্ধতা।

'নাহ্, আপনি সত্যিই বুদ্ধিমতী, মিস সোহানা চৌধুরি। এভাবে কিন্তু ভাবিনি আমি।' হাসি ফিরে এল ডিনের। লম্বা দম নিয়ে শব্দ করে ছাড়ল। 'আপনি আমাকে বাঁচালেন। এমনিতে বেশির ভাগ সময় ভালই থাকি আমি, দুঃস্বপ্নটা না দেখলে। তখন ঘুমটাকে একটা আতঙ্ক মনে হয়। কিন্তু সারাক্ষণ তো আর জেগে কাটাতে পারে না মানুষ।'

'এখন তো আর ঘুমাতে নিশ্চয় কোন অসুবিধে নেই?'

'না,' আবার হাসল ডিন। 'কফিও খেতে চাই না আর। আমার মনের বোঝা অনেকখানি হালকা করে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ।'

ভোর রাতের দিকে বিছানায় এসে উঠল সোহানা। রানার গায়ের চাদরটা একটু তুলে গুটিসুটি মেরে আলগোছে ওটার নীচে ঢোকার তাল করছে।

'অ্যাই, কী হচ্ছে!' জানতে চাইল রানা। 'তুমি না ক্লান্ত?'

'সেজন্যেই তো এলাম,' খিলখিল করে হাসল সোহানা। 'তোমার গায়ের বদখত সুবাস নাকে না গেলে চট্ করে ঘুম আসে না আমার... চাপা মারছি না, সত্যি!'

'শুধু সুবাসেই চলবে, নাকি আরও কিছু? কেবল ওতে সন্তুষ্ট হতে তো দেখিনি তোমাকে আজ পর্যন্ত কোনও–'

রানার মুখে হাত চাপ দিল সোহানা।

'চুপ, বদমাইশ! মারব এক বক্সিং। কাজ ফেলে খালি অসভ্য কথা!' বলেই এক গড়ান দিয়ে উঠে এল রানার বুকে।

হাসতে চেষ্টা করেও পারল না রানা। ওর ঠোঁটে চেপে বসেছে সোহানার ঠোঁট।

সাত

'ওই তাকের ওপর পড়ে ছিলে তুমি, কিছুক্ষণ পর পর জ্ঞান হারাচ্ছিলে, জ্ঞান ফিরলে চোখ পড়ছিল নদীর ওপারের রাস্তাটার ওপর, গাড়ি দেখলেই হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিলে ওদের চোখে পড়ার আশায়। তারপর?' সোহানা জিজ্ঞেস করল।

পরদিন রান্নাঘরে খাবার টেবিলে বসে কথা বলছে সোহানা, ডিন ও রানা।

'খুব একটা আশা করতে পারছিলাম না আমি। ওইটুকু সামান্য জায়গা পেরোতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগে না কোনও গাড়ির; তা ছাড়া বাঁক যখন, রাস্তার দিকেই মনোযোগ থাকে ড্রাইভারের, অন্য কোনদিকে তাকানোর সুযোগ

নেই।'

'একটা ধূসর পিজোর কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি জবাব দিয়েছিলে ওটা নদীতে পড়তে দেখনি। আদৌ গাড়িটা দেখেছিলে তো?'

'পিজো কি না তা বলতে পারব না, তবে নদীর ওপারের ওই রাস্তাটায় ধূসর রঙের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ।'

'দাঁড়িয়ে ছিল? তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ ছিল?'

মাথা নাড়ল ডিন। 'জানি না। মাথা ঘুরছিল। প্রথমে এল ডোরমোবিলটা, তারপর আরেকটা গাড়ি। দুটো গাড়িই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে।'

'ডোরমোবিল?'

'হ্যাঁ, ওরকমই কিছু হবে। ভ্যান সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। ভ্যান থেকে নামল দুজন নান।'

'নান?' একসঙ্গে বলে উঠল সোহানা ও রানা।

'হ্যাঁ। নান হলে অসুবিধে কী? ওরা কি গাড়ি চালায় না?'

ডিনের কথার জবাব না দিয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'জোয়ালিনের বোনের সঙ্গে দেখা করে টাকা চাইতে এসেছিল একজন নান।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মুখ খুলতে গিয়েও দুজনকে চিন্তিত দেখে থেমে গেল ডিন। বুঝল, কোনও একটা জরুরি বিষয় নিয়ে ভাবছে ওরা। তারপর ধীরে ধীরে রানা বলল, 'আরেকটা কাকতালীয় ঘটনার মধ্যে পড়লাম বোধহয় আমরা, কিংবা সলীলের উধাও হওয়া আর রিয়ার ব্ল্যাকমেইল, এই দুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক এখন আর অস্বীকার করা যাবে না।'

সোহানা বলল, 'আগে ওর কথাগুলো সব শোনা যাক। শুনলেই বোঝা যাবে।' আবার ডিনের দিকে ফিরল ও। 'ভ্যানটা আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব বলতে পারবে?'

'যেটুকু দেখেছি, বলতে পারব। ওটা এসে বাঁকের কাছে থামল। দুজন নান বেরিয়ে এল। আগেই বলেছি, মাথার ভিতরটা ভাল ছিল না। তাই প্রথমে ওদেরকে দুটো পেঙ্গুইন দেখেছি। গাড়ি থেকে নেমে সামান্য হেঁটে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। হাত নেড়ে ওদের চোখে পড়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাকে দেখেনি ওরা। কিংবা দেখেও দেখেনি। তারপর আবার বেহুঁশ হয়ে গেলাম। একটা সিগারেট খাই? অসুবিধে হবে?'

'ওই যে প্যাকেট,' দেখিয়ে দিল সোহানা।

সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবল ডিন। 'কতক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরেছিল, বলতে পারব না। ভ্যান আর নানেরা তখনও ছিল ওখানে। আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ভ্যানের সামান্য পিছনে। ওটার পাশে দাঁড়ানো একজন লোক। নিচু হয়ে, ঝুঁকে, গাড়ির একপাশের দরজা ধরে টানছিল... টেনে পাল্লাটাকে গাড়ির ছাতে তুলে দিল।'

সোহানা বলল, 'কিন্তু গাড়ির দরজা তো ছাতে তোলা যায় না।'

'জানি। ওখানে বসে বসে ভেবেছি এটা নিয়ে। কিন্তু এই কাজটাই করেছিল লোকটা। নিচু হয়ে দরজার নীচের দিকটা ধরে টান দিয়ে ওপরে তুলে ফেলেছিল।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। মাথা নাড়ল রানা। ডিনের দিকে ফিরল সোহানা। 'তারপর?'

'কিছু না। আবার বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম। হুঁশ ফিরলে চারপাশে হাতড়ে আমার কোটটা খুঁজতে শুরু করলাম, ওটা নেড়ে ওদেরকে সঙ্কেত দেয়ার জন্যে। আমার ধারণা, কয়েক মিনিট বেহুঁশ ছিলাম। গাড়িটাকে আর দেখলাম না। ভ্যানটা তখনও আছে, নানেরাও আছে, লোকটা ওখানে নেই। এদিক ওদিকে তাকিয়ে পাহাড়ের একটা দেয়ালের মাথায় দেখতে পেলাম লোকটাকে। আজব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল, অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, যেন একটা ক্রুশ।'

সোহানা বলল, 'তুমি বলতে চাইছ, দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল?' নিজের হাত দুদিকে লম্বা করে জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে?'

'না।' দুই হাত উঁচু করে কনুই বাঁকিয়ে দুদিকে ছড়াল ডিন, হাত দুটো মুখের কাছে নিয়ে এল। 'এভাবে।'

রানা বলে উঠল, 'বুঝেছি, দূরবিন দিয়ে দেখছিল ও।'

চোখ মিটমিট করল ডিন। 'আরে, তাই তো! ঠিকই তো বলেছেন আপনি। তারমানে শয়তানটা আমাকে দেখেছে, কিন্তু বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করেনি।'

'বরং মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে,' সোহানা বলল। 'পরদিন সকালে তিনজন খুনীকে পাঠিয়েছে তোমাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে।'

প্রথমে সোহানার দিকে, তারপর রানার দিকে, তারপর নিজের হাতের সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে রইল ডিন। বিড়বিড় করে বলল, 'মাই গড, বিশ্বাস করতেই তো কষ্ট হচ্ছে!'

'অবিশ্বাসের কিছু নেই,' সোহানা বলল।

'নানেরা ছিল ভ্যানটার পাশে দাঁড়ানো, আর লোকটা পাহাড়ের দেয়ালে,' রানা জিজ্ঞেস করল, 'ধূসর গাড়িটার কী হলো?'

চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল ডিন। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার চোখ মেলে মাথা নাড়ল, 'জানি না। ওটাকে আর দেখিনি।'

সোহানা বলল, 'চালিয়ে নিয়ে চলে গেলে নিশ্চয় তোমার চোখে পড়ত।'

'কী জানি! বেহুঁশ হয়ে থাকলে আর দেখব কীভাবে? যাই হোক, দুই মিনিট কোট নেড়ে এতটাই ক্লান্ত হয়ে গেলাম, একেবারে নেতিয়ে পড়লাম তাকের ওপর।' মুখ বাঁকাল ডিন। 'কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তখন। আবার বেহুঁশ হয়ে গেলাম। হুঁশ ফিরলে দেখি, ভ্যানটাও নেই। শূন্য রাস্তা। ওদের চলে যেতে শুনিনি, ইঞ্জিনের শব্দটব্দ, কিচ্ছু না।'

দীর্ঘ সময় ধরে মস্ত ঘরটায় নীরবতা বিরাজ করল। কৌতূহলী হয়ে বার বার সোহানা ও রানার দিকে তাকাচ্ছে। ওদের শূন্য দৃষ্টি মনে কীসের খেলা চলছে কিছুই ফাঁস করল না।

তারপর রানা বলল, 'ওই দরজাটাই লাশ খুঁজে না পাওয়ার বড় সূত্র।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'নানদের ব্যবহার করা হয়েছে।'

'ব্ল্যাকমেইলার নানের সঙ্গে এদের নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে?'

'আছে। ওরা আসল নান নয়। ওটা ছদ্মবেশ।'

আর চুপ থাকতে পারল না ডিন, 'আপনারা কী বলছেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

ওর কথা যেন কানেই ঢুকল না কারও। নিজের হাঁটুতে কিল মেরে রানা বলল, 'হুঁ, বুঝেছি!'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল সোহানা। 'কী বুঝেছ?'

'আমরা মনে করেছিলাম, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বা ওই ধরনের কোনও গ্রুপ, কিংবা জঙ্গিরা কিডন্যাপ করেছে সলীলকে।'

'করেনি?'

'শোনো, জোয়ালিনের বোনের ঘটনাটা প্রমাণ করছে একদল অপরাধী সংঘবদ্ধ হয়ে একটা ব্ল্যাকমেইলিং-প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। নানাভাবে খোঁজখবর করে ওরা মানুষের দুর্বলতা জেনে নিয়ে ওদের নিয়মিত ব্ল্যাকমেইল করে আসছে। সলীলের মত একজন মানুষকে পেলে কাজে লাগানোর মত কত তথ্য জোগাড় করতে পারবে ওরা, ভেবে দেখো।'

ঘড়ি দেখল সোহানা। মাথা তুলে রানার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'হেনরি ক্লিঙ্গার, শ্যাতো ল্যানসিউ।'

ডিন জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

ওর দিকে ফিরে সোহানা বলল, 'ওহ্, সরি। আসলে আমরা ভাবছি। মনের কথা মুখে বেরিয়ে আসছে।'

'সেটা না বোঝার মত বোকা নই আমি,' ডিন জবাব দিল।

উঠে দাঁড়াল সোহানা। ডিনের পিছনে এসে দাঁড়াল। ওর দুই কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দিয়ে বলল, 'ডিন, আমাকে আর রানাকে কয়েক দিনের জন্যে একটা জায়গায় যেতে হবে। তুমি কী করবে?'

'আমি? আমি তো বেকার। চাকরি করার সময় যৎসামান্য যা জমিয়েছিলাম, সেগুলোই ভেঙে খাচ্ছি এখন। তবে তাতেও আর বেশিদিন চলবে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কোন কাজ নেই আমার। জিজ্ঞেস করলেন, সেজন্যে বললাম; আমার বেকারত্ব নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে। বরং, একটা কথার জবাব জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছি। কী ঘটছে আসলে, দয়া করে বলবেন আমাকে?'

'শোনো,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সোহানা, 'ইচ্ছে করলে এ বাড়িতেই কিছুদিন থাকতে পারো তুমি। এখানে ভাল না লাগলে অন্য কোথাও পাঠাতে পারি, আরও খোলামেলা, আরও ভাল জায়গা আছে। আসলে, সত্যি কথাটা হলো, আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে লুকিয়ে রাখতে চাইছি।'

'লুকিয়ে? কেন? ও, বুঝেছি, আমি তো তথ্যের ভাণ্ডার, অনেক কিছু দেখে ফেলেছি। ওগুলো আপনাদের কোন্ কাজে লাগবে, বলবেন কি?'

'বলতে পারছি না, ডিন, বিশ্বাস করো। অসুবিধে আছে।'

চেয়ার থেকে উঠে সোহানার মুখোমুখি হলো ডিন। 'আপনারা না বললেও অনেকটাই অনুমান করে ফেলেছি আমি। আমার ফ্লিট স্ট্রিটের বন্ধু আমাকে সলীল সেনের নাম জানিয়েছে। নদীতে পড়ে যাওয়া ওই ধূসর গাড়িটার মধ্যে ছিল আপনাদের বন্ধু, তাই না? ও, না না, তা ছিল না, ওকে তো কিডন্যাপ করা হয়েছে। ব্ল্যাকমেইল করার মত তথ্য জোগাড়ের জন্যে। ওকে উদ্ধার করতে যাবেন আপনারা।' মুচকি হাসল ও। 'এ-সব বুঝে ফেলার জন্যে আমাকে একটা স্বর্ণপদক না হোক, ব্রোঞ্জ দেয়া উচিত আপনাদের। ভবিষ্যতে নিজেদের ভাবনাগুলো আমার সামনে আর জোরে জোরে না ভেবে মনে মনেই ভাববেন।'

উদ্বিগ্ন হয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

রানা বলল, 'সব ওকে খুলেই বলো। নইলে গিয়ে আবার ফ্লিট স্ট্রিটের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে। জানাজানি হয়ে যাবে। সলীলের ক্ষতি হতে পারে তাতে। হয়তো আমরা পৌঁছানোর আগেই ওর মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে তখন।'

রানার দিকে ফিরে শান্তকণ্ঠে ডিন বলল, 'এমনিতেই তিনটে জীবন শেষ হওয়ার জন্যে আমি দায়ী, আমার কারণে আরেকটা জীবন শেষ হয়ে যাক, তা আমি চাই না। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন।'

'আমি জানি, ডিন,' সোহানা বলল। 'বসো।' কাঁধে চাপ দিয়ে ডিনকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল ও।'

তিন মিনিট পর ডিন জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে সলীল সেনকে উদ্ধার করতে শ্যাতো ল্যানসিউতে যাচ্ছেন আপনারা, পিরেনিজে?'

'হ্যাঁ...' বলতে গেল সোহানা।

'ফরাসি পুলিশকে জানালেই হয়, ওরাই উদ্ধার করে আনবে। আমি তো দেখেছি, ভাল প্রভাব আছে আপনার ওখানে।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। শ্রাগ করল রানা। ডিনের দিকে ফিরল। 'পুলিশের চেয়ে অনেক ভালভাবে কাজটা করতে পারব আমরা, ডিন। ওদের অনেক ঝামেলা। শ্যাতো ঘেরাও করার জন্যে বৈধ কাগজপত্র, অনুমতি জোগাড় করতে হবে। তাতে দেরি হবে। আর পুলিশ আসতে দেখলে সলীলকে তখুনি মেরে ফেলতে দ্বিধা করবে না ব্ল্যাকমেইলাররা।'

'তা হলে কী করতে চান? শ্যাতোতে ঢুকে সবাইকে গুলি করে মেরে বন্ধুকে বের করে আনবেন?'

'না, প্রথমে তা করতে চাইব না। চুপচাপ ঢুকে, চুপচাপই ওকে বের করে আনার চেষ্টা করব।'

'আপনারা দুজন মিলে?'

'আমরা ব্যাক-আপের ব্যবস্থা করেই যাব,' বলল রানা। 'সলীলকে নিরাপদ জায়গায় রেখে তারপর ব্ল্যাকমেইলারদের খবর জানাব পুলিশকে। তখন ওরা যা করার করবে।'

'বুঝলাম।' সোহানার দিকে তাকাল ডিন। 'আপনি আমাকে থাকতে বলছেন। এখানে যে আমি নিরাপদ তার গ্যারান্টি কী? ওরা তো এখানে এসেও আমাকে খুন

করে রেখে যেতে পারে। বরং আপনাদের সঙ্গে থাকলেই আমি বেশি নিরাপদ। সুতরাং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটাই কি ঠিক হবে না?'

মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা। 'না। সরি, ডিন, তোমাকে নেয়া যাবে না।'

'আমি আপনাদের কাজেও তো লাগতে পারি। আমি শ্যাতোতে গিয়ে দেখে আসতে পারি সলীল সেন আছে কি না।'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল সোহানা। 'অসম্ভব! তোমাকে ওখানে যেতে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'একটা কথা বলুন তো আমাকে,' হাত নেড়ে জিজ্ঞেস করল ডিন, 'ঢুকবেন কী করে ওখানে?'

শ্রাগ করল সোহানা। 'এখনও জানি না। প্রথমে ওখানে যাব, পরিস্থিতি বুঝব, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।'

'আর ইতিমধ্যে সলীল সেনের পায়ের নীচে লাইটার ধরে পায়ের পাতাটা পুড়িয়ে ফেলুক ওরা।'

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না তুমি, ডিন,' সোহানা বলল। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে বের করে আনব আমরা।' রানার দিকে ফিরল ও। 'রয়কে সব জানিয়ে যাব?'

'হ্যাঁ, জানাও। আমি রানা এজেন্সির লণ্ডন চিফকে ফোন করছি। আমাদের কিছু হলে, কিংবা শ্যাতোতে গিয়ে আটকা পড়লে যাতে ব্যবস্থা নিতে পারে।' ঘড়ি দেখল রানা। 'জোয়ালিন আসবে তিনটের সময়। ওকে কী বলা যায়, বলো তো?'

কিছুটা অসহায় ভঙ্গিতেই যেন হাত নাড়ল সোহানা। 'ডিনকে যা যা বলেছি। জোয়ালিন সলীলকে চেনে, তাই ওকে বোঝানো কঠিন হবে না।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, তুমি রয়কে জানাও। আমি লার্জ-স্কেল ম্যাপ আর মিচেলিন গাইড নিয়ে বসছি।'

খাটের উপর পাশে শোয়া স্বামীর গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে এমিলি জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, এত অন্যমনস্ক হয়ে ছাতের দিকে কী দেখছ? পুরানো ছাত, ফাটল তো থাকবেই।'

'দেখছি না, হানি,' ভারি স্বরে জবাব দিল ক্লিঙ্গার। 'ভাবছি...'

'কী ভাবছ?'

'ভাবছি, আমার প্রতি আর কোন আকর্ষণ নেই তোমার। আরও জোয়ান কারও দিকে চোখ পড়ল নাকি?'

'কী যে বলো তুমি, ডিয়ার, তোমার মত জোয়ান কেউ আছে নাকি?'

'কিন্তু আমি তো বুড়ো...' দরজায় টোকার শব্দে বাধা পড়ল ক্লিঙ্গারের কথায়। রেগে গিয়ে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'সরি, বস, বিরক্ত করলাম।' জো লুই-এর খুশি-খুশি কণ্ঠ শোনা গেল বাইরে থেকে। 'লণ্ডন থেকে একটা মজার খবর এসেছে।'

'স্টাডিতে যাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

ক্লিঙ্গার যখন স্টাডিতে ঢুকল, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে তখন জো লুই। দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফিরাল ও। পায়জামার ওপর ড্রেসিং গাউন পরে এসেছে ক্লিঙ্গার।

'মজার খবরটা কী, মিস্টার জো লুই?' ডেস্কে বসল ক্লিঙ্গার।

'লণ্ডনে সোহানা চৌধুরির বাড়ির ওপর নজর রাখার জন্যে লোক লাগিয়েছিলাম আমি,' জো লুই জবাব দিল। 'সন্দেহজনক কিছু দেখা গেলে খোঁজ নিতে বলেছিলাম।'

'তা-ই? খুব ভাল করেছ।'

'আর তাতেই কাজটা হয়ে গেছে। ও খবর দিয়েছে, কাল অনেক রাতে একজন মাতালকে সোহানার বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেছে। লোকটার নাম ডিন। দারোয়ান ঢুকতে দিতে চাচ্ছিল না। রেগেমেগে তখন লোকটা বলেছে *জাহান্নামে যাও তুমি, হাঁদা কোথাকার! সোহানাকে বলো, পাহাড়ের তাক থেকে যাকে উদ্ধার করেছে, সেই ডিন এসেছে!*'

একটা হাত ডেস্কে লম্বা করে ফেলে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে ক্লিঙ্গার। ধীরে ধীরে বলল, 'নিশ্চয় সোহানাকে কিছু জানাতে গেছে?'

শ্রাগ করল জো লুই। 'কে জানে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সময় থাকতেই সলীল সেনকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার।'

'কথাটা ভুল বলনি। তবে ডিন যদি কিছু দেখে থাকে, আর সোহানাকে বলেও দেয়, এ জায়গার খোঁজ বের করা ওদের জন্যে সহজ হবে না। তারপরেও, সাবধানের মার নেই। সোহানার ওপর নজর রাখুক তোমার লোকটা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর দিতে বলবে। সোহানা কোথায় যায়, কী করে, সব জানতে চাই আমরা।'

'ওসব আমি বলে দিয়েছি, বস্। টুলুজেও কথা বলেছি, নিকোলাসের সঙ্গে। ওকে বলেছি, সোহানা ফ্রান্সে ঢুকলে কোনদিকে যায়, কী করে, যেন নজর রাখে, আর আমাদের জানায়। ও, আরেকটা কথা, সোহানার সঙ্গে ওর বাড়িতে মাসুদ রানাও আছে।' হাসল জো লুই। 'দুজনকেই যমের মত ভয় পায় নিকোলাস। বলেছে, ভুলেও ওদের সামনে যেতে রাজি নয় ও, তবে এই এলাকায় দেখলেই আমাদের খবর দেবে।'

'তুমি নিশ্চয় ওদের ভয় পাও না, মিস্টার জো লুই?'

হা-হা করে হাসল জো লুই। 'আমি বরং ওদের অপেক্ষায় পথ চেয়েই বসে থাকব। ওরা আসুক এখানে। উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না হলে পাঞ্জা ধরে আরাম আছে, বলুন?'

আট

ডিন ওদেরকে সবকথা জানানোর দুই ঘণ্টা পর। মেঝেতে মস্ত একটা ম্যাপ

বিছিয়ে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে রানা। ডিভাইডার দিয়ে মাপছে। ফোনে কথা বলছে সোহানা।

চুপচাপ বসে সিগারেট টানছে ডিন। তাকিয়ে আছে চেয়ারে বসা মহিলার দিকে। ঘণ্টাখানেক আগে এসেছে ও। সোহানার চেয়ে লম্বা, দু-এক বছরের বড় হবে। ছোট করে ছাঁটা বাদামি রঙের চুল। বাদামি চোখ। পরনে ক্যামেল ট্রাউজার-সুট, সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরেজিতে কথা বলে, তাতে স্কটল্যাণ্ডীয় টান, তবে এতই কম, ভাল করে খেয়াল না করলে বোঝা যায় না।

লেডি জোয়ালিন হেইফোর্ড। স্ট্র্যাটল্যান ও ইনভারডেলের আর্লের মেয়ে শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে ওর দিকে। এখানে আসার পর থেকেই বিস্ময়গুলো উপভোগ করছে ডিন। সোহানা চৌধুরি, মাসুদ রানা, সলীল সেন—যদিও দেখেনি ওকে ডিন, তবু বুঝতে পারছে—অন্য এক জগতের মানুষ যেন এরা। এদের সঙ্গে যাদের পরিচয়, যারা এখানে আসছে, তারাও সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। এদের সঙ্গ ভাল লাগছে ওর। কেমন একটা ট্রান্সের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে ভাবছে ডিন।

সোহানার কথায় ধ্যান ভাঙল ওর। ফোন রেখে দিয়ে সোহানা বলছে, 'রয় বলল, পিরেনিজ সীমান্তে একটা ছোট্ট গ্রামের তিন কিলোমিটার দূরে রয়েছে শ্যাতো ল্যানসিউ। গ্রামটা এত ছোট, মাত্র পাঁচ-সাতটা ছোট ছোট কুঁড়েঘর আছে ওখানে। কিছু মেষপালক থাকে ওখানে। গ্রামের কোনও নাম নেই। শ্যাতো থেকে আট মাইল দূরে আছে নিয়াউ আর পনেরো কিলোমিটার দূরে লোসে গ্রাম। মিচেলিন গাইডে লোসের নাম দেখো, রানা। জোয়ালিনের জন্যে ওখানেই রুম বুক করতে হবে।'

জোয়ালিন বলল, 'তোমরা থাকবে না, সোহানা?'

'না। আমরা তোমাকে ওখানে রেখে পাহাড়ের দিকে যাব। তুমি হবে আমাদের যোগাযোগের ইমার্জেন্সি লাইন। দুটো ফোন নম্বর দেয়া হবে তোমাকে। একটা ফ্রান্সের, আরেকটা লণ্ডনের।'

হাসল জোয়ালিন, নিরুত্তাপ হাসি। সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'এতে হাসির কী দেখলে?'

'ওই পার্বত্য অঞ্চলে টেলিফোন পাবে কোথায়? মোবাইলেও লাইন পাবে না। একমাত্র ওয়্যারলেস। তা, কী ধরনের ইমার্জেন্সি আশা করছ তোমরা?'

'একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি ফিরে না আসি আমরা, ধরে নেবে, গণ্ডগোল হয়েছে।'

'ও।' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দু'হাতের দিকে তাকাল জোয়ালিন।

'কিংবা এমনও হতে পারে, শ্যাতো থেকেও তোমাকে ফোন করতে পারি। সেটা নির্ভর করবে ওখানে কী ঘটছে, তার ওপর।'

মুখ তুলল রানা। 'ওখানে টেলিফোন লাইন আছে?'

'রয় বলল, আছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা ওই শ্যাতোকে ওদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ওখান থেকে স্পেনে পালানোর রাস্তাগুলোর দিকে নজর রেখেছে। ওরা চলে যাবার পর কয়েকবার হাত বদল

হয়েছে ওই শ্যাতো, খুব সস্তায়, কারণ ওটার তেমন কোন মূল্যই নেই আর। এখন ওখানে কারা বাস করছে, জানে না ও।'

ডিন বলল, 'লেডি জোয়ালিন, আপনাকে সঙ্গে নিতে এই দুজনকে রাজি করালেন কী করে?'

'লেডিটা বাদ দিন, প্লিজ।'

'থ্যাংক ইউ। রাজি করালেন কী করে?'

রানার দিকে তাকাল জোয়ালিন। 'কী জানি।'

মুখ তুলল রানা। মিচেলিন গাইডে একটা আঙুল রাখা। বলল, 'ওখানে লা লিওঁ রু নামে একটা হোটেল আছে। বারোটা ঘর, অ্যাটাচড বাথ, বিদে, সেন্ট্রাল হিটিং সিসটেম, গাড়ি পার্কিঙের জায়গা আছে। সাদাসিধে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রেস্টুরেন্টটাও ভাল। চলবে তোমার, জোয়ালিন?'

'চলবে, যে-কোনও জায়গাই আমার জন্যে ফাইভ-স্টার হোটেল, যেখানে ভোর পাঁচটায় উঠে গাই দোয়ানো শুরু করতে হবে না আমার।'

ডিন বলল, 'তা হলে দুটো রুম বুক করুন, সোহানা।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাল সোহানা। 'এ নিয়ে কথা হয়ে গেছে আমাদের।'

'হয়েছে। তবে কিছু কথা এখনও বাকি আছে, বে...না না, আর বেইবি বলব না। যেমন ধরুন, কেইভিং সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে আপনার? কিংবা ধরুন, পট-হোলিং?' হাত নাড়ল ডিন, 'না না, এখনও আমার কথা শেষ হয়নি, থামিয়ে দেবেন না। আমি রসিকতা করছি না।'

সন্দিহান চোখে ডিনের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'আছে। তবে খুব বেশি না। তাতে কী?'

'তাতেই তো সবকিছু। ইদানীং আর যাই-টাই না, তবে পুরো চারটি বছর আমার একমাত্র হবি ছিল গুহায়-গুহায় বেড়ানো।'

জোয়ালিন জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ওরা যে কাজটা করতে যাচ্ছে, তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক, মিস্টার মার্টিন?'

'মিস্টার বাদ, প্লিজ, শুধু ডিন। প্রশ্নটা করায় খুশি হলাম।' সোহানার দিকে একনজর তাকাল ও। তারপর জবাব দিল জোয়ালিনের প্রশ্নের: 'এর সঙ্গে সম্পর্ক হলো, চোরাপথে শ্যাতো ল্যানসিউতে ঢোকা। আর কেবল গুড ওল্ড পট-হোলার মিস্টার ডিন মার্টিনই সে-পথ দেখাতে পারে ওঁদের।'

উঠে দাঁড়াল রানা। সোফার হাতলে বসল সোহানা। ডিনের দিকে চোখ। 'কী বলতে চাও? সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে?'

'হ্যাঁ। অসংখ্য গুহা আছে ওখানে। পাহাড়ের নীচে জালের মত ছড়িয়ে আছে সুড়ঙ্গ। এক গ্রীষ্মে একটা দলের সঙ্গে তিন সপ্তাহ ওখানকার গুহাগুলোতে ঘুরেছিলাম। আমাদের ফরাসি গাইড এমন কিছু গুহা আর সুড়ঙ্গ আমাদের দেখিয়েছিলেন, ওগুলো যে ওখানে আছে, ওই এলাকার মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন লোক সেটা জানে। একটা গুহার নাম *ল্যানসিউ কেইভ*।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে ওটা দিয়ে শ্যাতোতে ঢোকা যায়?'

'যায়, তবে কঠিন আছে। গুহা হিসেবে ওটাকে মাঝারি আকারের গুহা ধরা হয়। ওখানে ঢোকার মাইলখানেক লম্বা সুড়ঙ্গপথটারও কিছু কিছু জায়গা এতই সরু, হামাগুড়ি দিতে হয়। গুহাটার ভিতর একটা পাতালনদী আছে, চওড়া হতে হতে এক জায়গায় গিয়ে একটা হ্রদ তৈরি করেছে। ওটা পেরোতে হলে রাবারের ডিঙি দরকার। বিভিন্ন দিকে সুড়ঙ্গমুখ চলে গেছে গুহাটা থেকে। গুহার আধমাইল ভিতরে একটা ঢালু জায়গা আছে, জায়গাটার ঠিক মাঝখানে খুব ছোট একটা জলপ্রপাত আছে। গাইড বলেছেন, ওই ঢাল বেয়ে নাকি উঠেছিলেন তিনি, সেটা দিয়েই ল্যানসিউ শ্যাতোতে পৌঁছানো যায়। শ্যাতোর রান্নাঘর কিংবা সেলারের ভিতর দিয়েই বোধহয়।'

'রান্নাঘর থেকে আবর্জনা ফেলার গর্ত দিয়ে না তো?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল রানা।

চোয়াল ডলল ডিন। 'না না, মনে পড়েছে, সেলারের ভিতর দিয়ে। গাইড বলেছিলেন, প্রপাতের নীচে কয়েকটা কঙ্কাল দেখেছেন তিনি। অনেক পুরানো। ওপর থেকে ফেলা হয়েছে, বোঝা যায়। কোন্ শতকে কে জানে, কোনও কারণে ওদেরকে মেরে লাশগুলো গোপনে ফেলে দেয়া হয়েছে ওখান দিয়ে। মৃতদেহ যদি ফেলা যেতে পারে, জ্যান্ত মানুষ কেন ওই গর্ত দিয়ে ঢুকতে পারবে না?'

রানা বলল, 'তা তো বটেই। কিন্তু এখন নিশ্চয়ই গ্রিল দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে।' সোহানার দিকে তাকাল ও। 'তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলে সহজেই, যদি থাকে, ওই গ্রিল কেটে ঢুকতে পারব আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। ডিনের দিকে তাকাল। 'কোন্ গুহাটা দিয়ে ঢুকতে হয়?'

হেসে উঠল ডিন। দুই হাত ছড়াল। 'বোঝার চেষ্টা করুন, মিস সোহানা। পিরেনিজ আপনার অচেনা নয়, জানি। ওখানকার অসংখ্য ফাটল আর গুহামুখের কোন্‌টা দিয়ে ঢুকতে হবে, কীভাবে চেনাব? তবে আমি আপনাদেরকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি। চিনি আমি রাস্তাটা। কিন্তু কোন্ রাস্তা, তা-ও বলে বোঝাতে পারব না।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'অন্ধকারে চিনবে?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ডিন। 'না। তবে খুব সামান্য আলো থাকলেও পারব। গোধূলি বেলায় কিংবা কাকভোরে। প্রপাতটা কোথায় আছে, সেটা দেখানোর জন্যেও গুহায় ঢুকতে হবে আমাকে। যতই বুঝিয়ে দিই না কেন, আমি সঙ্গে না থাকলে ওটা খুঁজে বের করতে পারবেন না আপনারা।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'ও যা বলছে, তাতে তো সঙ্গে নেয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। কিন্তু এই বিপদের মধ্যে ওকে জড়ানোটা কি ঠিক হবে?'

চেয়ারের হাতলে কিল মারল ডিন। 'আমাকে এত হাঁদা ভাবছেন কেন!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল ও। 'আপনার কি ধারণা, ওখানে গিয়ে লাফালাফি শুরু করব আমি, মানুষের চোয়ালে লাথি মারার চেষ্টা করব, আপনার মত? আমি জানি, চেষ্টা করলেও পারব না, ওটা আমার লাইন নয়। ফর গডস সেক, বিশ্বাস করুন আমাকে!' সামনে ঝুঁকল ও। ওর ভুরুতে ঘাম দেখল সোহানা। 'ওখানে...ওখানে

একজন মানুষের ওপর নিশ্চয় প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হচ্ছে,' ডিন বলল, 'আর আমরা এখানে বসে বসে অকারণ তর্ক করছি। আপনারাই বলছেন, তাড়াতাড়ি না গেলে ওকে জ্যান্ত পাওয়া না-ও যেতে পারে। শোনেন, তিনজন মানুষকে খুন করে এমনিতেই আমার মনমেজাজ অনেকদিন থেকে ভাল না। এখন একজনকে বাঁচাতে পারলে হয়তো কিছুটা শান্তি পাব। একটু বোঝার চেষ্টা করুন, প্লিজ!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে।' সোহানার দিকে তাকাল ও। 'সরাইখানায় ফোন করো। বলো, দুটো রুম চাই আমাদের।'

পরদিন সকাল আটটায় লণ্ডন থেকে ছয়শো মাইল দূরে একটা ছোট্ট ঘরে ঘুম ভাঙল লেডি জোয়ালিন হেইফোর্ডের। বড় বড় ফুলওয়ালা কাগজ লাগানো দেয়াল। হাতে বোনা গালিচায় ঢাকা কাঠের সুন্দর পালিশ করা মেঝে, যদিও হাঁটতে গেলে পায়ের চাপে শব্দ হয়।

প্রথমে ভেবেছিল, ঘুমোতে পারবে না, কিন্তু বালিশে মাথা ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। তারপর তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা বাস্তবে ঘটছে না। নতুন জায়গায় ঘুমানোর আজব অনুভূতিটা দূর করার চেষ্টা করছে।

রাত দশটার কয়েক মিনিট পর আকাশে উড়েছিল সেসনা বিমানটা। বেশ উত্তেজনা বোধ করছিল ও। ওড়ার পর উঁচুতে ওঠার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা ও সোহানা। কিন্তু জোয়ালিন আর ডিনের চোখে ঘুম ছিল না। ওর চোখে চোখে তাকিয়ে ডিন বলেছে, 'এত সহজেই যে কীভাবে ঘুমিয়ে পড়ে ওরা, বুঝি না। আমার এখন ঘুমোতে গেলে দুটো ঘুমের বড়ি লাগবে।'

'এটা একটা ঈর্ষণীয় ক্ষমতা, সন্দেহ নেই,' তিক্ত হাসি হেসেছে জোয়ালিন। 'আমার ব্যাগে ঘুমের বড়ি আছে। দেব একটা?'

'নাহ্। ভোরবেলা পিরেনিজে হাঁটতে গিয়ে শেষে ঢলে ঢলে পড়ব। আমার আসাটা কোন কাজেই লাগবে না।' রানাকে দেখাল ডিন। 'মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা এই মানুষটার সঙ্গে কাটিয়েছি আমি। অদ্ভুত এক চরিত্র!'

'আসলেই তাই।'

'সোহানাও কম আজব নয়, একই দলের তো। বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর সংস্পর্শে এসে। অর্ধেক সময় মনে হয়েছে ও আমার মা।'

'আর বাকি অর্ধেক?'

'বাকি অর্ধেক সময় মনে হয়েছে বোন। কী জানি, কেন বলতে পারব না। তবে আজব এক অনুভূতি। মনে হয়েছে, ওরা কেউ এ জগতের বাসিন্দা নয়। এই যে ওদের সঙ্গে প্লেনে করে উড়ে চলেছেন, সেটাও কি বাস্তব লাগছে? মনে হচ্ছে না, যে-কোন মুহূর্তে জেগে উঠে দেখবেন বাড়িতে বিছানায় শুয়ে আছেন?'

'ও, আপনারও ওই রকম লাগছে? যাক, সঙ্গী পাওয়া গেল। থ্যাংক ইউ, ডিন।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।' হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে জোয়ালিনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ডিন। 'আমার কাছে একটা পকেট-দাবা আছে। খেলবেন?'

'ভাল পারি না।' ঘুমন্ত রানা ও সোহানার দিকে তাকাল জোয়ালিন। 'তবে ওরা দুজন ওস্তাদ দাবাড়ু। ওদের দেখলে আমার মনে হয়, সারাক্ষণই মনে মনে দাবার চাল চালে ওরা।'

'ঈশ্বরই জানে, ওরা কী করে! এমন অদ্ভুত মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। বাদ দিন ওদের কথা। তবে মনে হচ্ছে, আপনি একজন স্বাভাবিক মানুষ। তো, খেলবেন না?'

'ঠিক আছে, বের করুন।'

ডিনের সঙ্গে দুই দান দাবা খেলেছে জোয়ালিন, তারপর পাইলটের পাশে বসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়েছে। লম্বা, ছিপছিপে একজন মানুষ, বয়েস চল্লিশের কাছে, পাতলা চুল। প্রথম দিকে বিশেষ কথা বলতে চাইল না ও, গোমড়ামুখো হয়ে রইল, কিন্তু যখন জানল, জোয়ালিনের প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স আছে, তা-ও আবার ইন্সট্রুমেন্ট রেটিঙে, মুহূর্তে বদলে গেল ও। প্লেন আর এর যন্ত্রপাতি নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল দুজনে। তারপর আধ ঘণ্টার জন্য প্লেনের কন্ট্রোলও ছেড়ে দিল জোয়ালিনের হাতে।

রাত দুটোর সামান্য পরে ব্ল্যাগনায় ল্যাণ্ড করল বিমান। ওদের নেয়ার জন্য দুটো গাড়ি এসেছে, টুলুজের এক কার-হায়ার কোম্পানির পাঠানো। আনুষ্ঠানিকতা সারার পর এয়ারফিল্ড অফিস থেকে গাড়ি দুটোর চাবি নিয়েছে ওরা, দক্ষিণে রওনা হয়েছে। ভোর চারটে নাগাদ পৌঁছেছে লুসে থেকে মাইলখানেক দূরের ছোট্ট একটা গ্রামে। রানা যে গাড়িটা চালাচ্ছিল, সেটার ড্রাইভিং সিটে বসেছে ডিন। জোয়ালিনকে নিয়ে এসেছে লা লিওঁ রু-এ।

সরাইখানার মালিক জানে, ওরা আসবে। তারপরেও এত ভোরে আসায় ওর তরফ থেকে কিছুটা বিরক্তি আশা করেছিল জোয়ালিন, কিন্তু পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে হাসিমুখে ওদের গ্রহণ করল লোকটা। ফরাসি ভাষাটা ভাল জানে না জোয়ালিন, আঞ্চলিক শব্দগুলো বুঝতে পারে না, তবে যেটুকু জানে, তাতে কাজ চালানো যায়। মালিকের কাছ থেকে ও জানল, এখন টুরিস্ট মৌসুম নয়, তাই দুটো ঘর বাদে বাকি সবগুলোই খালি। দুজন বুড়ো ফরাসি ভদ্রলোক ওই ঘরগুলোতে অনেক দিন ধরেই আছেন, নিজেদের বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন, ঝগড়া ছাড়া থাকতে পারেন না, তবে তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আগেই জানিয়ে রাখা হলো, *ম্যাডাম* আর *মঁসিয়ে* যাতে বিব্রত বোধ না করেন।

জোয়ালিন জানাল, মঁসিয়েটি সম্পর্কে ওর *খালতো* ভাই, একজন লেখক। ভুল করে টুলুজের গ্যারেজে ওর ব্রিফকেসটা ফেলে এসেছে, যেখান থেকে গাড়িটা ভাড়া নিয়েছে। মূল্যবান কাগজপত্র আর নোট রয়েছে তাতে, এখুনি আনতে যেতে হবে।

জিভ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করে সহানুভূতি জানাল মালিক। ওদের ঘর দেখিয়ে দিল। আশা করল, বহুদূর থেকে জার্নি করে আসা ক্লান্ত ম্যাডামের ঘুমটা ভালই হবে, তারপর মঁসিয়েকে আবার পৌঁছে দিল সদর দরজার কাছে। ভরসা দিল, দুই ঝগড়াটে বুড়োকে সাবধান করে দিয়েছে, ওরা যাতে ঝগড়া করার সময় চেঁচামেচি না করে। কাজেই মঁসিয়ে ফিরে এসে আরামেই ঘুমাতে পারবেন, তাঁর শান্তি

বিঘ্নিত হবে না।

আরামদায়ক উষ্ণ বিছানায় শুয়ে, জাফরিকাটা জানালা দিয়ে বাইরের নবাগত দিনের দিকে তাকিয়ে এ-সব কথা ভাবছিল জোয়ালিন, দরজায় টোকার শব্দে ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল। বিছানায় উঠে বসে বলল, 'কে?'

দরজা খুলে মাথা ঢুকিয়ে দিল ডিন। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে, তবে পরিতৃপ্ত। হাসিমুখে বলল, 'গুড মর্নিং, সিস্টার জোয়ালিন। ঘুম ভাঙালাম না তো?'

'না, পাঁচ মিনিট আগেই জেগে গেছি আমি। আপনাকে দেখে ভাল লাগছে, ডিন।'

'আস্তে!' তাড়াতাড়ি ফিরে তাকিয়ে দেখল ডিন, কেউ শুনছে কি না। আবার জোয়ালিনের দিকে ফিরে বলল, 'আমরা এখন কাজিন, আপনি-আপনিটা বাদ দাও। কেউ শুনলে সন্দেহ করবে। ঘরে ঢুকব?'

'ঢুকতে না দেয়াই উচিত, মাত্র ঘুম ভেঙেছে, চোখে নিশ্চয় ময়লা লেগে আছে, মুখ ধোয়ারও সময় পাইনি; কিন্তু কৌতূহল দমন করতে পারছি না। যাকগে, দেখেই তো ফেলেছ, এখন আর লেগে থাকলেই বা কী, না থাকলেই কী। এসো।'

ঘরে ঢুকে জানালার কাছের একটা চেয়ারে বসল ডিন। 'সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো, দুর্দান্ত সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে...'

হেসে বাধা দিল জোয়ালিন, 'তুমিই কিন্তু এখন আবার আপনি বলে ফেললে। তুমিটাই চলুক না, শুনতে ভালই তো লাগছে।'

একটু যেন আড়ষ্ট মনে হলো ডিনকে। দ্রুত সেটা কাটিয়ে নিয়ে হাসল। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মুখ ধোয়ার আর দরকার কী? তুমি হচ্ছ সেই মেয়েদের দলে, যাদেরকে সব সময়, সব অবস্থাতেই ভাল লাগে।'

প্রশংসায় খুশি হলো জোয়ালিন। 'আমি তো গেঁয়ো মেয়ে।'

'দেখে মনেই হয় না। তোমার মুখ দেখে বয়েসও বোঝা যায় না। মনে হয় এখনও টিন-এজার।'

'বছর পাঁচেক পরে এসে দেখা কোরো, একজন বুড়িকে দেখবে।'

'না, সত্যি বলছি।' হাসি স্থির হয়ে আছে ডিনের মুখে। 'প্রথমবার যখন তোমার পরিচয় জানলাম, চমকে উঠেছিলাম, বিশ্বাস করো, একজন আর্লের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি জেনে। জমিদার দেখলে কাঁচুমাচু হয়ে যাওয়া—আমার মধ্যে নিশ্চয় কোথাও গোলামের চরিত্র লুকিয়ে আছে।'

কৌতূহলী চোখে ডিনকে দেখছে জোয়ালিন। 'সোহানা বলছিল, মাঝে মাঝে তুমি বন্য হয়ে ওঠো, কিন্তু সেরকম কোনও লক্ষণ তো এখন পর্যন্ত দেখছি না তোমার মধ্যে।'

'সোহানা ঠিকই বলেছে, জোয়ালিন। আমার মুখের ভাব দেখে মনের ভিতরটা বুঝতে পারবে না; সারাক্ষণই একটা যন্ত্রণা পোড়াতে থাকে আমার ভিতরটাকে। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'সত্যি আমি জানি না। প্লেনে সেই অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে... থাকগে, বাদ দাও। সকাল বেলাতেই ওসব ঘ্যানর ঘ্যানর তোমার ভাল লাগবে না। নাস্তা হয়নি নিশ্চয়ই?'

'না। তবে আগে জানতে চাই, কী করে এলে তুমি।'

'গুহায় ঢোকা নতুন কিছু না আমার জন্যে, তবে এবার কেমন উত্তেজনা বোধ করেছি। গুহামুখের কাছ থেকে মাইল তিনেক দূরে গাড়ি দুটো লুকিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে গেছি আমরা। বিশাল দুটো বোঝা বয়ে নিয়েছে রানা ও সোহানা। আমি সাহায্য করতে চেয়েছি, কিন্তু কিছুই করতে দেয়নি। বলেছে, ওদের কাজ নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমার কাজটুকু আমি করে দিলেই হলো। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিছু মনে করবে?'

'আমাকেও একটা দাও।'

সিগারেট ধরিয়ে ডিন বলল, 'ম্যাপ দেখে দেখে চলছিল ওরা। আমি বললাম, ম্যাপ দেখার দরকার নেই, দেখেই চিনতে পারব। কিন্তু আমার কথা শুনল না ওরা, বলল, কোনও কারণে ভুল হয়ে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম, ঠিকই করেছে। কারণ প্রথম দুই মাইল প্রায় অন্ধকারের মধ্যে চলতে হয়েছে, রাস্তা চেনা যাচ্ছিল না। যাই হোক, অবশেষে পরিচিত পায়েচলা রাস্তাটা চোখে পড়ল আমার। ভোরের আলো ফোটার সময় উপত্যকায় পৌঁছলাম আমরা।'

'গুহাটা পেলে?'

'পেতে মাত্র বিশ মিনিট লেগেছে। অনেক দিন আগের কথা হলেও ভালমতই চিনতে পারছিলাম। ঢোকার পর শুরুতে অনেক বেশি আঁকাবাঁকা, তারপর অনেকখানি ঢালু পথ, তারপর একটা সরু নদীর কিনার দিয়ে এগোনো—নদীর একপাশে এক জায়গায় পনেরো ফুট গভীর একটা কুয়াও আছে—এবং তারপর একটা স্ট্যালাকটাইট চেম্বার, দেখার মত একটা জায়গা। এখানেই নদীটা গিয়ে পড়েছে সেই পাতালহ্রদটায়। ওটা পেরোনোর জন্যে রবারের ডিঙি ব্যবহার করতে হয়েছে আমাদের।'

'খুব গভীর, তাই না?'

'খুউব। পানির দিকে তাকালে ভয়ই লাগে। মনে হয় ভয়ঙ্কর কোনও জলদানব লুকিয়ে আছে ওই হ্রদের তলায়। প্রথম যখন ওই গুহাটায় ঢুকেছিলাম, আমাদের ইন্সট্রাক্টর চল্লিশ ফুট লম্বা একটা দড়িতে ভার বেঁধে নামিয়ে দিয়েও হ্রদের তল খুঁজে পাননি। সাঁতার জানলে ডিঙি ছাড়াও পেরোনো যায়, কিন্তু গুহার ভিতরে যতটা সম্ভব শুকনো শরীরে থাকার চেষ্টা করতে হয়। কারণ, গুহার ভিতর ভেজা শরীরের তাপমাত্রা খুব দ্রুত কমে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাতে মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে।' চোখ আধবোজা করে যেন মনে করার চেষ্টা করল ডিন। হ্রদের ওপারে খুব সরু একটা সুড়ঙ্গ পেরোতে হয়, এতই সরু, মোটা মানুষের ঢুকতে কষ্ট হবে। ওটা পেরোনোর পর নৌকার গলুইয়ের মত উঁচু হয়ে উঠে গেছে প্রায় দশ ফুট পথ, এবং তারপর থেকে সোজাসাপ্টা, আর কোন ঝামেলা নেই। আমি ওদেরকে জলপ্রপাতটা দেখিয়েছি, যেখান দিয়ে শ্যাতোতে ওঠা যায়।

তারপর আবার বেরিয়ে এসেছি আমরা।'

জানালা দিয়ে বাইরের উজ্জ্বল রোদের দিকে তাকাল জোয়ালিন। গুহার ভিতরের সেঁতসেঁতে ঠাণ্ডা, আদিম অন্ধকার আর লণ্ঠনের মিটমিটে আলোতে এ মুহূর্তে কেমন লাগবে কল্পনায় বোঝার চেষ্টা করল। ওর কল্পনায় গুহাটাকে মনে হলো লক্ষ লক্ষ বছর এঁকেবেঁকে পড়ে থাকা যেন আদিম এক জন্তু। ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কী ঢাল বেয়ে উঠেছে, শ্যাতোর নীচে গ্রিল লাগানো কি না দেখার জন্যে?'

'না। আজ রাতে যাবে। জলপ্রপাতের কাছে ওদের জিনিসপত্র সব রেখে এসেছে। গ্রিল নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছে না। ওদের ধারণা, গ্রিল থাকলেও ওটা কেটে সহজেই ঢুকে যেতে পারবে।'

'এখন ওরা কোথায়?'

'শ্যাতো দেখতে গেছে।'

'শ্যাতো দেখতে?'

'হ্যাঁ। গুহা থেকে বেরিয়ে আমাকে গাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আমি বলেছি, একাই পারব, ওরা বলল, পারব না। আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিতেই সঙ্গে এসেছে ওরা। অদ্ভুত সব কাণ্ড করেছে! উপত্যকার নিচু জায়গাগুলো পেরোনোর সময় হামাগুড়ি দিয়েছে, আমাকেও দিতে বাধ্য করেছে। মাঝে মাঝে কোথাও থেমে কয়েক মিনিট চুপচাপ মাটিতে পড়ে থাকতে হয়েছে। তারপর আমাদের রেখে রানা একা উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়ায়। শিকারি চিতার মত সাবধানে, নিঃশব্দে। ওপর থেকে কিছু একটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাত নেড়ে আমাদের যেতে ইশারা করলে সোহানা আমাকে নিয়ে এগিয়েছে। ওদের দুজনের হাতেই অটোম্যাটিক রাইফেল। এমনভাবে পরস্পরকে কভার দিয়েছে, যেন গেরিলা যুদ্ধ করছে।'

'একে অদ্ভুত কাণ্ড বলছ কেন?'

'অদ্ভুত না? এই জনমানবহীন নিরালা জায়গায় কী দরকার এত সাবধানতার?'

'নিরাপত্তা।'

'কীসের? ওদের দুজনের কাজ-কারবার সত্যিই অদ্ভুত লাগে আমার কাছে। কথা প্রায় বলেই না, কিন্তু কাজগুলো একসঙ্গে এমনভাবে করে যেন থট রিডিঙের মাধ্যমে কথা চলে ওদের মাঝে।'

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।' অ্যাশট্রেতে সিগারেটের গোড়াটা টিপে নেভাল জোয়ালিন। 'বিপজ্জনক কাজ করে তো, সাবধান না থাকলে কবেই মরে যেত।' ঝট করে ডিনকে ওর দিকে তাকাতে দেখে চুপ হয়ে গেল জোয়ালিন। এক মুহূর্ত পরেই সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'এবার উঠে বাথরুমে ঢুকব। তুমি গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করো।'

'হ্যাঁ।' হাই উঠছিল, জোর করে মুখ বন্ধ রাখল ডিন। 'চেষ্টা করতে হবে না, বিছানায় পড়লেই শেষ। পারলে দুপুরে আমাকে ডেকে দিয়ো।'

'দেব। সোহানা আর রানা কখন ঘুমাবে?'

'কী জানি। হয়তো সন্ধ্যা থেকে ঘুম দেবে। রাত তিনটেয় শ্যাতোতে ঢোকার কথা। গুহাতেই ঘুমাবে ওরা। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ আর খাবার রেখে এসেছে গুহার ভেতর।'

এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে আবার মেলল জোয়ালিন।

'তোমার পকেট দাবাটা এনে ভাল করেছ, ডিন। আজ রাতেও বোধহয় ঘুমাতে পারব না। ওদের জন্যে চিন্তা হচ্ছে আমার।'

জানালার গায়ে একমাথা ঠেকানো লম্বা একটা টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে জো লুই। চোখ থেকে ফিল্ড গ্লাস নামিয়ে বিড়বিড় করল, 'ওস্তাদ লোক, কোনও সন্দেহ নেই! সাধে এত নাম করেনি ওরা।'

ক্লিঙ্গার বলল, 'এখনও দেখনি?'

'কোন চিহ্নই নেই।' টেবিল থেকে পিছলে নেমে জানালার কাছ থেকে সরে গেল জো লুই। 'অনেকভাবে দেখার চেষ্টা করছি গত দুইঘণ্টা ধরে।'

কিছু পড়ছিল টোপাক, মুখ তুলে বলল, 'হয়তো ওখানে নেই ওরা।'

'ওরা ওখানেই আছে।' মুচকি হাসল জো লুই। 'খুব সাবধানে চলাফেরা করছে, যাতে আমাদের চোখে না পড়ে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, লা লিওঁ রু-এ ওই দুজনকে কেন এনে ঢুকিয়েছে ওরা।'

বিশাল চোয়ালে মস্ত একটা থাবা বোলাল ক্লিঙ্গার। 'কখন ওরা ঢোকার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় তোমার?'

'রাতে। ওরা জানে, বেকায়দায় আছে সলীল সেন। যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারে। তাই সময় নষ্ট করতে চাইবে না ওরা।'

'ঠিকই বলেছ, আমারও তাই ধারণা। কিন্তু কথা হলো, কীভাবে ঢুকবে?'

শ্রাগ করল জো লুই। 'অনেকভাবেই ঢুকতে পারে, তবে কোনওদিক দিয়েই সুবিধে করতে পারবে না, আমরা তৈরি আছি, থাকব।' ঘড়ির দিকে তাকাল ও। 'জেনিরা শীঘ্রি ফিরে আসবে, তখন জানা যাবে সব।'

'হ্যাঁ।' ভ্রূকুটি করল ক্লিঙ্গার। গ্লাসে মদ ঢালছে। 'আমি ভাবছি, কোনপথে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে ওরা। সলীলকে কিডন্যাপ করতে যদি তোমাদের দেখেও থাকে, এই শ্যাতোতে এনেছি, এটা জানার কথা নয়। তাই না? বুঝল কী করে?'

'এই প্রশ্নের জবাব জানাটা জরুরি,' এমন ভঙ্গিতে বলল জো লুই, যেন মজা পাচ্ছে ও। 'তবে চিন্তা নেই। রানা আর সোহানার কাছ থেকে জেনে যাব।'

লা লিওঁ রু-এর ছোট্ট লাউঞ্জে বসা লেডি জোয়ালিন ও ডিন মার্টিন। এক ঘণ্টা আগে লাঞ্চ খেয়েছে, দুই বুড়ো ফরাসি ভদ্রলোকের ঝগড়া উপভোগ করতে করতে। এখন ওঁরা দুজন সরাইখানার পিছনের রোদেলা বারান্দায় বসে তাস খেলছেন।

কফি শেষ করে ডিনকে জিজ্ঞেস করল জোয়ালিন, 'আর কোনও ফ্লাইং কোম্পানিতে চাকরি নেবে না?'

'জানি না।' কাপের তলানির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল ডিন। 'এ নিয়ে তেমন ভাবছিও না। যে পাইলট তার প্লেনের যাত্রী খুন করে, তাকে চাকরি দেবে না কোনও এয়ারলাইন কোম্পানি। তুমি আমার ওড়ানো প্লেনে উঠবে কখনও?'

'তা উঠব। তুমি আসলে দুর্ভাগ্যের শিকার, ভাল কাজই তো করতে গিয়েছিলে। এয়ারলাইন কোম্পানিগুলো যদি এভাবে ভাবে, তা হলেই আর কোন সমস্যা নেই। আমেরিকায় আমার এক বোনজামাই আছে, আমি বললে তোমাকে সাহায্য করবে। অন্যান্য অনেক কোম্পানি সহ একটা এয়ারফ্রেইট কোম্পানিও আছে ওর।'

'থ্যাংক ইউ। ভেবে দেখব তোমার কথা।' মুখ তুলে জোয়ালিনের দিকে তাকাল ডিন। 'আচ্ছা, তোমার পায়ে কী হয়েছে?'

'অর্ধেকটা পা নেই,' জোয়ালিন বলল। 'এই যে, এটা। কয়েক বছর আগে গাড়ি-অ্যাক্সিডেন্টে খুইয়েছি।'

'সরি।' চোখ ডলল ডিন। কিছু বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল।

হাসল জোয়ালিন। 'কীভাবে ঘটেছে ঘটনাটা, সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিগত হলে থাক, জানতে চাই না...'

এই সময় হাজির হলো সরাইখানার মালিক। জোয়ালিনকে বলল, 'এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম। একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা এসেছেন। ফরাসি ভাষা বোঝেন না। কিছু বলতে চান। আপনি কি দয়া করে ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলবেন?'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল ডিন ও জোয়ালিন। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দুজনের। ভাবল, সোহানাদের খবর নিয়ে এসেছে কেউ।

উঠে দাঁড়াল জোয়ালিন, 'চলুন, দেখি।'

সরাইখানার ছোট্ট চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। গায়ে হালকা রঙের কোট, মাথায় জড়ানো স্কার্ফের নীচ থেকে সোনালি চুল উঁকি দিচ্ছে।

ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল জোয়ালিন, 'আপনি কিছু বলতে চান?'

স্বস্তির আলো ঝিলিক দিল মহিলার চোখে। 'ওহ্, লর্ড, আপনি মনে হচ্ছে স্কটিশ?'

'আপনিও তো স্কটিশ,' হাসল জোয়ালিন। 'কথার টানে ধরে ফেলেছেন নিশ্চয়? আপনার কোন সমস্যা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বেড়াতে এসেছি ফ্রান্সে। আমার ভাইয়ের মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় তেল ফুরিয়েছে। কয়েকশো গজ দূরে রেখে এসেছি গাড়িটা। দোষটা আমারই। যে গ্যারেজ থেকে গাড়ি ভাড়া করেছি, তারা পই-পই করে বলে দিয়েছিল, এ রকম দুর্গম জায়গায় চলার সময় যাতে বার বার ফিউয়েল-গজ চেক করি। কিন্তু মনে ছিল না।'

ডিন জানতে চাইল, 'শুধু তেলের কারণে গাড়ি অচল হয়েছে?'

'মনে হয় আরও কিছু সমস্যা হয়েছে। গাড়িতে ছোট একটা ক্যান ছিল। ট্যাংকে তেল ঢেলে স্টার্ট দিতে যেতেই কয়েকটা কাশি দিয়ে থেমে গেল। ভাইঝি

বলল কারবুরেটরে ময়লা ঢুকে থাকতে পারে। ব্যাটারিও বোধহয় উইক হয়ে গেছে। কী যে করি এখন বুঝতে পারছি না!'

'ওদিকে তো ছোট একটা গ্যারেজ আছে,' জোয়ালিন বলল। 'আসার সময় দেখলাম। ওখানে গেলেন না কেন?'

'গিয়েছিলাম। গ্যারেজের মেকানিক বাইরে গেছে। ওর স্ত্রী বলল, কখন ফিরবে ঠিক নেই।'

ডিন বলল, 'চিন্তা নেই। আমাদের গাড়িতে করে নিয়ে যেতে পারি আপনাকে। আপনাদের গাড়িটাকে টেনে আনতে পারি। পরে মেকানিক এসে ঠিক করে দেবে।'

'ওহ্, তা হলে তো খুবই ভাল হয়। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

জোয়ালিনের দিকে তাকাল ডিন। 'যাবে নাকি আমার সঙ্গে?'

'চলো, যাই। এখানেও তো বসেই থাকব।'

পাঁচ মিনিট পর, রাস্তাটা যেখানে একটা গভীর খাদে নেমে গেছে, সেখানে এসে একটা নীল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ডিন। সাদা পোশাক পরা সুন্দরী একটা অল্পবয়েসী মেয়ে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে ছিল। ওদের দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নীল গাড়িটার পাশে গাড়ি থামাল ডিন। দরজা খুলে নামতে যাবে, পিছনে অস্ফুট একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথাটা বাঁকা হয়ে রয়েছে জোয়ালিনের। ওর পাশে বসা স্কটিশ মহিলা কঠিন স্বরে বলল, 'যেখানে আছেন, বসে থাকুন, মিস্টার মার্টিন।' জোয়ালিনের চুল ধরে টেনে ওকে ছাতের দিকে চাইতে বাধ্য করল মহিলা, গলাটা ঠেলে বেরোল সামনের দিকে। ডিন দেখল, মহিলার অন্য হাতের ঝকঝকে ছুরির ফলাটা চেপে বসেছে জোয়ালিনের গলায়। মহিলা বলল, 'শুধু একটা টান দেব, মিস্টার মার্টিন, শেষ হয়ে যাবে আপনার বান্ধবী।'

ডিনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল অল্পবয়েসী মেয়েটা। খিলখিল করে হেসে বলল, 'ভুল করবেন না, মিস্টার মার্টিন। বড় নিষ্ঠুর মেয়েলোক! ও যা বলছে, তা-ই করবে!'

'গাড়িতে ওঠো, জেনি,' স্কটিশ মহিলা বলল। 'বেশি জোরে চালাবে না। মিস্টার মার্টিন, আপনি ওর গাড়ির ঠিক পিছন পিছন চালাবেন। কোনও চালাকির চেষ্টা করবেন না। এই যে দেখুন, ছুরিটা কোথায় ধরেছি। ওই যে বললাম, ছোট্ট একটা টান দেব, আপনার বান্ধবী শেষ। দুই-এক মাইল গিয়েই থামব আমরা। তারপর আপনাদের গাড়িটা ফেলে রেখে আমাদেরটায় করে যাব সবাই। জেনিকেও ছোট করে দেখবেন না। ওর হাতব্যাগে একটা পিস্তল আছে, সাইলেন্সার লাগানো। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে ডিনের। দুইলে রাখা হাত দুটো কাঁপছে। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল। নীল গাড়িতে উঠতে দেখল জেনিকে। চলতে শুরু করল গাড়িটা। আরেকবার জোয়ালিনের দিকে ফিরে তাকাল ডিন, গলায় চেপে বসা ছুরিটা দেখল, তারপর ধীর ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে চালাতে শুরু করল। লাফ দিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল দুই জঙ্গির চেহারা। প্রায় সেই একই ধরনের পরিস্থিতি

এবারও। নিজেকে সাবধান করল ডিন, *খবরদার, এবার আর কোন বোকামি করতে যেয়ো না! তা হলে, জোয়ালিনের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হতে হবে তোমাকে!*

পঞ্চাশ মিনিট পর, গাড়ির মেঝেতে পাতা রাবার-ম্যাটের উপর মুখোমুখি পড়ে আছে জোয়ালিন ও ডিন কাত হয়ে। দুজনেরই দুই হাত অপরজনের গায়ের ওপর দিয়ে পরস্পরের পিঠের পিছনে নিয়ে গিয়ে হাতকড়া লাগানো হয়েছে। জানালা দিয়ে শ্যাতো চোখে পড়ল ডিনের। লম্বা ঢালের উপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা, উপত্যকা থেকে এঁকেবেঁকে উঠে আসা ধুলোয় ধূসর রাস্তাটার কিনারে। গাড়ি চালাচ্ছে এখন স্কটিশ মহিলা। একঘেয়ে কণ্ঠে অনর্গল বকে যাচ্ছে, লেস বোনা শেখাচ্ছে পাশে বসা জেনিকে। কোনও কথা বলছে না মেয়েটা। লেস বোনায় ওর কোনওরকম আগ্রহ আছে বলেও মনে হচ্ছে না।

ডিন ভাবছে, কোথাও লুকিয়ে থেকে নিশ্চয় এখন গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা ও সোহানা। শ্যাতো থেকে গাড়িটাকে বেরোতে দেখেছিল নিশ্চয়, এখন ফিরতে দেখছে। ওরা যদি ফিল্ড-গ্লাস ব্যবহার করে থাকে, মেঝেতে পড়ে থাকা ডিন ও জোয়ালিনকে দেখে...

বেকায়দা অবস্থায় পড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওর। জোয়ালিনের দেহের চাপ লাগছে হাতে। শোলডার জয়েন্টের কাছে প্রচণ্ড ব্যথা লাগছে। মাথা উঁচু করে কাঁধ তুলে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করল। সাথে সাথে হুমকি দিল জেনি, 'আরেকবার মাথা তুললে তোমাকে আমি কী করব জানো, ডিন?' রিয়ার ভিউ মিররে জেনির চোখ দুটো ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল ডিন। এমনভাবে বাঁকিয়ে নিয়েছে, যাতে মেঝেতে ফেলে রাখা দুই বন্দির ওপর সারাক্ষণ নজর রাখতে পারে। এত সুন্দর একটা কচি মুখে জ্বলন্ত চোখ দুটো বড় বেমানান লাগল ডিনের কাছে। মনে হলো, ওদের কষ্ট দেখে মজা পাচ্ছে। নরক থেকে উঠে আসা বাচ্চা কোনও শয়তানের চোখ যেন।

জেনি বলল, 'গাড়ি থামিয়ে নেমে আসব। তারপর একটা পিয়ানোর তার তোমার বান্ধবীর গলায় পেঁচিয়ে এমন জোরে টানতে শুরু করব, প্রথমে জিভটা বেরিয়ে আসবে, তারপর দাঁত বসে যাবে জিভের ওপর, তারপর...' খিলখিল করে শয়তানি হাসি হাসল ও। 'গাড়িটা একটু থামাও না, মেরি। মজা দেখি। ফিরে গিয়ে বলব, চেঁচানো শুরু করেছিল, তাই থামিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখিনি।'

'না, জেনি,' শান্তকণ্ঠে বলল মেরি, 'বসের কাছে মিথ্যে বলতে পারব না আমি। ওদেরকে সুস্থ দেহে তুলে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে আমাদের। লাশ নিয়ে গেলে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমাদেরকে জো লুই-এর হাতে তুলে দেবে।'

'ধুর, কিছুই করতে পারছি না!' ভোঁতা স্বরে বলল জেনি। 'এভাবে চুপচাপ বসে থাকায় কোনও মজা আছে নাকি?'

তাড়াতাড়ি মাথাটা আবার নামিয়ে নিয়েছে ডিন, প্রচণ্ড আতঙ্কে। জোয়ালিনের মুখটা ওর মুখের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে। ওর মুখও ফ্যাকাসে, কঠিন হয়ে গেছে চোয়াল, দুই চোখে আগুন। ডিনের গালে ঠোঁট ছোঁয়াল ও।

মুখটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'চুপ করে থাকো, ডিন।'

কণ্ঠটাতে সাহস জোগানোর মত কিছু নেই। শুনে ডিনের মনে হলো, গিলোটিনে চড়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন ওদের।

নয়

ঘুম ভাঙল রানার। ঘন অন্ধকারে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ পড়ে রইল ও। ওর পাশে সোহানাও নড়েচড়ে উঠল। 'দুটো বাজে নাকি?'

'বাজার তো কথা। দাঁড়াও, দেখি।' ঘড়িতে পেন্সিল টর্চের আলো ফেলল রানা। 'পাঁচ মিনিট আছে। ল্যাম্পটা জ্বালো, সোহানা।'

উঠে বসল ও। টর্চের আলোটা ধরে রাখল প্রেশার ল্যাম্পের ওপর। জ্বালল সোহানা। গুহামুখের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ ভিতরে রয়েছে ওরা। চওড়া এক টুকরো সমতল শুকনো পাথরের ওপর। ডেনিম শার্ট আর স্ল্যাকসের নীচে উলের আঁটো পোশাক পরা আছে দুজনেরই। তারপরেও স্লিপিং ব্যাগের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডা লাগছে।

জ্যাকেট গায়ে দিল ওরা। কমব্যাট বুট পরল। নাইলনের ওভারঅল গায়ে চড়াল। স্লিপিং ব্যাগ দুটোকে গোল করে গুটিয়ে ঢুকিয়ে রাখল দেয়ালের ফাটলে। শোল্ডার-স্ট্র্যাপ লাগানো লম্বা একটা ক্যানভাসের ব্যাগে হাত রেখে সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'রাইফেল নেব?'

এক মুহূর্ত ভেবে মাথা নাড়ল রানা। 'নাহ্, অকারণ বোঝা বাড়ানো। কোনও কাজে আসবে না। বরং একটা ছুরি নাও।' ওয়ালথার পিপিকে সহ হোলস্টারটা উরুতে বাঁধল, এমন জায়গায়, যাতে প্রয়োজন পড়লে মুহূর্তে টান দিয়ে তুলে আনতে পারে।

পেট ফোলা একটা হ্যাভারস্যাক আর দুটো রাইফেল স্লিপিং ব্যাগের সঙ্গে ফাটলে ঢোকাল ও। ঘড়ি দেখে বলল, 'দুটো পনেরো।'

'হুঁ।' রাকস্যাকটা তুলে পিঠে বাঁধল সোহানা। তারপর পা বাড়াল দুজনে ল্যানসিউ কেইভের ভিতর। প্লাস্টিক হেলমেটের কপালে লাগানো বাতি থেকে আলো পড়ছে সামনে, এগিয়ে চলেছে ওদের সঙ্গে। বাড়তি আলোর জন্য প্রেশার ল্যাম্পটা হাতে নিয়েছে সোহানা। যতই ভিতরে ঢুকছে, ঠাণ্ডা আরও বাড়ছে।

আগে আগে চলেছে রানা। পথ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না, ভালমত চিনিয়ে দিয়ে গেছে ডিন। কখনও সরু সুড়ঙ্গ ধরে চলছে ওরা, কখনও দুদিকে দেয়াল সরে গিয়ে চওড়া হয়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে পাথুরে মেঝে এবড়ো-খেবড়ো, উঁচুনিচু, যেখানে-সেখানে গর্ত; একটু অসাবধান হলেই বিপদ ঘটবে। নীরবে ওত পেতে রয়েছে যেন ভয়াল কোনও আদিম জন্তু, ওটার শান্তিভঙ্গকারী দুটো খুদে প্রাণীকে গিলে খাওয়ার জন্য। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অনেকগুলো তুষার যুগ পেরিয়েও একই অবস্থায় রয়ে গেছে গুহাটা।

পনেরো ফুট গভীর একটা গর্তের ঢালু পাড় বেয়ে নেমে আবার ওপার থেকে একই রকম ঢাল বেয়ে উঠল ওরা। গর্তটার একধার দিয়ে বইছে একটা অগভীর নালা। ওপরে উঠে মস্ত একটা স্ট্যালাকটাইট চেম্বারে ঢুকল। ওটার কারুকার্য এতই সুন্দর, মানুষের তৈরি সবচেয়ে নিখুঁত স্থাপত্যশিল্পকেও যেন বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। চুনাপাথরের রূপালি ওই অদ্ভুত সুন্দর, বিচিত্র দণ্ডগুলো বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছাতে বহু সময় লাগিয়েছে, তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে আদিম মানুষের পাথরের অস্ত্র বানানোরও আগে থেকে। গুহার ছাতটা সত্তর ফুট ওপরে। ওপর থেকে ঝুলে থাকা স্ট্যালাকটাইটগুলো ছোট, বড়টাও একহাতের বেশি না। দেয়ালগুলোকে দেখতে লাগছে কোঁচকানো পর্দার মত। গোড়ায় জমে থাকা শক্ত চুনাপাথরের স্তূপ বাতির আলোয় চমকাচ্ছে। মেঝে থেকে কোনও স্ট্যালাগমাইট ওঠেনি উপরে।

মেঝেকে দুই ভাগ করে দিয়েছে হ্রদটা। অতল গভীর, তেইশ ফুট চওড়া। দু'দিকের দেয়াল ছুঁয়ে আছে। পাথরের পাড় ঢালু হয়ে না নেমে আঠারো ইঞ্চি নীচ থেকে ঝপ করে খাড়া নেমে গেছে কুয়ার মত। একেবারেই ঢেউহীন, নিথর পানি।

খুদে রবারের একটা ডিঙি ফুলিয়ে তৈরি করে লুকিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছিল দেয়ালের একটা গর্তের ভিতর। ওটাকে টেনে বের করে এনে পানিতে নামাল রানা। ওটাতে চড়ে হাতদুটোকে বৈঠার মত ব্যবহার করে বেয়ে চলল অন্যপারে। ডিঙিতে বাঁধা নাইলনের দড়ির এক মাথা ধরে তীরে দাঁড়িয়ে রইল সোহানা। ওপারে গিয়ে ডিঙি থেকে নামল রানা। দড়ি ধরে ডিঙিটা টেনে এনে সোহানাও তাতে চড়ে রানার মত একইভাবে এসে পৌঁছল। একটা পাথরের স্তূপের ওপাশে ডিঙিটা লুকিয়ে রাখল রানা। চলে এল দেয়ালের কাছে।

তিনটে ফাটল আছে এই দেয়ালে। ডানপাশের সবচেয়ে সরু ফাটলটায় ঢুকল রানা। পিছনে সোহানা। হামাগুড়ি দিয়ে পেরোতে হলো প্রায় আশি গজ। ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে পথ। বেরিয়ে এল আরেকটা গুহায়। ডিনের সঙ্গে এসে এখানে একটা খাটো, অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি শক্ত মই রেখে গিয়েছিল রানা। সেটা তুলে নিয়ে পাথরের ঢাল বেয়ে কোনাকুনি ওপরে উঠে চলল। ঢালের মাঝ বরাবর বইছে সরু জলধারা।

পিচ্ছিল পথ। পা ফসকালে নীচে পড়ে হাত-পা ভাঙার ভয়। খুব সাবধানে ছাতের কাছে চলে এল ওরা। সামনে চার ফুট দূরে এক মানুষ সমান উঁচুতে ইঁট-সুড়কি দিয়ে তৈরি জিনিসটা দেখতে মস্ত একটা লেটার বক্সের মত। ওটার নীচের দিকে একটা ফোকর, কোনও গ্রিল নেই, পুরানো, মরচে পড়া তিনটে খাটো সিক রয়েছে কেবল।

বক্সের ফোকরের গায়ে মই ঠেকিয়ে ফোকরটার কাছে পৌঁছল রানা। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়েই এসেছে। কাটতে বেশিক্ষণ লাগল না। নেমে এল নীচে। টেনে লম্বা করল মইটা। আবার ফোকরের ভিতরে ঢুকিয়ে বেয়ে উঠে গেল। ওপরে যাওয়ার আগে সোহানার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে ঢুকে গেল ভিতরে।

মইয়ের শেষ ধাপে এসে ওপরে দুই হাত বাড়িয়ে দিল ও। বাক্সের দুই কিনার ধরে দোল দিয়ে উঠে গেল উপরে। একটা ঘরে পৌঁছেচে। পাথরে তৈরি

দেয়াল। মাটির নীচের ঘর। এতই বড়, ওখান থেকে ওর হেলমেটের আলো শেষ প্রান্তে পৌঁছল না। ওঅর্কশপ হিসেবে ব্যবহার করেছে এটাকে জার্মানরা. মস্ত কাঠের বেঞ্চের মাথায় ভাইস লাগানো দেখেই অনুমান করা গেল। একপাশের দেয়ালে যন্ত্রপাতি রাখার বেশ কিছু তাক, তবে সেগুলোতে কোন যন্ত্র আর নেই এখন। বেঞ্চের নীচে মরচে পড়া জেরিক্যান, মদের বোতল, রঙ আর গ্রিজের টিন ছাড়াও নানান আবর্জনা পড়ে আছে। বেঞ্চের উপরের ছাত থেকে ঝুলছে লম্বা তারে ঝোলানো দুটো বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্। জ্বলছে না।

মইয়ের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে সোহানা। ফোকরের ভিতর থেকে মাথা তুলতে যাবে, এমন সময় সেলারের আলো জ্বলে উঠল। সামান্য মাথা উঁচু করে চোখ দুটো শুধু ফোকরের বাইরে এনে তাকিয়ে দেখল ও, কাছের থামটার কাছ থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এসেছে দৈত্যাকার, সোনালি দাড়িওয়ালা একজন লোক। গায়ে কালো ব্লেজার। হাতের লণ্ঠনটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে এগোতে দেখল রানাকে। হাসিটা লেগেই রয়েছে দৈত্যটার মুখে, হাতে কোন অস্ত্র নেই। একা।

অনায়াসে ঠেকিয়ে দিল লোকটা রানার পর পর চারটে প্রচণ্ড আঘাত। পঞ্চম আঘাতটা লাগল ওর হাঁটুর উপর, প্রাণপণে লাথি হাঁকিয়েছে রানা পড়ে গেল লোকটা, কিন্তু হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তে।

ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল সোহানা। লোকটার চোখে পড়তে চায় না। মৃদু একটা আঘাতের শব্দ কানে এল ওর, তারপর ভারি একটা দেহ মেঝেতে গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

রানা লোকটাকে কাবু করে ফেলেছে ভেবে আবার মাথা তুলল সোহানা। 'ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে...' বলতে শুরু করেও থেমে গেল ও। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে দেখল, ধুলোয় ঢাকা মেঝেতে পড়ে রয়েছে রানা, হেলমেটটা খুলে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাথার কাছে। একটা পা উঁচু করেছে দাড়িওয়ালা দৈত্যটা, রানার বুক সই করে লাথি মারার জন্য।

ভাবনার সময় নেই। আছড়ে-পাছড়ে মই বেয়ে উঠে এল সোহানা। রানাকে লাথি মারার আগেই লাফ দিয়ে প্রায় উড়ে চলে গেল লোকটার কাছে। ওর এক পায়ের কারাতে কিক দৈত্যটার বুকের একপাশে লেগে পিছলে বেরিয়ে গেল। পরনের ভারি পোশাক ক্ষিপ্রতা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে সোহানার। ওর লাথিতে কিছুই হলো না দৈত্যের, চোখের পলকে পাশে সরে গিয়ে ডান হাতের এক পাশ দিয়ে কোপ চালাল।

ওর কব্জি ধরে ফেলে প্রচণ্ড আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাল সোহানা, একই সঙ্গে সাইড-কিক মারল লোকটার হাঁটু লক্ষ্য করে। লাগাতে পারল না, তার আগেই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পা সরিয়ে নিয়েছে দাড়িওয়ালা, পরক্ষণে সেই একই পা সোজা করে তুলে ঘুরিয়ে লাথি মারল সোহানার মাথায়। ভয়ানক আঘাতে যেন হাজারটা তারা বিস্ফোরিত হলো সোহানার চোখের সামনে। ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল ওর দেহটা। জুজিৎসুর কায়দায় হাতটা আগেই ছাড়িয়ে নিয়েছে দৈত্য। চিত হয়ে পড়তে পড়তে এক পা তুলে আবার লাথি মারার চেষ্টা করল সোহানা। কিন্তু মাথার আঘাত ওকে টলিয়ে দিয়েছে, লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারল না। ওর পিছনেই

রয়েছে একটা ভাইস লাগানো বেঞ্চ, চিত হয়ে পড়ল ওটার উপর।

তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল কাঁধে। প্রায় অবশ করে দিল জায়গাটা। বেঞ্চ ধরে পতন রোধ করার চেষ্টা চালাল ও। চোখের সামনে সাঁতরে বেড়ানো দৈত্যাকার অবয়বটাকে লক্ষ্য করে দুর্বল পায়ে লাথি মারতে গেল আবার। খুব সহজেই পা দিয়ে ওর লাথিকে ঠেকিয়ে দিল দাড়িওয়ালা লোকটা। তারপর কানের কাছে, চোয়ালে কারাতে কোপ মারল হাতের কিনারা দিয়ে।

মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সোহানা। নড়ল না আর। পড়ে রইল নিথর হয়ে।

সেলারের গভীরে যেখানে আলো ঢুকতে পারছে না, ছায়া ছায়া সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জো লুই বলল, 'কাজ হয়ে গেছে, বস্।'

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল ক্লিঙ্গার, পাশে হুয়ান ক্যাসটিলো। হুয়ানের হাতে একটা মেশিন পিস্তল। রানার ওপর ঝুঁকল জো লুই। বুড়ো আঙুল দিয়ে এক চোখের পাতা সরিয়ে দেখল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ক্লিঙ্গার বলল, 'ওদের বাঁচিয়ে রাখতে বলেছিলাম তোমাকে, মিস্টার জো লুই।'

'বেঁচে তো আছেই, সুস্থও আছে,' উল্লসিত কণ্ঠে বলল জো লুই। সোহানার দিকে তাকাল। 'তবে ওর সামান্য জখম হয়েছে। ভাইসের ওপর পড়ে গিয়েছিল।'

দাঁত বের করে হাসল ক্লিঙ্গার। হাঙরের মত দেখাল মুখটা। 'তাতে কোন অসুবিধে নেই আমার।'

'কিন্তু আমার আছে,' দাড়ি চুলকাল জো লুই। 'সারপ্রাইজ এলিমেন্ট ছাড়া পরে জিমনেশিয়ামে ওর সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলার ইচ্ছে ছিল। দেখতে চেয়েছিলাম, কতটা ভাল ও।'

'কী আর দেখবে! মুহূর্তেই তো চিত করে দিলে দুজনকে।'

হাসি মিটমিট করছে জো লুই-এর চোখে। 'ওদের অজান্তে চিত করেছি, কোন সুযোগই দিইনি। তবে এটাকে জয় বলে না। হতচকিত অবস্থায় কাবু করেছি ওদের দুজনকেই। আমার লেভেলের একজন ফাইটারের সঙ্গে পারবে কী করে?' হাসিটা বাড়ল ওর। 'আসলে, আমার লেভেলের আর একজন ফাইটারও নেই দুনিয়ায়। তবে মাসুদ রানার নাম আমি আগেও শুনেছি। লোকটা চৌকশ—হরেক রকম বিদ্যে নাকি আছে পেটে, এক কথায় দুর্দমনীয়। ওর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছে ছিল আমার।'

সোহানার দিকে তাকাল ও। 'একেও খাটো করে দেখা উচিত নয়। রোজারদের যেভাবে পিটিয়েছে, তাতেই বোঝা যায় এ-ও উঁচুদরের ফাইটার। কাঁধের হাড় যদি না ভেঙে থাকে, তা হলে কতটা ভাল, সেটা দেখারও ইচ্ছে আছে আমার।'

পকেট থেকে সিগার বের করল ক্লিঙ্গার। 'ওর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে তোমাকে সময় দিতে পারি, মিস্টার জো লুই। তবে, মনে রাখবে, এরা দুজন কিন্তু সলীল সেনের চেয়েও অনেক মূল্যবান। অনেক বেশি তথ্য রয়েছে এদের পেটে। ভাগ্যক্রমে আমাদের জালে যখন জড়িয়েই গেছে, যতটা পারা যায় রস বের করে নেব আমরা ওদের চিপে। কী বললাম, বুঝতে পেরেছ? ওদের নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার

আগে অবশ্য ডিন মার্টিন আর আর ওই মেয়েটার ওপর তোমার হাত মকশো করতে পারো।'

'থ্যাংক ইউ, বস,' বিকৃত হাসিতে জ্বলজ্বল করছে জো লুই-এর চোখ-মুখ। 'হাতের কাছে প্র্যাকটিস করার মত প্রচুর মালমশলা থাকলে বড় আনন্দ লাগে—আর' সে মালমশলাগুলো যদি মাসুদ রানা আর সোহানা চৌধুরীর সমমানের হয়।'

ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে খুলে গেল সেলারের দরজা। সিঁড়ির মাথায় টোপাককে দেখা গেল। ঘরের পরিস্থিতি দেখে স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল চেহারায়। জিজ্ঞেস করল, 'সব ঠিক আছে?'

সিগারের মাথায় জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরল ক্লিঙ্গার, 'তুমি কী ভেবেছিলে? সিরিঞ্জ নিয়ে এসেছ? গুড। এখন যা বলি, মন দিয়ে শোনো।' সিগারের জ্বলন্ত মাথা দিয়ে রানা ও সোহানাকে দেখাল ও। 'এই দুজনকে কয়েক ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা করো। তোমার কাজ শেষ হলে মিস্টার জো লুই ওদেরকে ওপরে নিয়ে যাবে। ওদের দেহতল্লাশি করা হবে। জেনি খুব ভাল পারে। ওকে দিয়েই করাতে হবে কাজটা।'

টোপাক জিজ্ঞেস করল, 'কাজ শেষ হলে কোথায় নিয়ে রাখব ওদের? শক্ত দরজা আর ভাল তালাওয়ালা ঘর তো আছে মাত্র দুটো।' রানার ওপর ঝুঁকে বসল ও। চ্যাপ্টা একটা ছোট বাক্স থেকে সিরিঞ্জ আর ওষুধের অ্যামপিউল বের করল।'

ক্লিঙ্গার জিজ্ঞেস করল, 'এদের দুজনকে একসঙ্গে রাখা ঠিক হবে না, আলাদা জায়গায় রাখতে হবে। সলীলকে গর্তে রাখা হয়েছে কতক্ষণ?'

মুখ তুলে তাকাল টোপাক। 'তিরিশ ঘণ্টার বেশি।'

'ঠিক আছে। ওকে তুলে এনে, সাফসুতরো করে, ভাল পোশাক পরাবে। তারপর এই মেয়েটাকে রাখবে ডিন আর জোয়ালিনের সঙ্গে, আর মাসুদ রানাকে সলীলের সঙ্গে।' এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবল ও। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই ঠিক হবে। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা এদের ওপর কাজ করবে ভাল। কিছু সময় ওদের চিন্তায় রাখব আমরা। কী করতে চাই, কিছুই বুঝতে দেব না। শক্ত কিছু করার আগে সময় আর অস্থির স্নায়ু কতখানি চাপ সৃষ্টি করে, দেখতে চাই।'

রানাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে উঠে দাঁড়াল টোপাক, সোহানার দিকে এগোল।

টোপাকের হাতের সিরিঞ্জের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লিঙ্গার। সুচটা সোহানার বাহুতে ঢুকল। 'খুব ধীরে,' আনমনে বিড়বিড় করল ক্লিঙ্গার, 'মেয়েগুলোকে যদি রানা আর সলীলের সামনে প্রচণ্ড কষ্ট দিতে থাকি, ভাঙতে বাধ্য হবে ওরা। আবার রানা ও সলিলকে সোহানার সামনে কষ্ট দিলে সে-ও মুখ না খুলে পারবে না। খুবই কঠিন মানুষ এরা, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সবারই একটা ব্রেকিং পয়েন্ট আছে। ওরা হাইলি সেনযিটিভ, একজন আরেকজনের কষ্ট দেখে সইতে পারবে না।'

'শেষ পর্যন্ত সবগুলোকেই মরতে হবে, সলীলকেও,' জো লুই বলল। 'কোন্‌টাকে আগে শেষ করতে বলেন, বস্? মানে, যখন, মেরে ফেলার সময়

হবে?'

ভুঁড়ির ঢালে হাত রাখল ক্লিঙ্গার। ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর হাসিতে ছড়িয়ে গেল হাঙরমুখের দুই কোণা। পাথুরে দৃষ্টিতে মিটিমিটি হাসি। 'সেটা বরং এমিলির ওপর ছেড়ে দেয়া যাক। ও খুব খুশি হবে।'

ঘণ্টাখানেক পর। মস্ত যে বেডরুমটায় মেরির সঙ্গে থাকে জেনি, সেটাতে নিজের খাটের ওপর বসে অলস ভঙ্গিতে দুই ফুট লম্বা তারটা দোলাচ্ছে ও। তারের দুই মাথায় দুটো কাঠের বল লাগানো। একটা বল ডান হাতে ধরে ঝাঁকি দিয়ে খাটের একটা খুঁটির গায়ে তারটা পেঁচিয়ে খপ্ করে বাম হাতে ধরল দ্বিতীয় বলটা। দুটো বল দুই দিকে টানছে জেনি।

'ওই মাসুদ রানা লোকটাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে,' বলল ও। 'সবগুলোর মধ্যে ওটাই আমার মতে সেরা।'

লেস বুনতে বুনতে মুখ তুলে তাকাল মেরি। দেখল, হাতল ধরে খাটের খুঁটিতে তারটা টান টান করে টেনে রেখেছে জেনি। 'কেন পছন্দ? প্রেম করার জন্যে?'

'আরে নাহ্।' হাসল জেনি। 'শক্তিশালী মানুষের গলায় তার পেঁচানোর আনন্দই আলাদা। অনেক বেশি ছটফট করে ওরা, কিন্তু গলাকাটা মুরগির মত নাচানাচি ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। যত যা-ই হোক, একবার যদি মেরুদণ্ডে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরতে পারি, কার সাধ্য ছোটে। পয়েন্ট ক্লেয়ারের সেই দৈত্যের মত নিগ্রোটার কথা মনে আছে...'

'না, ওসব মনে রাখতে ভাল লাগে না আমার, জেনি,' বিরক্তিতে নাক কুঁচকাল মেরি। 'প্রয়োজনের খাতিরে যেসব অপ্রিয় কাজ করি, পরে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা আমার মোটেও পছন্দ না।'

তারটা খুলে নিয়ে আবার খুঁটিতে পেঁচাল জেনি। 'আমি কিন্তু এর মধ্যে খারাপ লাগার কিছু দেখি না।'

'একেক মানুষের একেক স্বভাব—যাকগে, ও নিয়ে আর তর্ক করতে চাই না। এখন বলো তো, যাদের ধরে আনা হয়েছে, আমাদের সেই বন্দিদের জন্যে কী করার পরিকল্পনা নিয়েছেন বস?'

মুখ গোমড়া করে মেরির দিকে তাকাল জেনি। 'কী আর করবে, হতভাগা ওই মিস্টার জো লুইটার বিকৃত রুচি পূরণের জন্যে রসদ সরবরাহ করবে। অথচ আমার হাতে দেবে শুধু ওই লেংড়িটাকে, আমি জানি।' ওর ধোঁয়াটে চোখে মৃদু আলো ঝিলিক দিল। 'ওই মরাটাকে মারতে কারও ভাল লাগে, বলো? তা ছাড়া ও তোমার দেশী মেয়ে, স্কচ, মারতে গেলে মনে হবে বুঝি তোমার গলাতেই তার পেঁচাচ্ছি।'

'স্কচ না, জেনি, কতবার বলব তোমাকে, শব্দটা হবে স্কটিশ। যাকগে, মারার কথা বলছি না আমি, আমি বলতে চাইছি বস ওদের কীভাবে ব্যবহার করবেন।'

'চিপে চিপে রস বের করে নেবে, আর কী?'

'তা তো জানি। কিন্তু কীভাবে?'

'ওই ভুঁড়িয়াল সলীলটার মতই আটকে রেখে প্রথমে প্রচুর কষ্ট দেবে, তারপর একজনের সামনে আরেকজনকে নির্যাতন করে মানসিক যন্ত্রণা দেবে। ধীরে ধীরে চাপ বাড়িয়ে মুখ খুলতে বাধ্য করবে ওদের।'

মাথা ঝাঁকাল মেরি। সবজান্তার ভঙ্গিতে ঠোঁট কোঁচকাল। 'যা-ই বলো, পুরুষমানুষ যে কজনকে ধরে আনা হয়েছে ওরা সবাই ভদ্রলোক। ওদের সামনে মেয়েগুলোকে নির্যাতন করলে সইতে পারবে না। আর সেটা করেই কথা আদায়ের চেষ্টা করবে মিস্টার জো লুই। তবে বেশি তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেললে আমার ভাল লাগবে না।' লেসটা জেনির দিকে তুলে ধরল ও। 'দেখো তো কেমন হলো? ভাল, তাই না?'

দশ

হুঁশ ফিরলে সোহানার প্রথম অনুভূতিটাই হলো, ব্যথা। পুরো বাঁ কাঁধ সহ পিঠটা দপ্ দপ্ করছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্তন না করে চুপচাপ পড়ে থাকল ও।

সেলারের কথা ভাবছে। রানা বেহুঁশ। সোনালি দাড়িওয়ালা লোকটার দেঁতো হাসি। ওস্তাদ লোক। অবিশ্বাস্য। চোখের পলকে সামনে এসে এত দ্রুত কাজ সেরে ফেলল, বাধা দেবার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি সোহানা... পড়ে যাচ্ছে, মনে আছে। তারপর কাঁধে তীক্ষ্ণ ব্যথা।

আর এখন? পাতলা একটা মাদুরের ওপর পড়ে আছে। নীচে শক্ত মেঝে।

একা? না। আশপাশে মৃদু নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। কাপড়ের খসখস। নিঃশ্বাসের শব্দ। ভোঁতাস্বরে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'কটা বাজে?'

ডিনের গলা।

চোখ মেলছে সোহানা, কানে এল জোয়ালিনের কণ্ঠ, 'জানি না। আমার ঘড়িসহ সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গেছে ওরা। দুপুর হয়েছে, যা মনে হয়।' দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে ডিনের পাশে আরেকটা মাদুরে বসে আছে ও। লম্বা, সরু সেলের মত ঘরটার এককোণে জোয়ালিনের দিকে মুখ করে বসেছে ডিন। দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

হঠাৎ সোহানার দিকে তাকিয়েই ভুরু উঁচু করে ফেলল জোয়ালিন। তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা বলতে বারণ করল সোহানা। ব্যথায় কেঁপে উঠল জোয়ালিন। হাত সরিয়ে নিয়ে ওর নীচের ঠোঁটে রক্ত দেখল সোহানা। হাত নেড়ে ডিনকেও কথা না বলার ইশারা করল।

যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গিতে উঠে বসল সোহানা। দেখল, নাইলনের ওভারঅল আর জ্যাকেটটা গায়ে নেই। ছুরিটাও গায়েব। শার্টটা ঝুলে রয়েছে। কমব্যাট বুটের ফিতে খোলা। সোহানা বুঝল, খুব ভালমত দক্ষ হাতে ওর সারা দেহ তল্লাশি করা হয়েছে।

জোয়ালিন আর ডিন, ওদেরকেও নিয়ে আসা হয়েছে শ্যাতো ল্যানসিউতে।

অবাক হয়েছে, এটা ওদের বুঝতে দিল না সোহানা। ভরসা দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। উঠে দাঁড়াল। কোমরের বেল্ট খুলল। বাঁ হাতটা উঁচু করে সাবধানে ধীরে ধীরে পিছনে নিয়ে এল। প্রচণ্ড ব্যথা লাগল। শক্ত হয়ে আছে। হাড় ভাঙেনি, তবে খুব খারাপভাবে জখম হয়েছে মাংসপেশী। ব্যথা পেলেও হাত নাড়াতে পারছে।

বেশি পাওয়ারের অতি উজ্জ্বল একটা বাল্‌ব্ ছয় ইঞ্চি তারের মাথায় ঝুলছে ছাত থেকে। সেলের ভিতর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল ও। দেয়াল ও ছাতের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখল। তারপর মেঝে আর দরজা পরীক্ষা করল। দরজাটা খুবই ভারি, কী-হোলটাও অতিরিক্ত বড়। পাল্লাটা বাইরের দিকে খোলে। বাইরে থেকে পাল্লায় লোহার দণ্ডও লাগিয়ে রাখা হতে পারে, বোঝা যাচ্ছে না।

সেলের ভিতরে কোন 'ছারপোকা' নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো, বাইরে দরজার গায়ে হয়তো ক্লিপ দিয়ে আটকানো থাকতে পারে। সারা ঘরটা দেখতে দশ মিনিট লাগল ওর। এ সময়টাতে একটুও নড়েনি ডিন কিংবা জোয়ালিন, শুধু চুপচাপ তাকিয়ে থেকেছে সোহানার দিকে।

জোয়ালিনের পাশে বসে ওর হাতটা তুলে নিল সোহানা। ডিনকে ইশারা করল কাছে এসে বসার জন্য। মাদুর থেকে উঠে দাঁড়াল ডিন। চোখ জ্বোরো রোগীর মত লাল। মুখ ফ্যাকাসে। গালের পেশি কাঁপছে থেকে থেকে।

সোহানা বলল, 'লুকানো মাইক্রোফোন নেই, তবু আস্তে কথা বলো।' জোয়ালিনের দিকে তাকাল ও। 'তোমার ধারণা, দুপুর?'

'হ্যাঁ।' জোয়ালিনের হাতও কাঁপছে। সে-ও আঁকড়ে ধরেছে সোহানার হাত। 'কয়েক ঘণ্টা আগে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে।'

'রানা কোথায়?'

'অন্য সেলে, মনে হয় সলীলের সঙ্গে। তোমাকে এখানে রেখে যাবার সময় ওদের কথা থেকে বুঝেছি।'

স্বস্তিতে বুকের চাপটা কমে গেল সোহানার। আস্তে করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। 'তোমাকে কখন আনল, জোয়ালিন?'

'গতকাল। লা লিওঁ রু-এ লাঞ্চের পর একটা মেয়েলোক এসেছিল, স্কটল্যাণ্ডে বাড়ি...' যা যা ঘটেছে, সোহানাকে খুলে বলল জোয়ালিন। স্বর নামিয়ে কথা বলছে, কিন্তু উত্তেজনা চাপা দিতে পারছে না, হাতের কাঁপুনিই সেটা প্রকাশ করে দিচ্ছে। 'সরি, সোহানা। স্রেফ বোকার মত হেঁটে গিয়ে ধরা দিয়েছি। আমরা...আসলে...এ-সব কাজের অভিজ্ঞতা নেই তো আমাদের।'

শান্তকণ্ঠে সোহানা বলল, 'ধীরে ধীরে লম্বা দম নাও। তারপর একইভাবে ছাড়ো আবার, খুব ধীরে। উত্তেজনা কমাও, নইলে খুব দ্রুত শক্তি ক্ষয় হবে। তুমিও তাই করো, ডিন। লম্বা করে দম নিয়ে ভিতরে আটকাও, ধীরে ধীরে ছাড়ো, পেশিগুলো শান্ত হয়ে যাবে।'

একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ ডিন। জোয়ালিন যখন কথা বলছিল, ও চুপচাপ মাদুরে বসে, দুই হাত পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে, তাকিয়েছিল সোহানার মুখের দিকে। এখন প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমি ওদের সব বলে দিয়েছি, সোহানা। আপনারা যে আসবেন, ওরা আগে থেকেই জানত, কিন্তু কীভাবে আসবেন সেটা

জানত না। আমি বলেছি। মানে, বলতে বাধ্য হয়েছি।'

জোয়ালিনের দিকে ফিরল সোহানা। ওর ঠোঁটের জখমটা দেখিয়ে বলল, 'অনেক মেরেছে তোমাদেরকে, তাই না, জোয়ালিন?'

জোয়ালিন জবাব দেয়ার আগেই ডিন বলে উঠল, 'জো লুই নামে একটা লোক আছে ওদের—আসল নাম জানি না—এখানকার সবাই ওকে মিস্টার জো লুই বলে ডাকে। তোমরা কী করবে, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল ও। প্রথমে না জানার ভান করলাম। তখন জো লুই গিয়ে জোয়ালিনের পিছনে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কোন শব্দ বেরোল না জোয়ালিনের মুখ দিয়ে, কিন্তু হঠাৎ ক্রমাগত মোচড় খেতে লাগল দেহটা। ব্যথায় নিজের ঠোঁট নিজেই কামড়ে জখম করে ফেলেছে ও। আর তারপর বেহুঁশ হয়ে গেল...মেরে ফেলেছে ভেবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দু'এক মিনিট পরেই হুঁশ ফিরল ওর। আবার আগের মত ওকে ব্যথা দিতে লাগল জো লুই। কী আর করব। বলতে হলো সব।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'হুঁ। আমি হলে আরও আগে বলে দিতাম।'

'মানে?' চোখ মিটমিট করল ডিন। মাথা ঝাড়া দিল এমন ভঙ্গিতে, যেন ভিতরটা পরিষ্কার করতে চাইছে।

'এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তোমার, ডিন। তুমি না বললে মারতে মারতে মেরেই ফেলত জোয়ালিনকে, তোমাকেও ছাড়ত না, কারণ ওদের কাছে তোমাদের কোনও মূল্য নেই। সলীলের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। ওকে বেশি মারতে ভয় পায়, ও মরে গেলে ইনফরমেশনগুলোও গেল।' ডিনের দুর্গতির জন্য মায়া হচ্ছে সোহানার। গতকাল থেকে নিশ্চয় প্রচণ্ড মানসিক কষ্টে ভুগছে ও, সোহানারা কোনদিক দিয়ে আসছে, সেটা বলে দেয়ার যন্ত্রণায়। মোলায়েম স্বরে বলল, 'তুমি কি নিজেকে দোষারোপ করছ, ডিন?'

'তো, কী মনে হয় তোমার?' হিসিয়ে উঠল ডিন।

হাসল সোহানা। 'তোমার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, ডিন। দোষটা তো আসলে আমাদের। আমরা পেশাদার। আমাদের আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। ভাবা উচিত ছিল, শত্রুরা আমাদের ওপর নজর রাখতে পারে।'

'বুঝলাম না,' জোয়ালিন বলল।

'আমরা জানতাম, ডিনের পিছু নিয়েছিল ওরা। আবারও নিতে পারে, এটা ভাবিনি কেন? সলীলকে ওরা কিডন্যাপ করেছে, ওদের ধারণা, ডিন নিশ্চয় দেখেছে সেটা। আমি যখন ওকে উদ্ধার করেছি, আমাকে বলে দিয়ে থাকতে পারে। লণ্ডনে আমার বাড়ির ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতে পারে। ডিন আমার বাড়িতে ঢোকার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাড়াহুড়ো করে একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে ছুটেছি আমরা, ওরা দেখেছে। একটিবারের জন্যে মনে হয়নি আমাদের, কেউ পিছু নিতে পারে, ফিরে তাকানোর কথা ভাবিনি। সলীলকে বাঁচানোর তাগিদে আনাড়ির মত আচরণ করেছি আমরা। প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে যে প্লেনে করে এসেছি আমরা, সেটার ফ্লাইট প্ল্যান জেনে নিতে যে কোনও মোটামুটি বুদ্ধিমান লোকের দশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। তারপর কোথায় যেতে পারি, সেটা তো সাধারণ অনুমানের ব্যাপার।'

দীর্ঘ নীরবতার পর প্রায় ফিসফিস করে ডিন বলল, 'যাক, এখন অনেকটা ভাল লাগছে আমার।'

'কাকে দোষ দেবে, কাকে দেবে না, এটা কোন ব্যাপার নয় এখন,' সোহানা বলল। 'ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হও। অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হতে পারে।' জোয়ালিনের দিকে তাকাল ও। 'কোন্ লোকটা জো লুই? সোনালি দাড়িওয়ালা দৈত্যটা?'

'হ্যাঁ,' ডিন বলল।

'ভয়ঙ্কর লোক, চিতার চেয়েও ক্ষিপ্র।' আপনাআপনি ব্যথা পাওয়া কাঁধটায় হাত চলে গেল সোহানার। সেলারের ভিতরের সেই মুহূর্তটার কথা ভাবল। 'আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিত করে ফেলল, পাঁচ সেকেণ্ডও লাগেনি ও-ই কি বস নাকি?'

মাথা নাড়ল জোয়ালিন। 'না। বস হলো আমেরিকান লোকটা। ওর নাম ক্লিঙ্গার।'

'নিশ্চয় হেনরি ক্লিঙ্গার। আর কাউকে দেখেছ?'

'ওর স্ত্রীকে। সবসময় মেয়েলোকটাকে *হানি* বলে ডাকে ক্লিঙ্গার। সস্তা ইংরেজি সিনেমার বেলি ড্যান্সারের মত দেখতে। আরও দুটো মেয়েলোক আছে, একটার নাম মেরি, আরেকটার জেনি। ওরাই ধরে এনেছে আমাদের। আমার মনে হয়, ওরাই নানের ছদ্মবেশ নিয়েছিল। একজন ইংরেজ আছে, মাঝবয়েসী, অস্থির স্বভাবের, ওর নাম জানি না। অনেকটা চিনাদের মত দেখতে আছে আরেকজন, নাম হুয়ান ক্যাসটিলো, সম্ভবত পর্তুগিজ। আরও লোক থাকতে পারে, আমি জানি না।'

ডিন বলল, 'জো লুই আমাদেরকে এখানে এনে জেনির সঙ্গে কথা বলার সময় একজন পাহারাদার রাখবে বলেছিল। নামের উচ্চারণটা শোনাচ্ছিল কোউ-বে।'

'কোবে? জাপানি?'

শ্রাগ করল ডিন। 'হতে পারে। ওকে দেখিনি আমরা।'

নিচুস্বরে জোয়ালিন বলল, 'সোহানা, এখান থেকে বেরোনোর কোন সুযোগই কি নেই?'

'সুযোগ সব সময়ই থাকে, জোয়ালিন। মাঝে মাঝে সবকিছু প্ল্যানমত ঘটে না; গোলমাল হয়ে যায়, সেটাকে আবার মেরামতও করা যায়।' সোজা হয়ে বসে ডান পা-টা বাঁ উরুর ওপর নিয়ে এল সোহানা। জুতোর সোলের মাঝখানে একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই ছোট একটা কুঠুরির ঢাকনা সরে গেল। 'তোমাকে যে ম্যাকাওতে নিয়ে যাইনি, এই বিপদের ভয়েতেই। কিন্তু সেই বিপদেই এসে পড়লে।' দরজার তালাটার দিকে তাকাল ও। 'মরটিস লক, একেবারে নতুন, তবে খুলতে পারব...'

সোলের কুঠরিতে আঙুল ঢুকিয়েই স্থির হয়ে গেল ও। মুখ বাঁকাল। 'তালা খোলার কিছু জিনিসপত্র রেখেছিলাম। নিয়ে গেছে।' ঢাকনাটা আবার জায়গায় টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শার্টের কাফ, কলার, কোমরের বেল্ট, যেখানে যেখানে জিনিস লুকানোর গোপন জায়গা রয়েছে, সবখানে খুঁজে দেখল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'কোন জায়গাই বাকি রাখেনি ওরা। রানার কাছে যেগুলো ছিল, নিশ্চয়ই সেগুলোও নিয়ে গেছে।'

ডিন বলল, 'আমাদের উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা তার মানে একদম নিল!'

জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল সোহানা। 'তোমাকে যা করতে বলেছি, তা-ই করো, জোরে জোরে দম নাও, আর শান্ত থাকো। তোমার পাগল হওয়ার দরকার নেই। যা করার আমি করছি।' হাত ধরে প্রথমে ডিনকে টেনে তুলল ও, তারপর জোয়ালিনকে। 'দম নাও এখন, জোরে জোরে। দশ মিনিট একনাগাড়ে। একটা কথাও বলবে না।'

সেলের কোণে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ডিন ও জোয়ালিন।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সোহানা। তালার ফুটো দিয়ে উঁকি দিল। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে ফিরে এল জোয়ালিনদের কাছে। চোখ বড় বড় করে সোহানার দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। দম নিচ্ছে আর ফেলছে। নিচ্ছে আর ফেলছে। যেন সোহানা থামতে না বললে আর থামবে না।

'থেমো না, চালিয়ে যাও, আর শোনো,' মৃদুস্বরে সোহানা বলল। 'পুরো বিষয়টা বুঝতে হবে তোমাদের। শেষ পর্যন্ত আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে চাইবে ওরা। এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই ওদের। আমাদের এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে, তার কারণ, মারার আগে আমাদের কাছ থেকে এমন সব তথ্য বের করে নিতে চায় ক্লিঙ্গার, যাতে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে প্রচুর মক্কেল জোগাড় করতে পারে। হয়তো আমাদের সবাইকে একখানে হাজির করে একজনের সামনে আরেকজনকে নির্যাতন করে মুখ খোলাতে চাইবে। ডিন, শোনো, যার ওপরই নির্যাতন চালাক, তোমার নিজের ওপর না হলে শান্ত থাকার চেষ্টা করবে, চিৎকার-চেঁচামেচি করবে না, ওদের গালিগালাজ করবে না। আমাকে আর রানাকে যদি কোনও অস্বাভাবিক কাজ করতে দেখো, বাধা দিতে যাবে না। তখনও চুপচাপ থাকবে। আমাদের হয়তো না খাইয়েই রাখবে ওরা, কিন্তু যদি কিছু খেতে দেয়, রাগ করে বসে না থেকে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেবে।'

একটু থেমে কী যেন ভাবল সোহানা। মুখের ভিতর বিশ্রী স্বাদ। বাঁ কাঁধটা দপ্ দপ্ করেই চলেছে। সেটাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করল

হেসে যোগ করল, 'কোনও না কোনও সময়, একটা সুযোগ আমরা পাবই। সুযোগটা কখন, কীভাবে আসবে, জানি না। তবে আসবে। আমি বা রানা, কেউই সে-সুযোগ হাতছাড়া করব না।'

জোয়ালিন ও ডিনের দিকে তাকাল ও। 'ঠিক আছে, এবার স্বাভাবিক দম নাও।'

বসে পড়ল জোয়ালিন।

দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে হেলান দিয়ে ডিন বলল সোহানাকে, 'অনেক লেকচার দিলেন। মনে রাখব। তবে এভাবে দম নেয়াতে সত্যিই ভাল হয়েছে। এ রকম কাজ হবে, ভাবতেই পারিনি।'

হাসল সোহানা। 'প্রতি ঘণ্টায় এভাবে দশ মিনিট করে দম নেবে। দেখবে, ভয় অনেক কেটে গেছে। এখন লোকগুলোর কথা বলো। কেমন দেখলে ওদের?'

'তেমন কিছু না,' জোয়ালিন বলল।

'তবু। সব মনে করার চেষ্টা করো। কিছুই বাদ দেবে না। হ্যাঁ, শুরু করো।'

অস্পষ্ট নকশাটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ভেজা আঙুল দিয়ে টেবিলের ধুলোয় ওটা এঁকেছে সলীল।

'আমি এটুকুই দেখেছি,' সলীল বলল। 'শ্যাতোর অনেক জায়গাই দেখিনি আমি।'

'যা দেখেছিস, তা-ও অনেক। আলতোভাবে টেবিলে আঁকা অস্পষ্ট নকশাটায় আঙুল ছোঁয়াল রানা। 'আমরা আছি এই অংশটায়, একপাশে করিডোর সহ সেলগুলো রয়েছে. বেশির ভাগেরই দরজা নেই। এখানে, এই মাঝখানে রয়েছে একটা খোলা হলের মত জায়গা, আর তোর ধারণা সোহানা সহ বাকিদের তালা দিয়ে রাখা হয়েছে এই সেলটায়, করিডোরের শেষ মাথায়।'

'হ্যাঁ। জো লুই তোকে এখানে নিয়ে ঢোকার সময় ওদিকটায় শব্দ শুনেছি আমি।'

'হুঁ। আর উল্টো দিকের আরেক মাথায়, একটা দরজা আর সিঁড়ি রয়েছে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। বাঁয়ে রান্নাঘর, এখানে; সেলারে যাওয়ার দরজাটা রয়েছে রান্নাঘরের একপাশে, সিঁড়ি নেমে গেছে দরজার ওপাশ থেকে।'

'আমার তাই ধারণা, রানা। কেন, বলতে পারব না।'

'কিছু হয়তো দেখেছিস কিংবা শুনেছিস, যার কারণে ধারণাটা হয়েছে। তা হলে, ডাইনিং রুমটা রয়েছে এখানে, আর এর উত্তর পাশে বড় একটা সিটিং রুম। ওটার পাশে সিঁড়ি, নীচে জো লুই-এর গ্যালারির মত জিমনেশিয়াম।'

'ওর ভাষায় আমাকে *ট্রিটমেন্টের* অর্থাৎ নির্যাতনের জন্যে ওখানে নিয়ে যায়। ও ওটাকে বলে কনসাল্টিং রুম।'

মুখ তুলে সলীলের দিকে তাকাল রানা। দেখল, ওর পরনে নেভি ব্লু রঙের একটা ওয়ান-পিস ট্র্যাক সুট। গাল দুটো বসা, চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, রিউম্যাটিজম রোগীর মত ধীরে, সাবধানে নড়াচড়া করছে। অল্প আগে গোসল করেছে নিশ্চয়, কারণ গায়ে কোন দুর্গন্ধ নেই। অথচ রানা শুনেছে তিরিশ ঘণ্টা একটা দুর্গন্ধ ভরা, আলোহীন, বদ্ধ, গর্তের মত ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে।

সলীলের কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দিয়ে যেন সান্ত্বনা দিতে চাইল রানা। 'সিটিং রুমের ওপরে আর উঠিসনি তুই?'

'না।'

'লেডি জোয়ালিন আর ডিনকে ধরে আনার খবরটা কখন জানলি?'

'গতকাল। ধরে আনার পর পরই কোনও একটা সময়। জো লুই এসে আমাকে বের করে নিয়ে গিয়ে গর্তে ভরল। গুহার ভিতর দিয়ে আসছিস তোরা, এ খবরও জানিয়েছে। তোদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ও।'

'গুহাটার কথা কি আগে থেকেই জানত ওরা?'

'অল্পস্বল্প, মেরির কথা থেকে বুঝলাম। আমার সঙ্গে এসে কথা বলেছে ও, নিজস্ব ঢঙে বানানো যত রাজ্যের হরর স্টোরি। নিয়মিত এসে এ-সব গল্প বলে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। শ্যাতোটা ভাড়া দেয়ার সময়ই নাকি ডিসপোজাল শূটটা ওদের দেখিয়েছে বাড়ির দালাল। কাল বিকেলে ওটা দিয়ে নেমে যায় জো লুই, দেখে আসার জন্যে। একটা ভূগর্ভ হ্রদের কাছে নাকি চলে গিয়েছিল। পানি নাকি এত ঠাণ্ডা যে নিতান্ত বাধ্য না হলে ওতে নামতে রাজি নয় ও।'

এক মুহূর্ত ভেবে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওর মত লোকের মুখে তুই এ রকম একটা কথা শুনে অবাক হোসনি?'

'অবাক? কী জানি...আসলে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তোরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছিস ভেবে। অন্য কিছু ভাবারই সুযোগ ছিল না। বরং এখন কিছুটা অবাক লাগছে। কোনও কিছুই পরোয়া করে না লোকটা। আমি তো মনে করি নিরেট একটা যন্ত্র ও, রোবট, যার কোনরকম ক্ষতি করা যায় না।'

'কোন্ দেশের লোক, জানিস?'

'না, তা জানি না। তবে জীবনের বেশির ভাগ সময় দূর প্রাচ্যে কাটিয়েছে, এটা শুনেছি।'

'আচ্ছা।'

এ রকম একটা বিষয়ে রানার আগ্রহ অবাক করল সলীলকে। প্রচণ্ড ক্লান্ত হলেও মনটা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ রয়েছে ওর, যেন মানসিক উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে।

রানাকে জো লুই সেলে এনেছে সাত ঘণ্টা আগে। পিছন পিছন একটা মাদুর নিয়ে ঢুকেছে জেনি। রানার পরনের কাপড়-চোপড় কুঁচকানো। অজ্ঞান অবস্থায় সব কাপড় খুলে নিয়ে আবার কোনমতে পরিয়ে দেয়া হয়েছে, বোঝা যায়। রানাকে মাদুরের ওপর শুইয়ে দিয়ে সলীলকে জো লুই বলেছে, 'একেবারে তৈরি হয়ে এসেছিল লোকটা। ওর কাছে কী কী জিনিস পাওয়া গেছে, শুনলে অবাক হবে।'

তারপর সলীলকে বিছানা থেকে নামিয়ে বাংকটা ভাল করে পরীক্ষা করেছে ও। 'না, পেরেকটেরেক কিছু নেই। কাঠের গোঁজ দিয়েই জোড়া দিয়েছে।' বিছানার পর টেবিলটা পরীক্ষা করেছে। 'নাহ্, এমন কিছুই পাবে না,' রানার কথা বলল জো লুই, 'যা দিয়ে এখান থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে পারে।'

ওরা দুজন বেরিয়ে গেলে অজ্ঞান রানার কাপড়চোপড়গুলো ঠিকঠাক করে দিয়েছে সলীল। শার্টের বোতাম আর প্যান্টের চেন লাগিয়ে যতটা সম্ভব আরাম করে শুইয়েছে। এতটাই দুর্বল ও, রানাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়ানোর শক্তি নেই। বিষণ্নতা যেন ঠাণ্ডা একটা দলার মত বুকে চেপে বসেছে। ভাবছে, ওকে উদ্ধার করতে ওরা না এলেই ভাল করত, ওর কারণে নিজেরাও ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ল এখন।

ওষুধের ক্রিয়া শেষ হলে চোখ মেলেছে রানা। উঠে প্রথমেই পুরো ঘরটা পরীক্ষা করে দেখেছে। তারপর সলীলকে প্রায় জেরা করে এখানকার লোকজন

এবং ঘরবাড়ি সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে নিয়েছে। এখনও কথা শেষ হয়নি ওর। জিজ্ঞেস করল, 'কোনও ধরনের অ্যালার্ম সিসটেম দেখেছিস?'

'আমার মনে হয়, বাইরের দিকের যত দরজা-জানালা আছে, সবগুলোতে ইলেকট্রিক তার লাগানো,' সলীল বলল। 'হুয়ান ক্যাসটিলো আর একজন জাপানিকে দরজা-জানালা ঠিক আছে কি না, দেখে আসতে পাঠিয়েছিল ক্লিঙ্গার—তাতেই বুঝেছি। আমাকে তখন *ট্রিটমেন্টের* জন্যে নেয়া হয়েছিল। তা ছাড়া মেইন সিঁড়িতে কোথাও অ্যালার্ম থাকতে পারে, ওদের কথা থেকে অনুমান করেছি।'

হাতের তালু দিয়ে ডলে টেবিলের নকশাটা মুছে ফেলল রানা। বাংকে এসে বসল। 'এখন এই জো লুই লোকটার কথা বল্। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে অজ্ঞান করে ফেলল। সাংঘাতিক ক্ষমতাধর। ওর অ্যাকশন দেখার সুযোগ হয়েছে তোর?'

'হয়েছে। দুদিন আগে, জিমনেশিয়ামে। আমার ওপর নির্যাতন চালানোর আগে তিনজন জাপানির সঙ্গে কারাতে প্র্যাকটিস করছিল। তুলনাহীন!'

'আমার ধারণা, সেলারে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আচমকা হামলা চালিয়েছে, ওরকম কিছুর আশঙ্কা করিনি আমরা, তৈরি ছিলাম না বলে এত সহজে কাবু করতে পেরেছে। তোর কী মনে হয়, আসলে কতটা ভাল ও?'

ভারি গলায় সলীল বলল, 'এত শক্তি খুব কম মানুষেরই আছে, রানা। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আনআর্মড কমব্যাটে দীর্ঘদিনের কঠোর অনুশীলন—ধর্মের মত পবিত্র জ্ঞান করে ও এটাকে, সারাটা জীবন নাকি কাটিয়েছে এরই পিছনে।'

'আমার সঙ্গে তুলনা কর্।'

'ও তোর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র আর শক্তিশালী। চিতার মতই স্বচ্ছন্দ ওর পেশি। কায়দা-কানুনও অনেক বেশি জানে। ও বুক ঠুকে বলে—এবং নির্দ্বিধায় বলা যায় সেটা ওর অহমিকা নয়—সারা দুনিয়ায় ওর সমকক্ষ আর কেউ নেই। আমার বিশ্বাস কথাটা সত্যি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। সলীলকে ভাল করেই চেনে ও, ও যখন বলছে ভাল, তারমানে জো লুই লোকটা সত্যিই অসাধারণ।

'কিন্তু এ-সব কথা জানতে চাইছিস কেন?' জিজ্ঞেস করল সলীল।

শ্রাগ করল রানা। 'প্রতিপক্ষ সম্পর্কে যত বেশি জানা থাকে ততই ভাল—ট্রেনিঙের সময় তোকেও শেখানো হয়েছে এ কথা।'

'তারমানে ওর সঙ্গে খালি হতে মারামারি করতে চাস্?' প্রায় আঁতকে উঠল সলীল। 'নিজেকে ওর চেয়ে ভাল প্রমাণের জন্যে?'

'না, সলীল,' হাসল রানা। 'নিজের বীরত্ব দেখানোর কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। তবে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা তো করতেই হবে। তোর বিপদে সাহায্য করতে এসেছি আমরা। আমার অবস্থা তো দেখছিসই, ওদিকে ডিন আর জোয়ালিন সহ আটকে আছে সোহানাও। সবাইকে নিয়েই বেরোতে হবে আমাদের।'

'ওহ্হো, একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি, সোহানার কথায় মনে পড়ল,' সলীল বলল। 'ও কিন্তু আঘাত পেয়েছে।'

নড়ল না রানা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সলীলের দিকে। 'খুব বেশি?'

'জানি না। কাঁধে ব্যথা পেয়েছে। বেঞ্চটেঞ্চের ওপর পড়ে গিয়েছিল বোধহয়।'

'বেঞ্চে একটা বড় ভাইস লাগানো আছে, সম্ভবত সেটার ওপর পড়েছে। তুই জানলি কী করে?'

'জো লুই ব্যাপারটা নিয়ে আফসোস করছিল। বলছিল, কাঁধের হাড় ভেঙে গিয়ে থাকলে আর মারপিট জমবে না। ওর মত একজন মহিলা ব্ল্যাক বেল্টধারীর সঙ্গে লড়াই করতে কেমন লাগে, সে অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে বলে ওর এই আফসোস।'

'তুই তো দেখছি চিন্তায় ফেলে দিলি,' গম্ভীর কণ্ঠে রানা বলল। 'শুধু জখম হলে ভাবনার কিছু নেই, কিন্তু হাড় ভাঙলে... যাকগে, ওর সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারব, আর দেখাটা ওরা করাবেই। এখন কথা হলো, ডিন আর জোয়ালিনকে যে তুলে নিয়ে এল, সরাইখানার মালিক পুলিশকে ফোন করবে না? সে ব্যাপারে এই ব্ল্যাকমেইলাররা কিছু করেছে নাকি, জানিস?'

'জানি। মেরির কাছে শুনেছি। ও *হরর সেশন* করতে এসে নিজে নিজেই বলেছে, হয়তো আমাদের কোনও উপায় নেই, এটা বুঝিয়ে ভয় বাড়ানোর জন্যেই। জোয়ালিন আর ডিনকে এখানে আনার পর ঘণ্টা দুয়েক পর ও জোয়ালিনের কণ্ঠ নকল করে সরাইখানায় ফোন করে মালিককে জানিয়ে দিয়েছে, হঠাৎ করে একজন দেশি বন্ধুর দেখা পেয়ে যাওয়ায় ওর ওখানে গিয়ে উঠেছে, দু-চার দিন থাকবে।'

'মালিক বিশ্বাস করেছে?'

'মেরির তো ধারণা, করেছে।' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল সলীল। রানার দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, তোরা যে শ্যাতো ল্যানসিউতে আসবি, রয় কনারি সেটা জানে?'

'হ্যাঁ। আজকে আমরা ফিরে না গেলেই দুর্ভাবনা শুরু হবে ওর। তবে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনে যাবে না, কিছুটা সময় অপেক্ষা করবে।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সলীল। ভাবছে, ঠাণ্ডা মাথার লোক রয়। খুব ছোটখাট বিষয় কীভাবে একটা সফল মিশনকে ব্যর্থ করে দেয়, জানা আছে ওর। আতঙ্কিত হয়ে তাড়াহুড়ো করে কোন মিশন আরম্ভ করলে দেখা যায় পুরো ব্যাপারটাই ভেস্তে গেছে। তাই রয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হবে, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আর তারপর? স্যাওনি জর্জিসকে ফোন করবে, উদ্ধারকারী দল পাঠাবে জর্জিস। মনে মনে শ্রাগ করল সলীল। সামান্যতম বিপদের গন্ধ পাওয়ামাত্র বন্দিদের খুন করবে ক্লিঙ্গার। আর লাশ লুকানোর জায়গার অভাব নেই গুহার ভিতর। সহজেই রেখে আসতে পারবে জো লুই, এমন জায়গায়, যেখানে কোনদিনই কেউ লাশগুলো খুঁজে পাবে না।

মৃদুকণ্ঠে সলীল জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের এখান থেকে বেরোনোর সুযোগ কতখানি আছে—আসলেই আছে কি না, সত্যি কথাটা বলবি আমাকে, রানা? তুই জানিস, আমি তো অথর্ব!'

কিছুটা অবাক হয়েই ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী ঘটবে আমি জানি না, সলীল। পুরো বিষয়টা শেষ হবার আগে শিওর হয়ে কিছুই বলা সম্ভব নয়। ওরা আমাদের নিয়ে কী করতে চায়, তার ওপরও নির্ভর করে অনেক কিছু। এই মুহূর্তে এখানে বসে কোনও প্ল্যান তৈরির চেষ্টা করার মানে হয় না। অপেক্ষায় থাকব আমরা, সুযোগ পাওয়ামাত্র লুফে নেব।'

সে-সুযোগ কখনও আসবে কি না, সন্দেহ আছে সলীলের; তবে এত হতাশার কথাটা আর রানাকে বলল না ও।

'আপাতত এক টুকরো শক্ত তার পাওয়া গেলেই চেষ্টা করে দেখতে পারি,' রানা বলল।

'তালা খুলবি?' রানার দিকে তাকিয়ে আছে সলীল। 'খুলেও লাভ হবে না। বাইরে লোহার ডাণ্ডা লাগানো।'

'তা হলে দশ ইঞ্চি লম্বা একটা তার দরকার।' বিড়বিড় করে নিজেকে বলল রানা। সেলের ভিতরে চোখ বোলাচ্ছে ও। 'এখানে তো কিছুই নেই। যা-ই হোক, জোগাড় করার চেষ্টা করতে হবে।' একটা মিনিট চুপ করে রইল ও। গভীর মনোযোগে ভাবছে কোনও কথা। তারপর মুখ ফিরিয়ে সলীলের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ঘুমাবি এখন? নাকি আরও কথা বলবি? ইচ্ছে করলে দাবাও খেলতে পারিস।'

সলীলের মুখেও হাসি ফুটল। কেমন করুণ দেখাল হাসিটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সেই পুরানো দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলি, দোস্ত! যখন আমিও তোর মতই জোয়ান ছিলাম, ড্রাগ দিয়ে আমার দেহটা ধ্বংস করে দেয়া হয়নি... যাকগে, ওসব ভেবে আর লাভ নেই। অ্যাড্রেনালিন ফ্যাটিগে ভোগার চেয়ে কিছু একটা করা ভাল।'

মেঝেটা দাবার বোর্ডের মত করে বানানো। মাদুরের কাঠি দিয়ে গুটি তৈরি করা যাবে। রাজা উজির বানাতেও অসুবিধে হবে না। কোন্‌টা কী জিনিস, কল্পনা করে নিলেই হবে।

গুটি বানাতে শুরু করল রানা। ভোঁতা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সলীল। এখানে বসে দাবা খেলে মনটাকে কষ্ট আর হতাশা থেকে দূরে রাখার যে বুদ্ধি রানা করেছে, তাতে কতখানি সফল হওয়া যাবে, সন্দেহ আছে ওর।

কিন্তু বিশ মিনিট পর, অদ্ভুত গুটি দিয়ে দাবা খেলতে খেলতে কীভাবে রানাকে হারাবে, কখন যে সেই ভাবনায় ডুবে গেল, বলতে পারবে না ও।

এগারো

হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল সোহানার। এত তাড়াতাড়ি ভাঙবে, আশা করেনি ও। ওর মাথার ভিতরের ঘড়িটা বলছে, রাত আড়াইটার বেশি হবে না। মাথা উঁচু করল ও। ডিনের দিকে তাকাল। জেগে আছে ডিন। জোয়ালিন বসে আছে। ঠোঁট

কামড়ে ধরে হাঁটু ডলছে।

'কী, ব্যথা করছে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাথা ঝাঁকাল জোয়ালিন। 'পুরো দুটো দিন পা থেকে খুলিনি, আর তাতে...'

'গাধা কোথাকার!' ফিসফিস করে ধমকে উঠল সোহানা।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল জোয়ালিন। বিব্রতকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, বোকামিই করে ফেলেছি...'

'তোমাকে গাধা বলছি না, গাধা হলাম আমি, নিজেকেই বলছি! কথাটা আরও আগেই ভাবা উচিত ছিল আমার,' সোহানা বলল। 'গুলি করে মারা উচিত আমাকে!'

এক কনুইয়ে ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করল ডিন। 'চিন্তা কীসের, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সে-কাজটা সেরে দেবে ওরা।'

'তোমার পা!' উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে সোহানার চোখ। 'তোমার নকল পা-টা কি নতুন?'

'হ্যাঁ...'

'ওটাতে দুটো তারের ব্রেইস পিভটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার, জোয়ালিন।' চোখ বুজে জোরে জোরে এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকাল সোহানা, নিজের ওপর রাগে। 'তার। জিনিসটা সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে রয়েছে, অথচ এতটা সময় নিলাম! অকারণ বসে বসে কষ্ট করলাম। ওরা আমাদেরকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আনার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে পারতাম। যাকগে, যা গেছে গেছে, এখন আর দেরি করা উচিত না। পা-টা খোলো, জলদি।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জোয়ালিন বলল, 'সোহানা, আমি...আমি ওটা ছাড়া হাঁটতে পারি না। একেবারে অসহায় হয়ে যাই।'

'এখান থেকে বেরোই আগে। তারপর তোমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হবেই। আজ রাতেই যেমন করে হোক পালাতে হবে আমাদের।'

সোহানার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল জোয়ালিন। তারপর নকল পায়ের ওপর ঝুঁকে ট্রাউজারের নীচের দিকটা টেনে ওপরে তুলল। উঠে বসেছে ডিন।

পা-টা খুলে ফেলল জোয়ালিন। কাটা অংশটা দেখতে ভাল লাগছে না, তবু তাকিয়ে রইল ডিন। চোখে সহানুভূতির দৃষ্টি।

নকল পা-টা টেনে নিয়ে দেখতে লাগল সোহানা। ব্রেইসে আঙুল বুলিয়ে বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বলল, 'তারটা ইস্পাতের, শক্তও, তালা খুলতে পারব। কিন্তু বাইরের ডাণ্ডা খুলব কীভাবে?'

'তারচেয়ে অপেক্ষা করলে হয় না?' নিচুস্বরে বলল জোয়ালিন। 'ওরা আমাদের বের করে নিয়ে গেলে তখন হয়তো আরও ভাল সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'না, এর চেয়ে ভাল সুযোগ পাওয়ার আশা করে লাভ নেই।'

'যা ভাল বোঝো, করো।'

কোনরকম টুলস ছাড়া খালিহাতে ব্রেইসের তারটা খুলে আনতে আধঘণ্টা লাগল সোহানার। তারটাকে বাঁকিয়ে একটা মাথা তালা খোলার উপযুক্ত করতে

লাগল আরও এক ঘণ্টা। কপালের ঘাম মুছে তারটা নিয়ে গিয়ে বসল দরজার তালার কাছে।

ফিসফিস করল ডিন, 'ক'টা বাজে এখন?'

'এই সাড়ে-চারটে মত হবে। সূর্য উঠতে উঠতে সাতটা। কথা বোলো না, আমাকে কাজ করতে দাও।' তালার গর্তে তারের বাঁকানো মাথাটা ঢুকিয়ে দিল ও। পাঁচ সেকেণ্ড পর হঠাৎ টান দিয়ে তারটা বের করে এনে জোয়ালিনকে বলল, 'জলদি তোমার নকল পা-টা ট্রাউজারের ভিতরে ঢোকাও। এমন ভান করো, যেন ঘুমিয়ে পড়েছ। প্যাসেজে কিছু ঘটছে।'

দরজার তালায় কান পেতে, চোখ বুজে বসে রইল ও। বাইরে কী ঘটছে, শুনে বোঝার চেষ্টা করছে। দুই মিনিট পর ভারি দম নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জোয়ালিন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, সোহানা?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। অন্য সেলটায় কেউ এসেছে, আর জো লুই-এর গলা শুনলাম মনে হলো। তারপর ওরা চলে গেল। কী করল, বুঝতে পারলাম না।'

'হয়তো...' দ্বিধা করছে ডিন।

'বলো।'

'হয়তো, সলীলের জন্যে এসেছে। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিয়ে গেছে। কিন্তু ওকে একা নিয়ে গেল কেন?'

সোহানা বলল, 'আমাদের কাছেও ব্ল্যাকমেইল করার মত প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য আছে, সে-কথা জানে ক্লিঙ্গার। তবে আমাদেরকে নরম করতে সময় লাগবে বুঝে আগের কাজ আগে—অর্থাৎ সলীলকে নির্যাতন করছে এখন। কিছু তথ্য হাতে না পেলে ইউরোপে কাজ শুরু করতে পারছে না ওরা। সলীলের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করে দেবে ওরা, তারপর এক এক করে আমাকে আর রানাকে ধরবে।' একটু থেমে যোগ করল, 'ভোরের দিকে এ সময়টায় মানুষের মানসিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, জিজ্ঞাসাবাদের এটাই উপযুক্ত সময়।' এক মুহূর্ত কী ভাবল ও। তারপর বলল, 'নাহ্, ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে।'

'কীসের ঝুঁকি?' জানতে চাইল ডিন।

'ধরে নিই,' সোহানা বলল, 'আপাতত সলীলকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে ওরা, আমরা কী করছি দেখতে আসবে না। এই সুযোগে তালাটা খুলে ফেলা দরকার। তারপর রয়েছে দরজার বাইরের ডাণ্ডাটা।'

পঁচিশ মিনিট পর, দরজার কাছে ঝুঁকে বসে, প্যাসেজের বাইরে আবার শব্দ শুনছে সোহানা। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তালাটা খুলে ফেলেছে আগেই। বাইরের শব্দ থেমে যাবার পরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল ও। তারপর তারের সাহায্যে ডাণ্ডাটা ওপরে তোলার চেষ্টা চালাল। ভীষণ শক্ত তার। তবে তাতেও কাজ হতো না; হলো, পাল্লাটায় চাপ দিলে সামান্য ফাঁক হয়ে যায়, আর সেই ফাঁকের ভিতর আঙুল কিছুটা ঢোকানো যায় বলে।

বাইরে থেকে কেউ তাকিয়ে আছে কি না বোঝার উপায় নেই। কিন্তু অত চিন্তা করলে কাজ করা যাবে না। তাই যেটা উচিত সেটাই করল সোহানা, ডাণ্ডাটা তোলার চেষ্টা চালাল।

দশ মিনিটের চেষ্টায় সফল হলো অবশেষে। হুক থেকে ডাণ্ডাটা সরিয়ে তারের ওপর ওটাকে ধরে রাখল। দরজা ফাঁক হয়ে গেছে কিছুটা। সেখান দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ডাণ্ডাটা ধরে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল। স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে।

ফিরে তাকিয়ে হাসল ও। ওকে হাসতে দেখে ডিন আর জোয়ালিনের মুখেও হাসি ফুটল।

'এবার বেরোতে হবে,' সোহানা বলল। 'ডিন, জোয়ালিনকে বয়ে নিতে হবে তোমার। কয়েক পা পিছনে থেকে অনুসরণ করবে আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিন। দুই হাত ধরে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে জোয়ালিনকে পিঠে তুলে নিল।

শেষ মাথায় একটা মাত্র বাল্‌ব্ জ্বলছে। প্যাসেজে মৃদু আলো। অর্ধেক এগোনোর পর একপাশে ছোট একটা চারকোনা গার্ডরুমের মত ঘর দেখা গেল। ওখানে ওরা পৌঁছামাত্র তীব্র আলো জ্বলে উঠল মাথার উপর। জাপানি লোকটা, কোবে, ঘরের দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ক্যাম্পবেডে বসে আছে। হাতে একটা ঝুলন্ত কর্ড-সুইচ, ওটার সাহায্যেই আলোটা জ্বেলেছে। সোহানাদের দেখে সুইচটা ছেড়ে দিয়ে হাত বাড়াল দেয়ালের দিকে, গোল একটা লাল রঙের বড় সুইচের দিকে। নিশ্চয় বেল-পুশ, সোহানা অনুমান করল, টিপে দিলেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। লোকটার দিকে তাকিয়ে জাপানি কায়দায় বাউ করল সোহানা। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে।

সাড়া না দেওয়াটা কেবল অভদ্রতা নয়, চরম কাপুরুষতা। সুইচের কাছে স্থির হয়ে গেল জাপানি লোকটার হাত। একটা মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল সোহানার দিকে। তারপর তাকাল ডিনের দিকে, পিঠে তুলে নেয়া জোয়ালিনের ভারে বাঁকা হয়ে রয়েছে। সামনে এগোলো সোহানা। কারাতে মারের ভঙ্গিতে দুই পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে, ডান হাত সামনে বাড়ানো।

চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল জাপানি। তার ধারণা, একটা খোঁড়া মেয়ে, একটা *দুর্বল* পুরুষ মানুষ, আর একটা মেয়ে ওর কিছুই করতে পারবে না। সোহানার দিকে ফিরে বাউ করল সে।

শান্তকণ্ঠে ডিনকে বলল সোহানা, 'ডিন, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।'

নির্দেশ পালন করল ডিন। দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, যাতে পিঠে বোঝার ভারটা কম লাগে। দুই হাতে ওর গলা জড়িয়ে থাকা জোয়ালিনের কাঁপুনি টের পাচ্ছে।

বাঁ হাতটা ঝুলে আছে সোহানার, ওটা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাওয়ার ভান করছে। ডান হাতটা বাড়িয়ে রেখে ধীরে ধীরে আগে বাড়ল। নিঃশব্দ ছায়ার মত মসৃণ গতিতে সোহানার ওপর উড়ে এসে পড়ল যেন জাপানি লোকটা। শেষ মুহূর্তে আঘাত হানল সোহানা।

ডিন দেখল, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সোহানার ডান হাতের সোজা আঙুলগুলো গিয়ে খোঁচা মারল কোবের গলায়। চাপা গোঙানি বেরোল লোকটার গলার গভীর থেকে। পরক্ষণে ওর এক হাতের কব্জি চেপে ধরল সোহানা। মোচড় দিয়ে নিজের হাত ঘুরিয়ে একটা ঝাঁকি দিল সোহানা। ওর সামনে ডিগবাজি খেয়ে বস্তার মত

আছড়ে পড়ল লোকটা।

নিজের অজান্তেই অস্ফুট শব্দ বেরোল ডিনের মুখ থেকে।

লোকটার হাত ছাড়েনি তখনও সোহানা। বাঁ হাতটাও সচল হয়ে গেছে। এক হাত অকেজো করে রাখার ভান করে লোকটাকে বোকা বানিয়েছিল, যাতে ওদেরকে অতিরিক্ত অসহায় ভেবে বেল-পুশ না টেপে কোবে। দুই হাতে ওর হাত ধরে মোচড় দিল সোহানা, মুহূর্তে উপুড় হয়ে গেল কোবে। ওর পিঠে চেপে বসল সোহানা। এক হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরে অন্য হাতে লোকটার হাত বেকায়দা মত ধরে রেখে প্রচণ্ড উল্টো চাপ দিতে শুরু করল। গলায় চেপে বসা হাতটা ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে কোবে।

আতঙ্কিত চোখে জোয়ালিন দেখল, কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে গেল কোবের দেহটা। আর নড়ছে না। আস্তে করে উঠে এল সোহানা। ফোঁস করে ছাড়ল ফুসফুসে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা।

'ও কি... মরে গেছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল জোয়ালিন।

ঝুঁকে কোবের গলার কাছের ক্যারোটিড আর্টারিটা ছুঁয়ে দেখল সোহানা। 'হ্যাঁ। এতটা দুর্বল, ভাবিনি।'

ডিনের কাছে এসে দাঁড়াল ও। 'তোমারও কি খারাপ লাগছে?'

মৃদু হাসিতে সামান্য কেঁপে উঠল ডিনের ফ্যাকাসে ঠোঁট। 'ওই লোকটা জো লুই হলে আরও বেশি খুশি হতাম।'

'হুঁ। এসো, যাই।'

জোয়ালিন বলল, 'সোহানা, এক মিনিট। লোকটার ঘরের দেয়ালে চাবি ঝুলছে, দেখো। মনে হচ্ছে, সেলের চাবি। নিয়ে নাও। সময় বাঁচবে।'

হাসল সোহানা। 'আরে, তাই তো! কোবের দিকে নজর থাকায় চাবিটা দেখিনি থাংক ইউ, জোয়ালিন।'

প্রচণ্ড কাহিল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে সলীল। ওর মনে হচ্ছে, পুরো দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এর আগে প্রচুর ব্যথা দিয়েছে ওকে জো লুই, কিন্তু খানিক আগে যে-অকথ্য নির্যাতন করেছে, তার কোন তুলনা হয় না। হঠাৎ করেই ভোর রাতে এসে ঘুম থেকে টেনে তুলে নিয়ে গেছে, তারপর শুরু হয়েছে টরচার। মনে হচ্ছে, আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না, হাঁটতে পারবে না। বুকে এত কষ্ট, যেন দশমণী পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে রানা। দক্ষ হাতে বুক আর পেটের মাঝখানের জায়গাটা বিশেষ ভাবে ম্যাসেজ করে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করছে। 'প্লিজ, রানা,' কোলাব্যাঙের স্বর বেরোল সলীলের গলা থেকে, 'এ রকম মার আমি রোজই খাই। সেরে যাবে, রানা। তুই বিশ্রাম নে...'

হাসল রানা। 'আমি ঠিকই আছি। তোরও ব্যথা কমে যাবে একটু পরেই। নার্ভ সেন্টারে মেরেছে তো—আমি ক্যাটসু ব্যবহার করছি, ব্যথা কমানোর সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি...' হঠাৎ ঝটকা দিয়ে মাথাটা উঁচু হয়ে গেল ওর। কান পেতে শুনছে। তালায় চাবি ঘুরছে। পাল্লায় টোকা পড়ল খুব আলতোভাবে দু'বার, তিনবার,

একবার। চোখ বড় বড় হয়ে গেল রানার। পাল্লার বাইরে লাগানো ডাণ্ডা খোলার শব্দ কানে এল। ফিসফিস করে বলল, 'সোহানা!'

মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল পাল্লা। দরজায় দাঁড়ানো সোহানা পিছনে জোয়ালিনকে পিঠে নিয়ে ডিন। একটা ভাল পা মাটিতে ঠেকিয়ে ডিনের বোঝার ভার লাঘবের চেষ্টা করছে জোয়ালিন। অন্য পা-টা নেই, ট্রাউজারের নীচের অংশ ঝুলে রয়েছে।

সেদিক থেকে সোহানার দিকে চোখ ফেরাল রানা। 'তা হলে ওই পায়েই তার পেয়েছ? গুড। পাহারা ছিল না?'

'ছিল,' ফিসফিস করে বলল সোহানা। 'একটা জাপানি। কারাত ফাইট দিতে এসেছিল, শেষ করে দিয়েছি।'

'লোকটার কাছে পিস্তল ছিল?'

'না।'

একটা সেকেণ্ড চুপচাপ সোহানার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল রানা, 'যদিও সলীলকে পেটানোর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করছে। সিঁড়ির নীচে কোথাও অ্যালার্ম বেল আছে, স্বয়ংক্রিয় হলে আমরা বেরোলেই বেজে উঠবে। দল বেঁধে ছুটে আসবে সবাই। খালিহাতে সবার সঙ্গে লড়াই করে বেরোতে গেলে...'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'কাজটা সহজ হবে না। আমাদের মাঝখানে পড়ে মারা যেতে পারে ডিন, সলীল বা জোয়ালিন। তারচেয়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাই, কি বলো?'

'হ্যাঁ। সলীলের কাছে দুর্গটার যা ধারণা পেলাম, তাতে ধরে নিচ্ছি গ্রাউণ্ড লেভেলে আছে রান্নাঘরটা। গাড়িগুলো নিশ্চয় চত্বরে। গেট নেই। জানালার পাল্লার বাইরে তার লাগানো, টান পড়লেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। ওটা গিয়ে আগে অকেজো করো। আমি ডিন আর জোয়ালিনকে নিয়ে আসছি। ওদের বের করে দিয়ে তুমি আর আমি ফিরে এসে সলীলকে নিয়ে যাব।'

চলে গেল সোহানা। সলীলের দিকে ফিরল রানা। 'চুপচাপ শুয়ে থাক্। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরব।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সলীল।

ডিন আর জোয়ালিনের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। 'বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। কীভাবে গেলে তোমার জন্যে সবচেয়ে সুবিধে হয়, জোয়ালিন? পিঠে চড়ে, নাকি দুজনে দুদিক থেকে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে গেলে?'

'ডিনের পিঠে চড়েই তো বেশ আরাম পাচ্ছিলাম, অবশ্য ও যদি কিছু মনে না করে,' জোর করে ঠোঁটে হাসি ফোটাল জোয়ালিন। 'তোমাকে ঘোড়া বানানোর জন্যে দুঃখিত, ডিন।'

হিসিয়ে উঠল ডিন। 'ও কথা আর দ্বিতীয়বার বলবে না! নাও, এসো, আমার পিঠে ওঠো।'

ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রানা—মধুর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তো! তারপর হাঁটতে শুরু করল। প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল তিনজনে। কিছুটা এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়ে একটা বড় রান্নাঘরে ঢুকল। অপেক্ষা

করছে সোহানা। চত্বরের দিকের জানালাটার পাল্লা হাঁ হয়ে খুলে আছে। পাতলা, সরু একটা তারের কাটা মাথা ঝুলতে দেখা গেল। কাছে এসে ডিন বলল, 'জোয়ালিনকে চেয়ারে বসিয়ে আমি আগে নেমে যাই?'

'হ্যাঁ, নামো,' রানা বলল। 'জোয়ালিনকে ধরে নামিয়ে দেব আমরা। যাও, কুইক।'

জানালার চৌকাঠে উঠে বসে নীচে লাফিয়ে পড়ল ডিন। ওপর থেকে জোয়ালিনের দুই হাত ধরে ওকে ডিনের কাঁধে বসিয়ে দিল রানা ও সোহানা। জোয়ালিনকে বিড়বিড় করতে শুনল, 'ওহ্, ক্রাইস্ট, কী অসহায় যে লাগছে নিজেকে!'

ওপর থেকে আলতো করে ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে সোহানা বলল, 'ওসব কথা বাদ দাও। বাড়ি গিয়ে আরেকটা নতুন পা লাগিয়ে নিয়ো, ঠিক হয়ে যাবে সব। যাও, ডিন।'

'আমি ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি,' সোহানা বলল। লাফিয়ে নামল জানালার নীচে। ডিন আর জোয়ালিনকে নিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে রানা। চাঁদ ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ির বনেট তোলার মৃদু শব্দ কানে এল ওর। পাঁচ মিনিট পরেই নিঃশব্দ ছায়ার মত দেখা গেল সোহানার অবয়ব। ফিসফিসিয়ে বলল, 'দুটো গাড়িই অকেজো করে রেখেছে। ডিস্ট্রিবিউশন আর্মগুলো খুলে নিয়ে গেছে।'

অবাক হলো না রানা। এমনই কিছু ঘটবে, ধারণা করে রেখেছিল ও। বলল, 'তা হলে আর তোমার ওপরে আসার দরকার নেই। পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। ওরা একা যেতে পারবে না। তুমি সঙ্গে যাও। রাস্তা দিয়ে যেয়ো না। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আলো ফুটবে। উপত্যকা ধরে আড়াআড়ি চলে যাও। ভীষণ অসুবিধে হবে তোমাদের, পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পেরোতে হবে, জানি, বিশেষ করে ডিনের। কিন্তু কিছু করার নেই।'

'ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না। আমি সাহায্য করব ডিনকে। তুমি কী করবে?'

'সলীলের সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করব। বিশ মিনিট পিটিয়েছে ওকে জো লুই। সুস্থির হতে আরও বিশ মিনিট লাগবে। তারপর ওকে তুলে নিয়ে নীচে নেমে যাব। গুহা দিয়ে বেরোব আমরা।'

একটু দ্বিধা করে মুখ তুলল সোহানা। 'খুব সাবধানে থেকো, রানা।'

হাসল রানা। 'থাকব। যাও তুমি, আর দেরি কোরো না।'

আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল সোহানা। ঘুরে দাঁড়াল রানা। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আবার সলীলের সেলে ফিরে চলল প্যাসেজ ধরে।

বারো

বিনীত ভঙ্গিতে রয় বলল, 'এ সময়ে ফোন করার জন্যে, দুঃখিত, মঁসিয়ে, কিন্তু মনে হচ্ছিল আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

বিছানায় বসে আছে স্যাণ্ডনি জর্জিস, কানে ঠেকানো টেলিফোনের রিসিভার। বরফশীতল কণ্ঠে বললেন, 'আগে ভালমত বুঝে নিই ব্যাপারটা, মিস্টার কনারি। আপনার সন্দেহ আপনার বন্ধু মাসুদ রানা মিস্টার সেনকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। তিন দিন আগে লণ্ডন থেকে প্লেনে করে ওঁর তিন বন্ধু ডিন মার্টিন, লেডি জোয়ালিন হেইফোর্ড আর সোহানা চৌধুরিকে নিয়ে শ্যাতো ল্যানসিউর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা-ই, মঁসিয়ে জর্জিস। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে আমাকে ফোন করার কথা ওদের। আমার ভয় হচ্ছে, খারাপ কিছু ঘটেছে।'

'শ্যাতো ল্যানসিউ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। আপনি কি বুঝতে পারছেন পুলিশকে না জানিয়ে বিনা অনুমতিতে এভাবে উদ্ধারকার্য চালাতে যাওয়াটা ঘোর বেআইনী?'

'রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে আপনার, মঁসিয়ে জর্জিস,' কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম করে জবাব দিল কনারি। 'আগে উদ্ধার করে আনুন, তারপর ওদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবার যথেষ্ট সময় পাবেন।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে জর্জিস বললেন, 'হুঁ, তা ঠিক। ওকে, মিস্টার কনারি, ফোন করে জানানোর জন্যে ধন্যবাদ। দেখি কী করতে পারি। এখনকার মত গুডবাই।' রিসিভার নামিয়ে পাশে রাখা আরেকটা সবুজ টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি।

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লিঙ্গার। দুই আঙুলের ফাঁকে একটা সিগার, জ্বালাতে ভুলে গেছে যেন। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সকাল সাড়ে ছ'টা বাজে। পনেরো মিনিট আগে ওর একজন সহকারী, ইয়েনো, দেখে আসে কোবে মরে পড়ে আছে।

স্টাডিতে ক্লিঙ্গারের সঙ্গে রয়েছে জো লুই, মেরি ও জেনি। জো লুই বলল, 'ওরা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি শিওর, উপত্যকা ধরে গেছে।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ক্লিঙ্গার। বন্দিদের এই পালানোর ঘটনায় মনে মনে ভড়কে গেলেও চেহারায় সেটা প্রকাশ করল না। 'হুঁ। তবে সলীল আর ওই ল্যাংড়া মেয়েটা ওদের গতি কমিয়ে দেবে। দক্ষিণে যাবে না ওরা, ওটা ছাগল চরানোর জায়গা, চড়াই খুব বেশি। উত্তরে যাবে, এই যে এই রাস্তাটা দিয়ে। যদি কোথাও লুকিয়ে না পড়ে, রাস্তাটার এখানটায় কোথাও ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে

যাবে আমাদের। প্রচুর সময় আছে আমাদের হাতে। পায়ে হেঁটে গিয়েও ওদের ধরে ফেলতে পারবে তুমি, মিস্টার জো লুই।' ম্যাপে আঙুলটা সচল হলো ওর। 'আমরা গিয়ে রাস্তার এই জায়গা, এই জায়গা আর এই জায়গা থেকে এগিয়ে যাব ওদের দিকে, তিন দিক থেকে কোণঠাসা করে ফেলব।'

স্টাডিতে এসে ঢুকল টোপাক, ঘামছে। বলল, 'একমাত্র সিট্রো গাড়িটা সচল আছে। পিছনে পার্ক করা ছিল ওটা। ওরা দেখেনি। বাকিগুলোর হাই টেনশন লেড ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। চালু করতে অনেক সময় লাগবে।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ক্লিঙ্গার। 'হুঁ। তুমি আর হুয়ান জিনিসপত্র গোছাও। এখান থেকে পালাতে হতে পারে আমাদের।' টোপাক বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করল ও। তারপর ফিরে তাকিয়ে জো লুই আর মেয়ে দুটোকে দেখল। 'একসঙ্গে ওরা না-ও থাকতে পারে,' বলল ও। 'সোহানা আর রানা তাড়াহুড়া করে চলে যেতে পারে ফোন করার জন্যে। তাতে কী ঘটবে, বুঝতে পারছ কিছু? আমাদেরও সাবধান হতে হবে, আলাদা আলাদা হয়ে সরে যেতে হবে। পরে আবার কোনও একখানে মিলিত হব। ঠিক আছে?'

মেরি বলল, 'আপনি যা ভাল বোঝেন, বস্।'

'যার যার পাসপোর্ট, আইডেন্টিটি, সব গুছিয়ে নিতে হবে। কোন্‌খান থেকে কোথায় যাওয়া লাগে, ঠিক নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব ঝামেলা কমিয়ে কিংবা এড়িয়ে চলা উচিত আমাদের।'

সিগারটা টেবিলে রেখে হাতের তালু দিয়ে ওটাকে চাকার মত সামনে-পিছনে ঘোরাচ্ছে ক্লিঙ্গার। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'এখন যে কাজটা করতে বলব তোমাদের, শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে। বলতে আমারই মন ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু কাজের মধ্যে আবেগকে স্থান দেয়া উচিত নয়। *এমিলি* একটা ঝামেলা। খুব ভাল মেয়ে ও, ওর জন্যে আমি পাগল, কিন্তু আমাদের পালানোর সময় ও প্রচুর যন্ত্রণা দেবে। ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে আমাদের। মাথায় তো ঘিলু বলতে কিছু নেই ওর, সারাক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকবে। কোথায় কখন কার কাছে কী ফাঁস করে দেবে, শেষে সব যাবে আমাদের। মারা পড়ব। বুঝতে পারছ?'

মেরি বলল, 'নিশ্চয়, বস্। আপনার জন্যে সত্যিই আমার মন খারাপ লাগছে।'

'তুমি খুব ভাল মেয়ে, মেরি। এটা আমার মনে থাকবে।' জেনির দিকে তাকাল ক্লিঙ্গার। 'যাও, ওর ব্যবস্থা করে এসো, জেনি। খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারবে।'

হাসি ফুটল জেনির মুখে। জিভ বের করে ঠোঁট চাটল, যেন চিতাবাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে। 'ও আমার এক মিনিটও লাগবে না।'

বেরিয়ে গেল জেনি। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই নিচুস্বরে জো লুই বলল, 'একটা ঝামেলা খতম করেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, বস্? মেরির ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। টোপাক আর হুয়ানকেও আমাদের দরকার। নিজেদের স্বার্থেই মুখ বন্ধ রাখবে ওরা। কিন্তু জেনি, ওর তো মাথার ঠিক নেই...'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল ক্লিঙ্গার। 'ওর কথা ভাবিনি মনে কোরো না।

জেনির ব্যবস্থাও করতে হবে।' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টেবিলে টোকা দিতে লাগল ও। আস্ত একটা বাঁদরী। তার ওপর বাচাল। কোন্‌টা ঠিক আর কোনটা ভুল, কখনও বুঝতে পারে না। এ ধরনের বেশি কথা বলা মেয়েদেরকে আমি দলে রাখতে ভয় পাই, যতই কাজের হোক।'

একটা মুহূর্ত থেমে চোখ মিটমিট করল ক্লিঙ্গার। 'দল চালানো সোজা নয়, মিস্টার জো লুই। সবার মন জুগিয়ে চলতে হয়, সবাইকে খুশি রাখতে হয়। আবার প্রয়োজনে নিষ্ঠুরও হতে হয়। জেনিকে পাঠিয়েছি এমিলিকে শেষ করতে। তাতে আনন্দ পাবে মেয়েটা। মৃত্যুর আগে এ ধরনের একটা উপহার ওর পাওনা।' দরজার দিকে তাকাল ও। জো লুই-এর দিকে ফিরল। 'তুমি দোতলায় উঠতে উঠতেই কাজ সেরে ফেলবে জেনি। দেরি না করে ওকে খতম করে দেবে।' ম্যাপের দিকে চোখ নামাল ক্লিঙ্গার। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে শূট দিয়ে লাশ দুটো গুহায় ফেলে চলে আসবে এখানে।'

আনন্দে হিংস্র হাসি ফুটল জো লুই-এর ঠোঁটে। নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল ও।

ওখান থেকে সামান্য দূরে পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে খুবই ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে সলীল। রানার হেলমেট-ল্যাম্পের আলোয় ডান পাশের সরু জলধারাটা চোখে পড়ছে, ঝরে পড়ছে অনেক নীচের অন্ধকারে।

ঘণ্টাখানেক আগে ওর সেলে ফিরে গিয়েছিল রানা, জানিয়েছিল, গাড়িগুলো অচল করে দেয়া হয়েছে। সোহানা চলে গেছে ডিন আর জোয়ালিনকে নিয়ে। পায়ে হেঁটে গেছে ওরা। তবে কষ্ট হলেও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে পারবে, আশা করছে। সলীলের ব্যথা কমানোর জন্যে আরও কিছুক্ষণ *ক্যাটসু* ব্যবহার করেছে রানা, তারপর চলার উপযোগী হতেই ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সেলারের শূট দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মই বেয়ে নেমেছে পাহাড়ের ঢালে, সোহানা আর ও যেখান দিয়ে উঠেছিল। ভাগ্যিস, বাক্সের মত জায়গাটার ফোকরেই ঠেকানো ছিল মইটা, তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি জো লুই, তাতে নামতে সুবিধে হয়েছে ওদের। মইটা না পেলে হয়তো দড়ি ব্যবহার করতে হতো। সেলারে কোন কিছুতে দড়ির এক মাথা বেঁধে অন্য মাথা ধরে বেয়ে নামতে হতো। মই বেয়ে নামতেই যা কষ্ট হয়েছে সলীলের, দড়ি বেয়ে নামতে হলে কী যে হতো, ভাবতে চায় না রানা। হয়তো ওকে পিঠে বেঁধে নামাতে হতো—প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। যা-ই হোক, মইটা থাকায় অতটা কষ্ট করতে হয়নি।

ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে সলীল। গুঙিয়ে উঠে বলল, 'রানা, লাভ নেই। আমাকে নিতে পারবি না। দোহাই লাগে তোর, তুই চলে যা।'

নীরব অন্ধকারে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে সলীলের দিকে তাকাল রানা। 'ব্যাটা, তোকে রেখে যাওয়ার জন্যে আমরা সবাই মিলে এত কষ্ট করেছি নাকি? কথা বাদ দিয়ে কাজ দেখা। এগো তো, দরকার হলে ঘন ঘন বিশ্রাম নিবি।'

পরিশ্রমের কারণে রক্ত চলাচল বাড়ায় আবার সলীলের অবশ হয়ে যাওয়া নার্ভ-সেন্টারগুলো একটু একটু করে স্বাভাবিক হয়ে আসছে ক্রমশ, আবার

যোগাযোগ শুরু করেছে দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে। চলতে চলতে অবাক হয়েই একটা সময় টের পেল, ব্যথা অনেক কমে গেছে। পেশিগুলো এখনও ধীরে কাজ করছে, কিন্তু ওর মগজের নির্দেশ পালন করছে ঠিকমতই।

মনে হলো এক যুগ পরে ঢালের নীচে নেমে এল ওরা। সলীলকে নিয়ে বিশ্রাম করতে বসল রানা। এখানে কিছু জিনিসপত্র রেখে গিয়েছিল, তার মধ্যে ছোট এক টিন গ্রিজ রয়েছে। সলীলের পরনে শুধুই একটা ট্র্যাক-সুট। গুহার ভিতরের শীত ঠেকাতে পারছে না এই সামান্য পোশাক। থরথর করে কাঁপছে ও।

গ্রিজের টিন খুলল রানা। সলীলের ট্র্যাক-সুটটা নিজেই খুলে নিয়ে ওর সারা গায়ে পুরু করে গ্রিজ মাখাল। তারপর আবার পরিয়ে দিল পোশাকটা। বলল, 'শীত অনেকটা কম লাগবে এখন, দেখিস।'

আরও কয়েক মিনিট বসে থাকার পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'বদ্ধ জায়গাকে ভয় পাস নাকি তুই?'

'সরু সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞেস করছিস তো?' মাথা নাড়ল সলীল, 'না, পাই না। তোর মত অতবার না হলেও, মাঝে মাঝে আমাকেও সুড়ঙ্গে ঢুকতে হয়েছে।'

'বাঁচালি, দোস্ত্।' হাসল রানা। 'চল্, যাই।'

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে এমিলি, এ সময় দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল জেনি। ওর দুই হাত পিছন দিকে।

জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল এমিলি। 'তুমি আবার কীজন্যে এসেছ? অনেক রাতে আমাকে রেহাই দিল তোমাদের বস. খানিক পরেই আবার গা গরম হয়ে উঠল ওর, আবার আমার কাঁচা ঘুম ভাঙাল। তারপর ঘুমোতে যাব, শুরু হলো হট্টগোল। জাপানি বলদটা নাকি পাহারা দিয়ে রাখতে পারেনি বন্দিদের, ওরা ওকে খুন করে পালিয়েছে। এখন তুমি আবার কী চাও?'

'ব্যাপারটা জরুরি, মিসেস ক্লিঙ্গার,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল জেনি, 'নইলে আসতাম না।' এগিয়ে এসে এমিলির পিছনে দাঁড়াল ও। 'খুবই জরুরি। বস বললেন, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে আমাদের।'

'তাড়াতাড়ি? খাব কখন? গোছগাছ করব কখন?'

'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, মিসেস ক্লিঙ্গার।' খিলখিল করে হেসে উঠল জেনি। 'আপনি তো আর যাচ্ছেন না।'

আয়নার ভিতর দিয়ে অবাক হয়ে জেনির দিকে তাকিয়ে রইল এমিলি। 'যাচ্ছি না মানে? কী বলতে চাও তুমি?'

'এই যে, এই বলতে চাই।' ঝটকা দিয়ে সামনে চলে এল জেনির একটা হাত। সাঁই করে চালাল তার অস্ত্র। বাতাসে চকচক করে উঠল সরু তার। ওটার দুই মাথায় কাঠের দুটো বল বাঁধা। একটা ওর হাতে ধরা, অপরটা চোখের পলকে তারটাকে এমিলির ফরসা গলায় দু-প্যাঁচ জড়িয়ে ফিরে এল পিছন দিকে। খপ্ করে সেটা ধরে ফেলল জেনি বাম হাতে। দুহাতে দুটো বল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও। এক হাঁটু তুলে দিল এমিলির মেরুদণ্ডের মাঝখানে। বিস্ফারিত, আতঙ্কিত চোখের দৃষ্টি আয়নায়, মনে হচ্ছে খুলে পড়ে যাবে চোখ দুটো মাটিতে; বেরিয়ে

আসছে জিভ—দুই হাতে বাতাস খামচানো ছাড়া আর কিছুই করার উপায় রইল না এমিলির। ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেরোতে থাকল গলা থেকে। বুঝতে পারছে না, কেন কী হচ্ছে।

মিনিট দুয়েক পর মৃত এমিলির পিঠ থেকে হাঁটু সরিয়ে আনল জেনি। তারটা খুলে নিতেই কাত হয়ে টুল থেকে মাটিতে পড়ে গেল মৃতদেহটা। 'শয়তান মেয়েমানুষ কোথাকার, অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছিস!' প্রচণ্ড রাগে হিসিয়ে উঠে এমিলির গায়ে লাথি মারল ও। পিছনে শব্দ হতেই ফিরে তাকাল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জো লুই।

চাপা হাসি হাসল জেনি। মাথা নেড়ে লাশটা দেখিয়ে বলল, 'খতম।'

'দারুণ, জেনি,' প্রশংসা করল জো লুই। কাছে এসে জেনির চোখে চোখে তাকিয়ে হাসল। 'তুমি সত্যিই কাজের মেয়ে, কিন্তু কী করব, বস বললেন...' ডান হাতটা ওপরে উঠে গেল জো লুই-এর, চোখের পলকে নেমে এল কোপানোর ভঙ্গিতে। জেনির খুলিতে কুড়ালের মত আঘাত হানল ওর হাতের একপাশ। কী ঘটছে পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই মারা গেল জেনি।

দুই কাঁধে দুটো লাশ ঝুলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল জো লুই করিডোরে।

দশ মিনিট পর মেরি বলল, 'বলাটা ঠিক হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না, বস্, তবু বলি, শেষবারের মত একবার মিসেস ক্লিঙ্গারকে দেখতে...'

ম্যাপ থেকে মুখ তুলল ক্লিঙ্গার, 'কে?'

'মিসেস ক্লিঙ্গার...'

'না, মেরি, দেখব না।' মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লিঙ্গার। 'ওকে শেষ যেভাবে দেখেছি, সেই স্মৃতিটাই আমার মনে গাঁথা থাক।'

'আপনার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না, বস। কিন্তু জেনিকে দেখার ব্যাপারে আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছি। কাজের ছিল মেয়েটা...'

'কিন্তু,' ঘড়ি দেখল ক্লিঙ্গার, 'মিস্টার জো লুইকে বললাম, পাঁচ মিনিট পর আসতে। ও এত দেরি করছে কেন?'

'আমি এসে গেছি,' দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকল জো লুই। শীতল কণ্ঠস্বর, ভাবভঙ্গিতে উত্তেজনা। 'আমরা যা ভেবেছিলাম, সেভাবে সব ঘটেনি, বস্।'

'কীভাবে ঘটেছে?'

'মিসেস ক্লিঙ্গার আর জেনির লাশ নিয়ে সেলারে নেমেছিলাম। গর্ত দিয়ে লাশ ফেলতে গিয়ে দেখি মইটা নেই, রানা আর সোহানা যেটা দিয়ে উঠে এসেছিল। ওদের আনার পর মইটা তুলে আনিনি, শুটেই ছিল। সন্দেহ হওয়াতে পিলারে দড়ি বেঁধে নীচে নামলাম। দুটো ছায়ামূর্তিকে দেখলাম নেমে যাচ্ছে ঢাল বেয়ে, একজনের হেলমেটের আলোও দেখা যাচ্ছিল। আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতে না বললে পিছু নিতাম। তার মানে, অন্তত দুজন লোক ওই পথে গেছে।'

ধীরে ধীরে বলল ক্লিঙ্গার, 'অন্তত দুজন?'

'ওদিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না, জানা কথা। কিন্তু খুব বেশি দুর্বল কেউ, যে লোক অন্যদের মত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে না, তারজন্যে এই

পথটাই সুবিধেজনক।'

টেবিল চাপড়াল ক্লিঙ্গার। 'থামো। আমাকে ভাবতে দাও। শেষ করে দিয়ে এলে না কেন?'

মুচকি হাসল জো লুই। 'যাক না, যতদূর যেতে পারে।'

বিশাল মাথাটা ঝাঁকাল ক্লিঙ্গার। 'সলীল গেছে ওপথে?'

'মনে হয়। একা একা যাওয়ার সাধ্য নেই ওর। তাই সঙ্গে একজন গেছে।'

'নিশ্চয় রানা।'

'হ্যাঁ।'

'অচল আরও একজন আছে, লেডি জোয়ালিন। নকল পা ছাড়া ও হাঁটতে পারে না। ভাঙা পা-টা সেলের ভিতর ফেলে রেখে গেছে। তারমানে ওকে বয়ে নিতে হচ্ছে। কে? নিশ্চয় ডিন। কারণ সলীলের সঙ্গে রানা গেছে। তারমানে সোহানা গেছে ডিনদের সঙ্গে।'

ছাতের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল ক্লিঙ্গার। 'একটামাত্র গাড়ি আছে আমাদের। ওটা নিয়ে সোহানার দলের পিছু নেব আমরা। কাজেই গুহামুখের যেখান দিয়ে রানারা বেরোবে, সেটার কাছে সময়মত হাজির থাকতে পারব না। আর ঠিক কোন্‌খান দিয়ে যে বেরোবে, সেটাও জানি না।' মুখ নামাল ও। 'তুমি ওদের ধরতে পারবে, মিস্টার জো লুই?'

'নিশ্চয় পারব,' বিমল হাসি ছড়িয়ে পড়ল জো লুই-এর মুখে। 'সলীলের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হবে রানাকে। তার মানে শামুকের গতি। সেজন্যেই তো এদিক দিয়ে গেছে, যাতে ধীরে চলতে পারে। ওদের ধরতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'তা হলে যাও। সোহানাদের দলটাকে আমি দেখব।' জানালার বাইরে তাকাল ক্লিঙ্গার। ঘড়ি দেখল। তারপর টোকা দিল ম্যাপে। 'রাস্তার এই জায়গাটায় ওদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের।' বুড়ো আঙুল দিয়ে চিবুক ডলল। 'ভালই মনে হচ্ছে। সবগুলোকে যদি ধরে ফেলতে পারি, আর কোনও ঝামেলা পোহাতে হবে না আমাদের।' ভ্রূকুটিতে কুঁচকে গেল ওর মুখ। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'এমিলির ব্যাপারে একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি, বোধহয় আরও পরে মারলেও চলত।'

নিজের ফোঁপানি আর গোঙানির শব্দে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠল সলীল। চারদিক থেকে চেপে আসায় পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে অনেক জোরে এসে কানে বাজছে। সরু সুড়ঙ্গ ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বাতাসে যেন অক্সিজেনই নেই, আর তার অভাবে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে বাড়ি মেরে চলেছে।

রানাকে বলেছে, বদ্ধ জায়গাকে ভয় পায় না ও। কিন্তু এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। স্রেফ ছুঁচোর মত এগিয়ে যেতে হচ্ছে। কোনওদিকে ঘোরার উপায় নেই। শুধুই সামনে এগোনো। যদি কোনও কারণে মাটি ধসে পড়ে সামনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়... থাক! ভয়ঙ্কর ভাবনাটা আর ভাবতে চাইল না ও।

বহুক্ষণ পর অবশেষে সামনে চওড়া হতে আরম্ভ করল সুড়ঙ্গ। সামনে উঠে

দাঁড়াতে দেখল রানাকে। নিজেও উঠে দাঁড়াতে গেল সলীল। মাথায় বাড়ি খেল। এখনও গুহামুখের বাইরে পৌঁছায়নি ও। আরও কিছুক্ষণ হামাগুড়ি দেয়ার পর বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের বাইরে। চুনাপাথরের গুহাটায় পৌঁছেছে।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠল সলীল। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল রানা। আস্তে করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে বলল, 'দুই মিনিট বিশ্রাম নিয়ে নে। সব ভুলে গেলি নাকি রে, শালা! বুক ভরে দম নিয়ে, ধীরে ধীরে... কথা থামিয়ে ঝটকা দিয়ে তাকাল রানা সুড়ঙ্গমুখের দিকে। কান খাড়া করে শুনছে। চোখের কোণ কোঁচকানো।

শব্দ না করে খুব ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গমুখের কাছে গিয়ে বসল ও। কানের পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে গভীর মনোযোগে অপেক্ষায় থাকল। আবার শুনল শব্দটা। নলের মত সুড়ঙ্গ বেয়ে আসছে। কাপড়ের অতি মৃদু খসখস, আর পাথরের গায়ে জুতো ঘষার হালকা শব্দ।

সুড়ঙ্গমুখের কাছ থেকে সরে এসে ফিসফিস করে সলীলকে বলল, 'কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে। একজন।' একটু থেমে নিচু গলায় বলল, 'খুব সম্ভব জো লুই।'

'ও, ভগবান!' কোলাব্যাঙের চাপা ঘড়ঘড়ানি বেরোল সলীলের গলা দিয়ে।

ওর কথায় কান দিল না রানা। কী করা যায় ভাবছে। সামনে হ্রদ। লুকানো ডিঙিটা বের করে সেটায় করে পাড়ি দেবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু পানি জো লুইকে ঠেকাতে পারবে না। সাঁতার কেটে পেরোবে। ওর সঙ্গে টক্কর দেয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হলো হ্রদের ওপার, যখন তীর বেয়ে উঠে আসার চেষ্টা করবে ও। সঙ্গে পিস্তল থাকলে কোন সমস্যাই ছিল না। আর রাইফেলও রেখে এসেছে অনেক দূরে। সলীলকে নিয়ে ওখানে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যাবে, তার আগেই ওদের ধরে ফেলবে দৈত্যটা। শান্তকণ্ঠে বলল, 'মিনিট চারেক সময় আছে আমাদের হাতে। তোকে আরেকটু কষ্ট করতে হবে, সলীল। আয়, আমার কাঁধে ভর দে।'

কিছুটা বহন করে, কিছুটা টেনেহিঁচড়ে সলীলকে নিয়ে হ্রদের পাড়ে এসে দাঁড়াল রানা। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না আর সলীল, ধপ করে বসে পড়ল—ধসে পড়ল যেন। তীক্ষ্ণ সাঁই-সাঁই শব্দ তুলে জোরে শ্বাস টানছে। রানা দৌড়াল পাথরের স্তূপের ওপাশ থেকে ডিঙিটাকে টেনে বের করার জন্য। প্রেশার ল্যাম্পটা রেখেছে পানির কিনার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ডিঙিটা এনে পানিতে নামাল। মাথার হেলমেটটা খুলে রাখল মাটিতে।

নিরাশ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সলীল। জো লুই আসছে। ওর ধারণা, অকারণেই কষ্ট করছে রানা, লোকটার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না ওকে, কিংবা নিজেকে। রানাকে চলে যেতে বলতে চাইল ও। কিন্তু বলল না। জানে, শুনবে না রানা। কোনমতেই ওকে একা ফেলে চলে যেতে রাজি হবে না গাধাটা।

কী করছে রানা? চোখ মিটমিট করল সলীল। ভুল দেখছে নাকি? চোখের পাতা বুজে আবার মেলল। না, ভুল নয়। সত্যি। সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে ফেলছে

রানা। পরনে এখন শুধুই ছোট্ট জাঙ্গিয়া। সলীলের চোখে রানার ফিগারটা দারুণ সুন্দর লাগল। এগিয়ে এসে গ্রিজের টিনটা সলীলের হাতে দিয়ে বলল, 'আমার সারা গায়ে মেখে দে দেখি। পুরু করে মাখবি। জলদি।'

টিন থেকে দুই হাতে গ্রিজ তুলে নিয়ে রানার গায়ে মাখাতে শুরু করল সলীল। কাঁপাস্বরে বলল, 'গ্রিজ মেখে লাভটা কী? ওর সঙ্গে মারামারি করবি নাকি?'

'হ্যাঁ, তা-ই করব,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল রানা। হাসল। 'দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে না? এখন আমি কোণঠাসা বিড়ালের মত ফাইট দেব। ঘাবড়াস না, দোস্ত। ও আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী হতে পারে, হাজারো প্যাঁচ-কৌশল জানতে পারে; কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, এটা ওর জিমনেশিয়াম নয়। পায়ের নীচে নরম ম্যাট নেই। পা পড়বে অপরিচিত জায়গায়, শক্ত, এবড়ো-খেবড়ো পাথরে। তা ছাড়া গরম অঞ্চলের মানুষ ও। বাধ্য না হলে ওই ঠাণ্ডা পানির হ্রদ সাঁতরে পেরোতে চাইবে না। আর যদি বা পেরোয়, ওপরে উঠে প্রথমে গা গরম করার চেষ্টা করবে। পানি থেকে উঠেই মারামারি করতে চাইলে শরীরের ক্ষিপ্রতা অনেক কমে যাবে ওর। আমি ওর চেয়ে ভাল অবস্থায় থাকব। আমাকে ঠাণ্ডা পানি সাঁতরাতে হবে না। গায়ে গ্রিজ থাকায় পানিতে নামতে হলেও ঠাণ্ডা কম লাগবে। সবরকম সুযোগ নেব ওর দুর্বলতার।' ডান হাতটা সরিয়ে নিল ও। 'না না, এ-হাতের তালু আর কনুইয়ের ভাঁজে লাগাস না। দরকার আছে।'

সুড়ঙ্গমুখে আলোর আভাস দেখা গেল। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'চলে এসেছে! জলদি গিয়ে ডিঙিতে ওঠ। হাত দিয়ে বেয়ে ওপারে চলে যা। শরীর শুকনো রাখার চেষ্টা করবি, খবরদার, কোনভাবেই যেন না ভেজে।'

জিনিসপত্রগুলো ডিঙিতে তুলে দিয়ে ডিঙির একটা কিনার ধরে রাখল রানা। তাতে উঠে গেল সলীল। 'আর তুই?'

'আমি এখানেই থাকব। তুই রওনা হয়ে যা।' ল্যাম্প লাগানো হেলমেটটা ডিঙিতে তুলে দিয়ে রানা বলল, 'ওপারে উঠেই আর দাঁড়াবি না, এই বাতিটা নিয়ে চলতে শুরু করবি। ওখান থেকে আর পথ হারানোর ভয় নেই, একদম সোজা চলে গেছে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি এসে ধরে ফেলব তোকে।' ডিঙিটাকে ঠেলা দিল ও। 'নে, বাওয়া শুরু কর্। ভয় নেই, সলীল, আমি কিছুতেই মরব না। এই লড়াইটা আমরা জিতবই।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। পানির কিনার থেকে সরে সামান্য উঁচু বেদিমত জায়গাটাতে উঠল। দুই হাত ঝুলছে দুই পাশে।

অন্য এক রানাকে দেখছে সলীল। প্রেশার ল্যাম্পের আলোয় গ্রিজ মাখা, চকচকে, পেশিবহুল দেহটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও গ্রিকদেবতা। চোখে শীতল, শান্ত দৃষ্টি। এই মানুষটার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পেয়েছে বলে গর্ব হলো সলীলের।

রানার দিকে তাকিয়ে একমনে প্রার্থনা শুরু করল সলীল: *ওর প্রাণ ভিক্ষা চাইছি, হে ভগবান! ও যেন কিছুতেই হেরে না যায়! প্লিজ, ভগবান...!*

তেরো

জো লুই আসছে।

সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। প্রেশার ল্যাম্পের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে। ওর এক হাতে একটা বড় টর্চ, অন্য হাতে মেশিন-পিস্তল। হ্রদের ওই পারে ডিঙি থেকে নিজেকে টেনে তুলল সলীল। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল। চোখ সরাতে পারছে না অন্য পারের দৃশ্যটা থেকে। আলোকিত মঞ্চে যেন শুরু হতে চলেছে রোমাঞ্চকর নাটকের এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, সোনালি চুল-দাড়িওয়ালা দীর্ঘ মূর্তিটার মুখোমুখি। দুই পা ফাঁক করা। মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে চ্যালেঞ্জ করল ও দৈত্যটাকে।

রক্তস্রোত যেন ক্রমাগত আঘাত হেনে অসাড় করে দিচ্ছে সলীলের মগজটা। মনে হচ্ছে যেন বাস্তবে নেই। পাহাড়ের ভিতর মস্ত আদিম গুহায়, ভূগর্ভ-হ্রদের কালো, শীতল পানি পেরিয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত।

থেমে গেল জো লুই। চারপাশে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাসল। এই তো চেয়েছিল সে! চেয়েছিল উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নিজের বিদ্যার প্রয়োগের সুযোগ। বাউ করল সে-ও।

ব্লেজারের জায়গায় এখন গলা ঢাকা সোয়েটার পরেছে। খুলে ফেলল ওটা। ঝুঁকে পাথরের খাঁজে রেখে দিল মেশিন-পিস্তল আর টর্চ। 'তোমার সাহসের প্রশংসা করতেই হয়, মাসুদ রানা। সত্যিই, বুকের পাটা আছে তোমার।'

পাথরের মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে রানা। জবাব দিল না। এক পা এগোল জো লুই, তারপর আচমকা দৌড়ে এগোল রানার দিকে। হ্রদের অন্যপার থেকে সলীলের মনে হলো, শূন্যে ভেসে আসছে দৈত্যটা। মসৃণ গতিতে চিতাবাঘের মত লাফিয়ে উঠল বেদিতে।

এরপর কী ঘটল, কিছুক্ষণ কিছুই যেন বুঝতে পারল না সলীল। পরস্পরকে আঘাত হানার চেষ্টা করছে জো লুই ও রানা। ক্ষিপ্রতায় কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। হাত ছোঁড়া, পা ওড়ানো চলল কিছুক্ষণ। লাফিয়ে উঠে একবার কারাতের কায়দায় লাথি মারল জো লুই। লাগাতে না পেরে ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ল। কিন্তু রানা আঘাত হানার আগেই লাফিয়ে সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে। টের পেয়েছে যতটা কাঁচা ভেবেছিল, ততটা নয় ওর প্রতিপক্ষ। এতে বরং খুশিই হলো সে।

আবার কিছুক্ষণ চলল পরস্পরকে ঘিরে ঘোরা, হাত চালানো, পা ওড়ানো। এক-আধটা আঘাত লাগছে প্রতিপক্ষের দেহে, তবে বেশিরভাগই হাওয়া কাটছে আঘাতগুলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে খুব অল্প অল্প করে হলেও জো লুই-ই জিতছে। রানার বুকের একপাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। পা তুলে লাথি মেরেছে

ওখানে জো লুই, জুতোর একপাশ লেগে কেটেছে। ওর নিজের কোথায় কোথায় কেটেছে দেখা যাচ্ছে না কাপড় পরে থাকায়। আরও দু'বার প্রায় আটকে ফেলল ও রানাকে, একবার হাতের কব্জির কাছে ধরে, আরেকবার রানা একটা উড়ন্ত লাথি মারার সময় ওর গোড়ালি ধরে। ওসব সময়ে আতঙ্কে পেটের ভিতর মোচড় দিয়েছে সলীলের, খুলির ভিতর এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি। কিন্তু ঝট্‌কা বা জুজিৎসুর প্যাঁচ মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে রানা।

সলীল দেখছে, রানা ব্যথা পাচ্ছে, ব্যথা দিচ্ছেও। ধরা পড়ছে দৈত্যের বাহুডোরে, পিছলে বেরিয়ে আসছে আবার। রানার প্রতিটা আক্রমণ যদিও ঠেকাতে পারছে না জো লুই, বোঝা যাচ্ছে হারতে চলেছে রানাই। ওর চেয়ে অনেক বড় মাপের ফাইটার দৈত্যটা। কেবল শক্তিতে নয়, কৌশলেও তুলনাহীন।

হঠাৎ সলীলের মনে হলো, পাগল হয়ে গেছে ওরা। বিদ্যুৎ-বেগে চার হাত-পা ছুঁড়ছে দুজনেই। রানার আচমকা এক নক-আউট পাঞ্চ খেয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল জো লুই-এর নাকের ফুটো দিয়ে। ভেঙে গেছে নাকের হাড়। এই ঘুসি খেয়ে সটান মাটিতে পড়ে যাওয়ার কথা যে-কোনও পালোয়ানের, কিন্তু চমকে গেলেও, যেন কিচ্ছু হয়নি ওর—এক পা পিছিয়ে আবার প্রবল আক্রমণ চালাল দৈত্য। কিন্তু সামান্য সরে গিয়ে ওর তলপেটে লাথি চালাল রানা। লাথি খেয়ে হাসিটা আরও বিস্তারিত হলো জো লুইয়ের। জানে, রানার শক্তি ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

বুক-হাত-উরু-মুখ সবখানেই জখম, সারা শরীর থেকে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে দুজনের। ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে দেহ দুটো। দেখতে ভয়াবহ লাগছে।

হ্রদের কিনারে চলে এসেছে ওরা। জো লুই-এর পিছনটা এখন সলীলের দিকে। সামান্য ঝুঁকে, দুই হাত গরিলার মত ঝুলিয়ে দিয়ে ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে রানার দিকে। পিছিয়ে গিয়ে ওর নাগালের বাইরে থাকার কথা রানার, কিন্তু ঠিক উল্টোটা করে বসল ও। আচমকা দৌড়ের ভঙ্গিতে দুই পা এগিয়ে সামনে ঝাঁপ দিল রানা, এসে ঢুকল জো লুই-এর বাহুর লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে। এটাই মনেপ্রাণে চাইছিল দৈত্য, কিন্তু বাগে পাচ্ছিল না এতক্ষণ; খুশি মনে দুই হাতে আলিঙ্গন করল রানাকে। ঘটনাটা এতই আকস্মিক ও অযাচিতভাবে ঘটেছে যে, স্রেফ পাগালামি বলে মনে হলো জো লুই-এর কাছে। রানার চিবুক ওর বুকের ওপর চেপে বসা, দুই হাতে কোমর জড়িয়ে ধরা, হাঁটু দিয়ে যে জো লুই-এর দুই পায়ের ফাঁকে গুঁতো মারবে তারও উপায় নেই। গ্রিজ মাখানো দেহের পিচ্ছিলতা কোনওভাবে সাহায্য করছে না ওকে এই মুহূর্তে। এই কাণ্ডটা কেন করল রানা, বুঝে ওঠার অগেই জো লুই টের পেল, উঁচু হয়ে যাচ্ছে ওর দেহটা, মাটি থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে দুই পা।

মনে মনে হেসে খুন হয়ে গেল জো লুই। ভাবছে, বোকাটা এতক্ষণে ওকে আছাড় দেয়ার চেষ্টা করছে! এটা করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে এবার রানা, প্রমাণ করে দিয়েছে: আন-আর্মড কমব্যাটের কিছুই জানে না ও—লড়াই চালিয়েছে নিছক বেপরোয়া সাহসের বলে। এই অবস্থায় ধরা পড়ে কোনমতেই আছাড় দেয়া সম্ভব নয়। দুই হাতে রানাকে জড়িয়ে ধরে ক্রমশ টানতে শুরু করল সে নিজের

দিকে, অজগরের মত পিষে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবে। কিন্তু থেমে নেই রানা। জো লুইকে বয়ে নিয়ে চলেছে সামনে। হঠাৎ চমকে গিয়ে রানার উদ্দেশ্য যখন বুঝল ও, দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। উঁচু বেদি থেকে পড়ে যাচ্ছে তখন দুজনে। পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছে চার হাত-পায়ে। পড়ছে। পড়ছে। ঝপাং করে পড়ল পানিতে। অবিশ্বাস্য ঠাণ্ডা যেন জো লুই-এর হাড়ের ভিতর আঘাত হানল। এর জন্যে একেবারেই তৈরি ছিল না ও, না মানসিকভাবে, না দৈহিকভাবে। কয়েকটা সেকেণ্ড যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগীর মত অবশ হয়ে গেল ওর দেহটা। ঢিল হয়ে গেল হাতের বজ্র-আঁটুনি। রানার পিচ্ছিল দেহটা সাপের মত মুচড়ে বাঁধনমুক্ত হয়ে গেল।

আতঙ্ক চেপে ধরেছে জো লুইকে। কী ঘটতে চলেছে জানে না বলে পানিতে পড়ার আগে দম নিতে পারেনি। চার হাত-পায়ে পানি কেটে উপরে মাথা তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু রানা ততক্ষণে চলে এসেছে ওর পিছনে। ডান হাতে দৈত্যের গলা পেঁচিয়ে ধরেছে—গ্রিজ না থাকায় শক্ত হয়ে চেপে বসেছে হাতটা। খামচি দিয়ে রানার হাতটা ছুটানোর চেষ্টা করল জো লুই। পারল না। রানার অন্য হাত তখন ওর মাথার পিছনে, প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে সামনের দিকে। সেইসঙ্গে দুই পায়ে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে। প্রচণ্ড এই চাপ সহ্য করে টিকে থাকার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। জো লুই-এর মত ভয়ানক শক্তিশালী আর বিশালদেহী লোক না হলে এতক্ষণে ভেঙে যেত ঘাড়ের হাড়।

ডাঙায় হলে এই *লক* ছাড়ানোর অন্তত পাঁচটা কায়দা ব্যবহার করতে পারত জো লুই, কিন্তু পানিতে কিছুই করতে পারল না। ডাঙায় ও বাঘ হতে পারে, কিন্তু পানিতে নদীমাতৃক বাংলার কোনও সন্তানের কাছে নিতান্তই শিশু। ভীষণ ঠাণ্ডা পানি ওর শক্তি-সামর্থ্য অনেকখানিই কমিয়ে দিয়েছে। প্রথমে মানসিক ভারসাম্য ঠিক করতে চাইল ও। তারপর ওর একটা হাত রানার দেহের নার্ভসেণ্টার খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোন সুযোগই দিচ্ছে না ওকে রানা। ওসব তো ওরও জানা। জো লুইকে পানির ওপর মাথা তুলতে দিচ্ছে না কিছুতেই।

জো লুই-এর ভাঙা নাক পানির নীচে। শ্বাস টানলে পানি ঢুকছে নাকে। সেটা সরাতে অতি মূল্যবান অক্সিজেন খরচ করে ফুসফুস থেকে বের করে দিচ্ছে বাতাস। হঠাৎ পাগল হয়ে গেল যেন ও। রানার উরু, হাত, কাঁধ, মুখ, সবকিছুর ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করল, খামচি মেরে রক্তাক্ত করে ফেলতে চাইল। যে-কোনওভাবেই হোক, যে-কোনও উপায়ে, রানার হাতের চাপ ঢিল করতে চাইল।

তারপর ওর কোমরে পেঁচানো রানার একটা গোড়ালি ধরে মোচড় দিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু শক্তি কোথায়? মাথার ভিতরে যেন বজ্রের গর্জন শুরু হয়েছে, বুকে তীব্র ব্যথা। হঠাৎ ঢিল হয়ে গেল গলার চাপ। আশা যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল জো লুই-এর মগজে। পরক্ষণেই উধাও হয়ে গেল সেটা। বুঝল, আবার রানার ফাঁদে পা দিয়েছে। একবার ওকে জড়িয়ে ধরে বোকা বানিয়েছে রানা, দ্বিতীয়বার হাত ঢিল করে দিয়ে। অক্সিজেনের জন্য আকুলিবিকুলি করতে থাকা ফুসফুস ওর মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাবার আগেই বাতাস

টেনে নিতে চাইল। নাক পানিতে ডুবে থাকায় বাতাস পেল না ফুসফুস, পেল পানি। সড়াৎ করে নাকমুখ দিয়ে পানি ঢুকে গেল ফুসফুসে। কেশে উঠে পানি গিলতে শুরু করল ও।

পরক্ষণে আবার ঠিক একই ভাবে ওর গলায় চেপে বসল রানার বাহু, মাথার পিছনে প্রচণ্ড চাপ। রানার নিজের দেহেও অক্সিজেনের অভাব-বোধ শুরু হয়েছে। কিন্তু মনের জোরে টিকে আছে ও, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে অস্বাভাবিক মোটা ঘাড়টায়—বন্ধ করে দিয়েছে ওর রক্ত চলাচলের সংযোগ নালী। কোনমতেই সরাতে পারছে না জো লুই ওকে। হঠাৎ বুঝতে পারল, পৃথিবীর সেরা অপ্রতিরোধ্য ফাইটার আসলে সে নয়, এই লোকটির হাতে পড়ে মারা যাচ্ছে আগামী এক মিনিটের মধ্যে। নিস্তার নেই, এর হাত থেকে নিস্তার নেই ওর কিছুতেই!

হ্রদের কিনারে ঝুঁকে বসে তাকিয়ে আছে সলীল। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে প্রায় উঠে এসেছিল ওরা উপরে, কিন্তু না, আবার ধীরে ধীরে ডুবে গেল দুটো মাথাই। পানির আন্দোলনে চারপাশে ছড়িয়ে পড়া ঢেউও কমে আসতে লাগল। আশা ছেড়ে দিল ও। কয়েক মিনিট আগে হাত দিয়ে নৌকা বাওয়ার সময় টের পেয়েছে পানিটা কী পরিমাণ ঠাণ্ডা, মনে হয়েছিল বিষাক্ত কিছু যেন ছোবল মারছে হাতে, সেই খুনি পানিতে এতক্ষণ পর্যন্ত জো লুই কিংবা রানা, কারও বেঁচে থাকার কথা নয়। দুজনেই তলিয়ে গেছে। মরে গেছে পানির নীচে।

এবার? কী করবে ও এখন! কী করার আছে? রানাকে এখানে ফেলে কী করে চলে যাবে ও? কোথায় যাবে? আবার তো সেই...

বাঁয়ে দশ ফুট দূরে ভুস করে ভেসে উঠল একটা মাথা। চমকে গেল সলীল। ঝটকা দিয়ে সেদিকে ঘুরে গেল ওর চোখ। ভেসে উঠল একটা দেহ। দেখল, কালো পানিতে রানার গ্রিজমাখানো চকচকে দেহটা ভাসছে উপুড় হয়ে। তারপর চিত হয়ে ভেসে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ রানার ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস শুনতে পেল সলীল পরিষ্কার। একটু পরেই ক্লান্ত ভঙ্গিতে সাঁতরে এল ও তীরে। হ্রদের কিনারে টেনে তুলল দেহটা। পাথরে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

গুহার গায়ে প্রতিধ্বনি তুলছে রানার জোরে জোরে দম টানা আর দম ফেলার শব্দ। জন্তুর মত চার হাতপায়ে ভর দিয়ে ওর পাশে এসে বসল সলীল। হাত রাখল কাঁধে। 'রানা... তুই... তুই ঠিক...আছিস তো!' ওর গলা থেকে বেরোল কোলাব্যাঙের স্বর।

মাথা উঁচু করল রানা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল সলীলের দিকে। 'আমার কাপড়গুলো দে।'

রানার কাপড়ের বাণ্ডিলটা এনে দিল সলীল। আণ্ডারওয়্যার খুলে সেটা দিয়ে গায়ের পানি মুছল রানা। গায়ে গ্রিজ মাখানো থাকায় পানি সহজেই সরে গেল। শার্ট-প্যান্ট পরে জ্যাকেট গায়ে দিল ও। তারপর তাকাল সলীলের দিকে। 'আমি তোকে চলে যেতে বলেছিলাম। বসে রইলি কেন?'

'তোকে ফেলে যেতে পারলাম না, রানা। আর গেলেই বা কী হতো? তুই না বাঁচলে কি জো লুই-এর কাছ থেকে পালাতে পারতাম? ও আমাকে ঠিকই ধরে

ফেলত।'

ডিঙিতে উঠল আবার রানা। 'তুই এখানেই থাক। আমি প্রেশার ল্যাম্পটা নিয়ে আসি।'

হাত দিয়ে ডিঙি বেয়ে ওপারে চলল ও। ওপারে পৌঁছে ল্যাম্পটা নিয়ে ডিঙিতে উঠতে যাবে, এমন সময় পানিতে হঠাৎ দেখা গেল বিশাল দেহটা। অন্ধকার গভীরতা থেকে উঠে আসা দানবের একটা হাত দেখা গেল প্রথমে, তারপর সোনালি দাড়িওয়ালা প্রকাণ্ড মুখ। সোনালি চুল ভরা মাথাটা বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে রয়েছে একদিকে। কয়েক সেকেণ্ড ভেসে রইল দেহটা। গড়িয়ে উপুড় হলো। তারপর ধীরে ধীরে ডুবে গেল আবার। মিলিয়ে গেল চারদিকে ছড়িয়ে পড়া ঢেউগুলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

ও ল্যাম্প নিয়ে ফিরে এলে সলীল বলল, 'তার মানে সত্যিই মরেছে!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। বেঁচে থাকলে ওরই মেশিন-পিস্তল দিয়ে গুলি করে মারতে হতো এখন। আর কিছু করার ছিল না। ওর মত দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতার দু-একটা মাত্র সুযোগই পাওয়া যায়। তা-ও ওর নিজের এলাকায়, নিজের পরিবেশে হলে কিছুতেই পারতাম না।'

'হ্যাঁ, নিজের জায়গায় হলে সম্ভব ছিল না!' বিড়বিড় করল সলীল। 'তুই যে ফাঁদ তৈরি করেছিলি ওর জন্যে, সেটা ও বুঝতে পারেনি। আর সেইখানেই মারটা খেল। শুধু গায়ের জোরে ওর সঙ্গে কেউ কোনদিনই পারেনি, পারতও না।'

'তোর কেমন লাগছে এখন?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'দুর্বলতা আছে। তবে ভয়টা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।'

'গুড। ওঠ। পনেরো ফুট একটা চড়াই বাইতে হবে। আর পনেরো মিনিটের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাব আমরা।'

পনেরো নয়, সতেরো মিনিট লাগল ওদের; রানা ও সোহানার রেখে যাওয়া বেড-রোল, হ্যাভারস্যাক আর দুটো রাইফেলের কাছে পৌঁছাতে। ওগুলো নিয়ে আরও পঞ্চাশ গজমত পেরিয়ে পৌঁছল গুহামুখের কাছে। ঝোপে ঘেরা ছোট একটা গর্ত, উপত্যকায় বেরিয়েছে। বেশ উপরে উঠে গেছে সূর্যটা, ঝুলে রয়েছে নীল আকাশে। গোটা উপত্যকায় সোনালি রোদ বিছিয়ে রয়েছে। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসা দেহেও যেন বল ফিরে পেল সলীল এই নতুন দিনের সূচনা দেখে।

ওর জুতো খুলে দিল রানা। একটা স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকতে সাহায্য করল। হ্যাভারস্যাক খুলে চকলেট, কিসমিস আর গ্লুকোজ ট্যাবলেট বের করে দিল। আর ফ্লাস্ক থেকে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি।

'এগুলো খেয়ে একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর্, শালা।' একটা রাইফেলে হাত বোলাল রানা। 'আর কোন চিন্তা নেই। কেউ আর আমাদের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা। এরমধ্যে কাউকে আসতে না দেখলে রওনা হব সরাইখানার দিকে।'

খাবার খেয়ে, ব্র্যাণ্ডি গিলে শুয়ে পড়ল সলীল। স্লিপিং-ব্যাগের উষ্ণতার সঙ্গে দেহের ভিতরেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ব্র্যাণ্ডির উত্তাপ আরাম তৈরি করছে। বুজে আসছে চোখের পাতা। 'পালা করে পাহারা দিতে পারি আমরা। ইচ্ছে করলে

রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে তুইও একটু ঘুমিয়ে নিতে...' শেষদিকে কথাগুলো জড়িয়ে গেল ওর। তারপর নীরবতা। ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে।

সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রানা। সে-ও স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকেছে। ভাবল, যাক, অনেকদিন পর শান্তিতে ঘুমাল বেচারা। রাইফেলটা আলতোভাবে ধরে নজর রাখল উপত্যকার দিকে।

উপত্যকাকে যেন কামড়ে ধরে পড়ে আছে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটা। বহুকাল মেরামত করা হয়নি। একপাশে পাথরের দেয়াল নেমে গেছে কিছুটা ঢালু হয়ে, অন্যপাশে পঞ্চাশ-ষাট ফুট খাড়া উঠে গেছে আরেকটা দেয়াল। এপ্রিলের অপূর্ব একটা রোদেলা সকাল। এত সকালেও বাতাস পরিষ্কার, গ্রীষ্মকালের আভাস দিচ্ছে। বিশ্রামের জন্য থামল ওরা।

ভাল পা-টায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে জোয়ালিন, এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ডিন। ঘামে ভেজা চুল ধুলোয় মাখামাখি, চটচটে হয়ে লেপ্টে রয়েছে জোয়ালিনের কপালে। ওর ট্রাউজারের পা কালো দেখাচ্ছে ডিনের পিঠের ঘামে ভিজে গিয়ে।

আদর মাখা চোখে দেখল জোয়ালিন আশ্চর্য কোমল মনের মেজাজি আইরিশ ছেলেটাকে। কী কষ্টই না করছে বেচারা ওর জন্যে! ধারালো পাথরে লেগে ডিনের জুতো কেটে ফালাফালা, ট্রাউজারের দুই হাঁটুর কাছেই ছেঁড়া। একটা কাকতাড়ুয়ার মত দেখাচ্ছে ওকে। চোখে কেমন অস্বাভাবিক দৃষ্টি। শুকনো ঠোঁট ভেজাল জিভ দিয়ে চেটে। বলল, 'ওরা বুঝে ফেলবে কিন্তু। বুঝে যাবে, সলীল সেনকে এদিক দিয়ে বয়ে আনিনি আমরা। বুঝবে, রানা ওকে নিয়ে শর্ট দিয়ে নেমে গেছেন। আমেরিকান শয়তানটা একটা উন্মাদ, কিন্তু ভীষণ-ভীষণ-ভীষণ চালাক।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সোহানা বলল, 'থামো, ডিন। শুনছি।'

কিন্তু শোনার মত কিছুই নেই। চারপাশে বিরাজ করছে পিরেনিজ উপত্যকার নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। কোন গাড়ির শব্দ নেই। কিছুটা ঢিল হয়ে এল স্নায়ু। আবার শুরু হলো চলা।

পনেরো মিনিট পর টিলাটক্করে ভরা একটা জায়গায় পৌঁছল ওরা। একটা টিলায় উঠে চারপাশটা দেখল সোহানা। নেমে এসে বলল, 'এ জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেরোতে হবে।'

ক্লান্তি আর অস্বস্তি রাগিয়ে দিয়েছে ডিনকে। বলল, 'এ-সব করে লাভটা কী?'

'মানে?'

'মানে, রানা। একটু আগেই বললাম না, ঠিকই আন্দাজ করে ফেলবে ওরা, পিছু নেবে ওঁর।'

'আমরা যখন কোনও কাজ করি, সেটার দিকেই মন দিই, ডিন, অন্য কিছু নিয়ে ভাবি না। রানাও আমাদের কথা ভাবছে না এ মুহূর্তে। এখন, চলো।'

'ডিন ঠিকই বলেছে, সোহানা,' জোয়ালিন বলল। 'সলীলের মত একজন বিধ্বস্ত লোককে নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না রানা। আমরা হয়তো বেঁচে যাব, কিন্তু ওরা...'

'ওরাও বেঁচে যাবে। চলো।'

রাস্তায় সরে এসে আবার এগিয়ে চলল ওরা। পিঠে বোঝা নিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে পা টেনে টেনে এগোচ্ছে ডিন। মাঝে মাঝে একটা পা নামিয়ে মাটিতে ভর দিয়ে ডিনের ওপর চাপ কমানোর চেষ্টা করছে জোয়ালিন। তবে খুব একটা লাভ হচ্ছে না তাতে।

ওরা জানে না, আধ মাইল দূরে উঁচু একটা টিলার ওপর থেকে চোখে ফিল্ড গ্লাস লাগিয়ে দেখছে ওদের ফুজিয়ামো। কিছুক্ষণ দেখে ঢাল বেয়ে পিছলে নেমে গেল নীচে দাঁড়ানো সিত্রোঁ গাড়িটার কাছে। হুইলে বসে আছে ক্লিঙ্গার। পাশে মেরি। পিছনের সিটে বসেছে হুয়ান আর ইয়েনো, দুজনের হাতেই মেশিন-পিস্তল। ক্লিঙ্গারের কোমরে বাঁধা হোলস্টারে ঢোকানো একটা .৪৫ কোল্ট রিভলভার। শ্যাতো পাহারা দেয়ার জন্য রয়ে গেছে একমাত্র টোপাক।

দূর থেকে আসা শব্দটা প্রথম শুনতে পেল জোয়ালিন। সরু রাস্তা কিছুটা চওড়া একখণ্ড জমির পাশ দিয়ে চলে গেছে এখানে। দেখে মনে হয়, রাস্তার পাশে টুরিস্টদের জন্য এখানে গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা ছিল একসময়। কাঁটাতারের বেড়া ছিল, এখন শুধু লোহার খুঁটিগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

জোয়ালিন বলল, 'সোহানা, গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

দাঁড়িয়ে গেল সোহানা। ডিনও।

কান পেতে শুনে আবার বলল জোয়ালিন, 'নাহ্, এখন আর নেই। অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে এ-সব উপত্যকায়। বহুদূরের শব্দকেও অনেক সময় কাছের মনে হয়। দূর দিয়ে যাওয়া কোন গাড়ির শব্দই শুনেছি হয়তো।'

কিন্তু সোহানা চিন্তিত। জোয়ালিনের কথাটা নিয়ে ভাবছে। ক্লিঙ্গার কিংবা জো লুই হয়তো গাড়ি নিয়ে আসছে। আর এমন একটা জায়গায় এখন রয়েছে ওরা, লুকানোর কোনও উপায় নেই।

এই প্রথম হতাশা ফুটল ওর চোখে। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে আবার খুলল। রাস্তার একপাশে খাড়া উপরে উঠে যাওয়া দেয়ালের চূড়াটায় কোনরকম খাঁজ কিংবা গর্ত নেই যেখানে লুকানো যায়। অন্যপাশের দেয়াল বেয়ে নামার চেষ্টা করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ এখন সোহানাও শুনতে পাচ্ছে। ডিনকে বলল, 'জোয়ালিনকে নিয়ে ওদিকে চলে যাও,' পঞ্চাশ কদম দূরের একটা পাথরের স্তূপ দেখাল ও। 'ওটার আড়ালে লুকাও...'

'ওটার আড়ালে লুকানোর জায়গা কোথায়?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল ডিন।

'জানি, নেই।' অদ্ভুত শান্ত সোহানার কণ্ঠ। 'তবু যা বলছি করো। জলদি যাও। স্তূপের ওপাশে গিয়ে চুপ করে বসে থাকো।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা ধরে ছুটল ও। একটু আগে যে মোড়টা পেরিয়ে এসেছে সেটার দিকে। ষাট কদম দূরের গাড়ি পার্ক করার পরিত্যক্ত জায়গাটার কাছে চলে এল। চোখা দেখে একটা লোহার খুঁটি চেপে ধরে আগুপিছু, এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। খুঁটির গোড়ার মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। দুই হাতে চেপে ধরে টান দিয়ে তুলে নিল ওটা। গোল রড, ছয় সুতার বেশি হবে না ব্যাস।

টলতে টলতে জোয়ালিনকে নিয়ে পাথরের স্তূপটার কাছে পৌঁছল ডিন। ওর

হাত আঁকড়ে ধরে সোহানার দিকে তাকিয়ে আছে জোয়ালিন।

'কী করতে চাইছেন উনি?' চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডিন।

'আমি জানি না,' কেঁপে উঠল জোয়ালিনের গলাটা।

'হুঁ।'

লম্বা খুঁটিটা ডান হাতে উঁচু করে তুলে ধরল সোহানা। চোখা মাথাটা সামনের দিকে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রডটা বার দুই তুলল বল্লমের মত করে। ইঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে। রাস্তা দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে গাড়িটা। পাঁচ সেকেণ্ড পেরোল। হঠাৎ রডটা দেহের সঙ্গে চেপে ধরে দৌড়াতে আরম্ভ করল সোহানা। ডিন আর জোয়ালিন দেখছে, অলিম্পিক গেমসের জ্যাভেলিন থ্রোয়ারের মত করে তুলেছে ওটা সোহানা। রাস্তার মাঝ বরাবর লক্ষ্যস্থির করছে এখন।

মসৃণ গতিতে মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল গাড়িটা। ড্রাইভারকে কিছু বোঝার সময় দিল না সোহানা। সামনের সিটে বসা ক্লিঙ্গার আর মেরিকে দেখতে পাচ্ছে। ঠিক দশ হাত দূর থেকে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারল চোখা লোহার রড।

বল্লমের মত উড়ে গিয়ে সামনের উইণ্ডস্ক্রিনে বিঁধল ওটা। শেষ মুহূর্তে গাড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করেছিল ক্লিঙ্গার, কিন্তু লাভ হলো না। কাঁচ ভেদ করে ওকে সিটের সঙ্গে গেঁথে ফেলল ডাণ্ডাটা। ওকে ভেদ করে গিয়ে রডের চোখা মাথা গাঁথল পিছনের সিটে বসা হুয়ান ক্যাসটিলোর পাঁজরে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনাকুনি ছুটে গেল গাড়ি। রাস্তায় ফিরতে আর পারল না। ডাণ্ডাটা ছুঁড়ে দেয়ার পর সামনে ঝুঁকে এক পায়ের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে দেখছিল সোহানা। গাড়িটা ওর দিকেই আসছে দেখে ধাক্কা লাগার আগ মুহূর্তে ডাইভ দিয়ে পড়ল ডাইনে। গাড়িটা চলে গেল পাশ কাটিয়ে। আবার যখন উঠে দাঁড়াল, রাস্তায় তখন আর নেই গাড়িটা, পাহাড়ের গায়ে একের পর এক প্রচণ্ড বাড়ি লাগার ধাতব শব্দ কানে আসছে শুধু। দৌড়ে গিয়ে দেয়ালের কিনারা দিয়ে নীচে তাকাল।

পাহাড়ে বেরিয়ে থাকা পাথরের তাকগুলোতে বাড়ি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে গাড়িটা। এখানে ওখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সে-শব্দ। একেবারে নীচে গিয়ে পড়ার আগেই আগুন ধরে গেল, শেষ ধাক্কাটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো গাড়িটা। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল সোহানা দৃশ্যটা। গাড়ির ভিতর থেকে একজনকেও বেরোতে দেখেনি। দাউ দাউ আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে আরোহীরা।

চোখের কোণে রাস্তায় কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে ফিরে তাকাল। একটা মেশিন পিস্তল। নিশ্চয় মেরি কিংবা অন্য কারও হাতে ছিল ওটা। জানালার ফ্রেমে নল রেখে তৈরি হয়ে ছিল গুলি করার জন্য।

এগিয়ে গিয়ে অস্ত্রটা তুলে নিল ও। তারপর এগোল ডিনদের দিকে। পাহাড়ের নীচে কী ঘটছে দেখার কৌতূহল সামলাতে না পেরে জোয়ালিনকে পিঠে নিয়ে এগিয়ে এসেছে ডিন।

নীচের জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজন। কিছুক্ষণ দেখে সোহানার দিকে ফিরল ডিন। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে এখন স্বস্তি ফিরছে। খসখসে স্বরে

জিজ্ঞেস করল, 'ভিতরে কারা ছিল দেখেছেন, সোহানা আপা?'

ভুরু কুঁচকে উঠল সোহানার। 'কী ব্যাপার, ডিন? তোমার না মনে হয়েছিল, আমি তোমার প্রেমে পড়ে সাহায্য করেছিলাম। এখন আবার সম্বোধন পাল্টাচ্ছ কেন?'

হাসল জোয়ালিন। 'আসলে ডাকটা আমিই শিখিয়েছি ওকে। তোমার ওপর থেকে নজরটা অন্য দিকে ফেরাবার জন্যে!'

হেসে উঠল সোহানা। 'বাহ্, বেশ তো! আমি টেরই পাইনি ভেতর ভেতর কতবড় ডাকাতি হয়ে গেছে!'

'কারা ছিল, আপা?' আবার জিজ্ঞেস করল ডিন।

'ক্লিঙ্গার আর মেরি। পিছনের সিটে আরও কেউ ছিল, দু'জন না তিনজন ঠিক দেখতে পাইনি।'

কাঁপা কাঁপা একটা শব্দ বেরোল ডিনের মুখ থেকে, সেটা যে হাসি, পরিষ্কার বোঝা গেল না। 'যা-ই বলুন, দারুণ দেখালেন কিন্তু! সত্যিই দারুণ!'

জোয়ালিনের দিকে তাকাল সোহানা। হাসল। 'খুবই কষ্ট হলো তোমার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নীচের জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে তাকাল আবার জোয়ালিন। ঘামে ভেজা, ধুলোয় মাখা মুখ। 'হয়েছে। তবে ক্লিঙ্গার খতম হয়ে যাওয়ায় সব ভুলে গেছি।'

'আপাতত আর কোনও ভয় নেই,' বলল সোহানা। 'হাতে এটা থাকায় বাধা অন্তত দিতে পারব,' মেশিন-পিস্তলটা দেখাল ও। 'এবার চলো, খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করি।'

বিশ মিনিট পর উপত্যকার অর্ধেকটা যখন পাড়ি দিয়েছে ওরা, শোনা গেল হেলিকপ্টারের শব্দ। উঁচু পাহাড় পেরিয়ে উড়ে এল ওটা বিশাল ফড়িঙের মত। ওদের বাঁয়ে তিনশো ফুট মত এগিয়ে গিয়ে কাত হয়ে চক্কর দিতে লাগল।

উপত্যকার সমতল অংশটার দিকে শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে সোহানা, যেখানে হেলিকপ্টারটা নামবে বলে মনে হচ্ছে। ডানের উঁচু একটা পাথরের আড়াল দেখিয়ে লুকানোর ইঙ্গিত দিল ও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটার আড়ালে চলে এল ওরা।

শুকনো কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ডিন, 'ক্লিঙ্গারের লোক?'

'না।' মেশিন-পিস্তলটার দিকে তাকাল একবার সোহানা। মাথা নেড়ে বলল, 'আমার ধারণা, রয় কনারি, আমাদেরকে ফিরতে না দেখে নিজেই চলে এসেছে। সাবধানতার জন্য আড়াল নিলাম; ক্লিঙ্গারের লোকও হতে পারত।'

দুলতে দুলতে নীচে নামছে হেলিকপ্টার। হালকা ধুলোর ঝড় তুলেছে। ওদের দুশো গজ দূরে মাটি স্পর্শ করল ওটার স্কিড। কমে এল রোটরের ঘূর্ণন। দুজন লোক লাফিয়ে নামল। একজনের পরনে কম্ব্যাট জ্যাকেট, হাতে সাব-মেশিনগান। অন্যজনের পরনে গাঢ় রঙের সুট।

উঠে দাঁড়াল সোহানা। হেসে বলল, 'বলেছিলাম না, রয়। সুট পরাটার নাম রয়, আর অন্যজন স্যাওনি জর্জিস।'

নোংরা, ধুলোময়লা লাগা হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছল জোয়ালিন। 'তা

হলে... তা হলে সত্যিই দুঃস্বপ্নটার অবসান হলো!'

'এখন শুধু রানা আর সলীলকে উদ্ধার করা বাকি।'

'আশা করি, ওরাও ভাল আছে।' ভারি দম নিল জোয়ালিন। বহুদূর থেকে ভেসে এল যেন ওর কণ্ঠ, 'তবে নিজ চোখে দেখতে পারলে খুশি হতাম।'

হেলিকপ্টারটার দিকে এগোল ওরা।

ওদের দেখে চিৎকার করে হাত নেড়ে ছুটে এল রয়। পিছনে ছুটছেন জর্জিস। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে ছুটে এসে দাঁড়াল রয় সোহানাদের সামনে। মুখ-চোখ কঠিন করে রেখেছেন জর্জিস। পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসি জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা, সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনাদের?'

হাসিমুখে ওঁর দিক থেকে জোয়ালিনের দিকে ফিরল সোহানা, 'লেডি হেইফোর্ড, আমার পুরানো বন্ধু, স্যাওনি জর্জিস। মঁসিয়ে জর্জিস, ইনি লেডি জোয়ালিন হেইফোর্ড। আর এঁর নাম ডিন মার্টিন।'

জ্বলন্ত চোখের আগুন কিছুটা কমল জর্জিসের। জোয়ালিন আর ডিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লেডি হেইফোর্ড, মিস্টার মার্টিন, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

আবার বলল সোহানা, 'আমি জানি, আমরা ফরাসি জমিতে দাঁড়িয়ে আছি। এভাবেই টুরিস্টদের আপনারা স্বাগত জানান বুঝি? বড়ই হতাশ হলাম। আমরা এখানে গুহা দেখতে এসেছিলাম, হঠাৎ করেই পড়লাম একদল দুষ্কৃতকারীর খপ্পরে। শ্যাতোতে বাসা বেঁধেছিল ওই খুনীর দল। আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিল আমাদের। সত্যি, জর্জিস...'

'মিস্টার রানা আর মিস্টার সলীলকেও নিশ্চয় শ্যাতোতেই পেয়েছেন?'

অবাক হওয়ার ভান করল সোহানা। তারপর নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি কী করে বুঝলেন জানি না, তবে ঠিকই বলেছেন। কাকতালীয় ঘটনা না?'

'হুঁ। নতুন করে আর কিছু বলতে হবে না আপনাকে, রয় কনারির কাছে সবই শুনেছি। তবে আপনাদের ওপর আমি ভীষণ রেগে আছি।'

হাসল সোহানা। 'উঁহুঁ, আমাদের কাজে আপনি রাগেননি। রেগে আছেন আসলে আমাদেরকে নিয়ে আপনার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তাই।'

'দূর, কী যে বলেন!'

মোলায়েম স্বরে জোয়ালিন বলল, 'তারমানে, সোহানা আর রানাকে আপনি ভালই চেনেন, ওদের এ-ধরনের অ্যাডভেঞ্চার আপনার কাছে নতুন নয়, মঁসিয়ে জর্জিস। আচ্ছা এখন বলুন তো, মিস্টার সলীল সেনের অবস্থায় আপনি যদি পড়তেন, আর ওরা দুজন আপনাকে উদ্ধার করতে যেত, তখন কী বলতেন?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে হাসিমুখে জোয়ালিনের দিকে তাকালেন জর্জিস, 'এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না, আমাকে মাপ করবেন, লেডি হেইফোর্ড।'

সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি শ্যাতোতে লোক পাঠিয়েছেন, জর্জিস?'

'নিশ্চয়ই।'

'ওদের ঢুকতে বলুন। যদিও খুব বেশি কিছু আর পাবে না এখন ওখানে।'

'এখুনি বলে দিচ্ছি রেডিওতে,' জর্জিস বললেন। তারপর অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন, 'কিন্তু মিস্টার রানা এখন কোথায়, বলছেন না কেন? আর মিস্টার সেন?'

'হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আর। হেলিকপ্টারে করে চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

চোখ মেলল সলীল। উজ্জ্বল রোদ উষ্ণ আমেজে ভরিয়ে দিয়েছে উপত্যকাটাকে। রোদের আলো চোখে পড়ায় ঘুম ভেঙে গেছে ওর। সারা শরীরে ব্যথা। কিন্তু বেশ কয়েক দিন পর মনটা আজ ফুরফুরে। মাথা ঘোরাল ও।

দুই কদম দূরে নিচু ঝোপের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। রাইফেলটা আলতোভাবে একহাতে ধরা। সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল। 'এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লি যে?'

স্লিপিং ব্যাগ থেকে শরীর মুচড়ে বেরিয়ে এল সলীল। 'আমার খুব ভাল লাগছে এখন, রানা।'

ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা পিছনে ফেলে এসেছে। সেল, ড্রাগ, আবর্জনা, দুর্গন্ধ, জো লুই-এর ভয়াবহ অত্যাচার, সব এখন অতীত।

মুগ্ধ হয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকাল। তেমন সুন্দর কোনও উপত্যকা নয় এটা, রুক্ষ ঢাল আর পাথরের দেয়াল। তবে এই রুক্ষতার মাঝেও বসন্তের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ওপরে নীলাকাশ যেন আলতো করে ধরে রেখেছে সোনালি সূর্যটাকে। পাথরের ফাঁকেফোকরে নতুন ঘাস মাথা উঁচু করছে। শীতের রুক্ষতায় ভরা ঝোপঝাড়গুলোতে দেখা যাচ্ছে নতুন পাতা। ব্যস্ত হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে মৌমাছি, বসছে গিয়ে নতুন ফুলে। মাটিতে ইতিউতি ছুটছে বিচিত্র উজ্জ্বল রঙের ঝলমলে গুবরে পোকা।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'খুব সুন্দর, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল সলীল। 'আবার এসব দেখতে পাব, ভাবিনি।'

হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে ওপর দিকে মুখ তুলল রানা। রাইফেলটা চেপে ধরল।

একশো ফুট নীচের উপত্যকায় নামল হেলিকপ্টার। নিচুস্বরে রানা বলল, 'ক্লিঙ্গারের লোক হতে...'

থেমে গেল ও। হেলিকপ্টারের খোলা দরজার কাছে বসা সোহানাকে দেখেছে। ক্রমাগত ওপরে-নীচে উঠছে ওর একটা হাত। রানাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুনল সলীল।

'যাক, তা হলে নিরাপদেই যেতে পেরেছে,' রানা বলল। 'আমাদেরকেই ডাকছে সোহানা। আর বসে আছিস কী করতে? চল্, বেরোই।'

দ্রুতহাতে স্লিপিং ব্যাগ আর মালপত্র গোছাল ও। হ্যাভারস্যাক কাঁধে নিয়ে, রাইফেল হাতে সলীলকে নিয়ে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়।

ওদের দেখে হেলিকপ্টার থেকে নামল সোহানা। তবে ছুটে আসার শক্তি বোধহয় নেই। অকারণ কষ্ট না করে কপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে রইল হাসিমুখে। সলীলকে জ্যান্ত দেখে হন্তদন্ত হয়ে দৌড় দিল রয় কনারি ওর দিকে।

অকস্মাৎ হাসতে আরম্ভ করল সলীল। ওপর দিকে মুখ তুলে। হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর থলথলে দেহ আর বিশাল ভুঁড়ি। মুক্তির আনন্দে, ভয়াবহ নরক থেকে বেরিয়ে আসার আনন্দে হাসছে ও।

দু'চোখে জল।

***

মাসুদ রানা
দুটি বই একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন

ব্ল্যাকমেইলার

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট সলীল সেন। ফ্রেঞ্চ পুলিশ ওকে মৃত ধরে নিলেও রানা ও সোহানা বিশ্বাস করল না সে কথা। সলীলকে খুঁজতে বেরোল দুজনে। ফ্রান্সের এক প্রাচীন দুর্গ, প্রাগৈতিহাসিক গুহা আর সুড়ঙ্গ—সবকিছু যেন ধাঁধার জাল বুনে রেখেছে ওদের জন্য, পদে পদে রচনা করছে মৃত্যুফাঁদ। তারপর, ভয়াল, গভীর ভূগর্ভ হ্রদের কিনারে বাধল দানবের সঙ্গে রানার শেষ লড়াই...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০